গল্প

১৯২৯-১৯৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

উৎসর্গ

প্রকৃতির পরিহাস

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বয়স্যবরেষু

মনপবন : হুঁকানকাটা ও সবার উপর মানুষ সত্য

শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে

মনপবন : মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না ও বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে

মনপবন : জখ্‌মী দিল্‌ ও অজাতশত্রু

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে

মনপবন : হাসনসখী

শ্রীমনকুমার মৈত্রকে

যৌবনজ্বালা

শ্রীগোপালদাস মজুমদার করকমলেষু

দূরের মানুষ

কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ স্মরণে

সূচী

এই সঙ্কলনের শামিল

প্রকৃতির পরিহাস
প্রথম সংস্করণ ১৩৪১
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩

মনপবন
প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩

যৌবনজ্বালা
প্রথম সংস্করণ ১৩৫৭

দূরের মানুষ
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত
"পূর্বাশা"য় প্রকাশিত ১৩৫৭

দু'কানকাটা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৩৫০

হাসনসখী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৩৫২

নারী গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৯

ভূমিকা

পঁচিশ বছর বয়সে লেখা "তু'জনায়" আমার প্রথম ছোট গল্প। বিলেতে থাকতে ১৯২৯ সালে লিখি। তারপর দেশে ফিরে এসে "বালিকাবধূ"। সাধুভাষায়। তারপর "সত্যাসত্য" ইত্যাদি উপন্যাস নিয়ে মেতে উঠি। ভুলে যাই যে এ তুটি গল্প কোনো দিন লিখেছি। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি যে ছোট গল্প আমার হাত দিয়ে হবে। বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার আমাকে আশ্বাস দেন। এবার লেখা হয় "প্রকৃতির পরিহাস" পর্যায়ের নয়টি ছোটগল্প। ১৯৩৩-৩৪ সালে।

এরপর আট বছর গল্পবিরতি। "সত্যাসত্য" শেষ হয় ১৯৪২ সালে। বারো বছর ধরে দম রাখতে পারা একেই তো কঠিন। তারপর চলছিল "ম্যান অফ য়্যাকশন" হবার তুঃসাধনা। লিখি কখন? তার জন্যে ভাবি কখন? ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের চেয়ে কম কঠিন নয়। তার প্রস্তুতিও ভিন্ন। ছোট গল্পের দাবী এমন যে চেখভের মতো অত বড় শিল্পী একখানিও উপন্যাস লেখেননি। তেমনি উপন্যাসের দাবী এমন যে ডস্টইয়েভ্স্কির মতো মহাশিল্পীকে দিয়ে ছোটগল্প বড় একটা হলো না।

হঠাৎ একদিন "মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না" লেখা হয়ে গেল ১৯৪২ সালে। এমনি করে শুরু হলো "মনপবন" পর্যায়। এবং "যৌবনজ্বালা" পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধ। আমার মনে হলো আমি পথ পেয়ে গেছি। বিশেষ করে "তু'কানকাটা"য়। আর "হাসনসখী"তে। আমার জীবনদর্শন বদলে যায়। সেইসঙ্গে সাহিত্যদর্শন। ভাষা ও শৈলী। ইচ্ছা করেই আমি প্লট ও চরিত্র উদ্‌ভাবন বর্জন করি। ঔজ্জ্বল্য বর্জন করি। সমাজসংস্কার প্রভৃতি উদ্দেশ্য বর্জন করি। এক একটি গল্প ভূরিপরিমাণ ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এটি ঠিক সঙ্কলন নয়। একত্রীকরণ। ১৯২৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত লেখা সব গল্পই আছে এতে। শেষেরটি সংযোজন, আর সব পূর্বে গ্রথিত। এখানে বলে রাখি যে "দূরের মানুষ"কে বন্ধু বুদ্ধদেব ছোটগল্প বলে স্বীকার করতে নারাজ। আসলে ওটি একটি ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু একটু সংস্কার করলেই

গল্প হয়ে দাঁড়ায়। সেটুকু আমি আর করলুম না। "বালিকাবধূ"কে সাধুভাষার অবগুণ্ঠনমুক্ত করেছি। এইপর্যন্ত আমার সংস্কারচেষ্টা। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ আমাকে নিষেধ করেছিলেন এক বয়সের রচনা ভেঙে আরেক বয়সের করতে। তিনিই আমাকে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পের সন্ধান দেন। তাঁকে স্মরণ করি।

শান্তিনিকেতন,
৯ই বৈশাখ ১৩৬৭

অন্নদাশঙ্কর রায়

গল্প

১৯২৯-১৯৫০

দু'জনায়

১

সেদিনও এমনি একলাটি বসেছিলুম, পড়ার বইখানি কোলের উপর পড়েছিল, কিন্তু তার উপর চোখ পড়ছিল না। ভাবছিলুম আর একজনের কথা, আজ যেমন ভাবছি। মনে হচ্ছে, মিলনের পূর্বাহ্ণ আর অপরাহ্ণ দুইই সমান ব্যাকুলতায় ছলছল।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। সকালবেলা তার চিঠিও পাইনি, ফোনও শুনিনি। সকালের আলো দুপুরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কে জানে কার ফোন! গা তুললুম না। মিসেস ফিশার বুড়ীকে তার কসাই কিংবা মুদি স্মরণ করছিল ভেবেছিলুম। কিন্তু বুড়ী ডেকে বললে, "মিস্টার চৌধুরী, তোমার সেই বন্ধুনী।"

"সেই বন্ধুনীটি"র জন্যে মিস্টার চৌধুরীর কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কেন যে তিনি এ হতভাগ্যকে মাঝে মাঝে আপ্যায়ন করেন তিনিই জানেন। কম্প্র পদে নম্র নেত্রপাতে ফোনের রিসিভার কানে তুলে নিলুম। কানটাকে ঝাঁঝিয়ে নিয়ে কে যে কথা বলে গেল, বুঝলুম। অর্থাৎ কে তা বুঝলুম, কী তা বুঝলুম না। বাঁচা গেল যে, "সেই বন্ধুনী" নন। ইনি ফিস্ ফিস্ করে কথা বলেন না। ইনি কথা দিয়ে যেন কান মলে দেন।

যাকে দেখবার জন্যে এত ব্যগ্র ছিলুম, সে যে কী বললে, তা শোনবার ধৈর্য ছিল না। প্রতি প্রশ্নের উত্তরে একটা করে "হাঁ" দিয়ে গেলুম। বললুম, "হাঁ, আজ বিকেলে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।" গেলুম যখন তখন গায়ে ছিল অর্ধেকটা টেনিসের পোশাক, অর্ধেকটা মামুলি। আর হাতে একখানা "ফ্রানসিস্ টমসন্"। সাড়ে চারটের সময় অমুক জায়গায় দেখা করবার কথা। অমুক জায়গায় পায়চারি করতে লাগলুম। সে আর আসেই না। আশে-পাশের রাস্তাগুলোয় খানিকটে করে গিয়ে দেখতে লাগলুম, যদি তাকে দূর থেকে দেখতে পাই। মনে মনে বকুনির ভাষায় শান দিতে থাকলুম।

আধ মাইল দূর থেকে অবশেষে দেখা গেল কে একজন গুরুভূষণা আসছেন। এত জোরে জোরে পা ফেলছেন, যেন ধান ভানছেন, আর এত

ঘুরে ঘুরে, যেন প্রতি বারেই লঙ্কা ডিঙোচ্ছেন। খানিকটে কাছে যখন এলেন তখন দেখি হাতে একটা বেতের ব্যাগ রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিলুম। বললুম, "কত দেরি করেছ, জানো?"

সে একটা কৈফিয়ৎ দিলে। দু'জনে মিলে ট্রেনের অভিমুখে ছুটলুম। পথে যেতে যেতে বললে, "তোমার সঙ্গে কিছুই আনোনি কেন?"

আমি বললুম, "এর বেশী কী আনতুম?"

সে বললে, "তোমাকে বোধ হয় অন্য একটা বাড়িতে রাত কাটাতে হবে। এক বাড়িতে দুটো ঘর পাওয়া যাবে না।"

আমি বললুম, "ব্যাপার কী? রাত্রে ফিরে আসব মিসেস ফিশারকে বলে এসেছি যে।"

"এ কেমন কথা? তখন না বললে আমার সঙ্গে সোমবার অবধি উইকেণ্ডে আসছ?"

"ঠিক শুনতে পাইনি বোধ হয়। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করব।"

"এখন—"

"এখন এই বেশেই যেতে রাজি আছি। কেবল একটা ফোন করে বুড়ীকে বলে দিতে হবে আজ রাত্রে ফিরব না।"

"সঙ্গে কিছুই যে নাওনি। অন্তত একটা টুথব্রাশও তো দরকার।"

"তোমার টুথ পেস্টের খানিকটা দিয়ো।"

"এক বাড়িতে থাকলে তো। তার চেয়ে বরং রাস্তায় কিনে নিয়ো একটা।"

রাতের পোশাকের নাম মুখে আনলুম না। বললুম, "একখানা ক্ষুর কিন্তু ভয়ানক দরকার কাল সকালে। বাড়ির কেউ ধার দেবে না? কিংবা কাছে কোথাও নাপিত পাব না?"

"পাগল! চাষার বাড়ি যাচ্ছ খেয়াল নেই। আর গ্রাম কিংবা শহর সেখানে কোথায়! ফার্ম হাউস।"

আমি বললুম, "তবে দেখা যাক কী হয়।" এই বলে "ফ্রানসিস টমসন্" খুলে বসলুম। এতক্ষণে আমরা ট্রেনে উঠে বসেছি। বললুম, "বেশ মজা, না? কতকটা ইলোপমেন্টের মতো লাগছে।"

সে বললে, "দূর।"

ওয়াটারলু স্টেশনে মিসেস ফিশারকে ফোন করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দিল। আগামী ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করবার ফাঁকে সে বললে, "টাকাও তো আনোনি। নাও এই যা দিচ্ছি। কী কিনতে চাও কিনে ফেল।"

একখানা রাইটিং প্যাড কিনলুম। "ফ্রানসিস টমসনের" সাথী। ট্রেনের খালি কামরা দেখে উঠলুম। কখন একটি যুবক উঠে পড়েছে। অতএব মামুলি কথাবার্তা। যুবকটি নেমে গেলে দুটি প্রৌঢ়া আরোহণ করলেন। তাঁরা নামতে নামতেই জনকয়েক গ্রাম্য ভদ্রলোক। অবশেষে আমরাই চেঞ্জের জন্যে নামলুম।

সে বললে, "এবার কিছু ফ্রানসিস টমসন্ পড়ে শোনাও।"

আমাদের ট্রেন এসে পড়ল। বই ও ব্যাগ নিয়ে আমরা যে কামরাটায় উঠলুম সেটাতে কে একজন বার্নার্ড শ'র মতো টেরি ও দাড়িওয়ালা প্রবীণ বসেছিলেন। অন্যান্য লোক ভিড় করে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "ওই দেখ বক্স্ হিল্। পাহাড়টা চক খড়ির। যেখানে সেখানে ঘাস উঠে গেছে। চক দেখতে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি।"

"ওই শোনো একটা কুকু ডা কছে। শুনতে পাচ্ছ?"

"না।"

"থেমে গেছে।"

ডরকিংএ নেমে আমরা বাস্ ধরলুম। তার পাস্'টা ততক্ষণে আমার হয়েছিল। উটন হ্যাচের টিকিট। তখন সাতটা বেজে গেছে, কিন্তু রোদ যেন দুপুর বেলার রোদ। লীথহিলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার পথ ঘন বনের মধ্যে। তার চোখ কান ঘ্রাণ উদগ্র আগ্রহে গাছ পাখি ফুলের সঙ্গে তন্ময় হয়ে গেল। "উড পিজনের ডাক শুনেছ? তোমাদের ভারতবর্ষের কুকু বুঝি অমন ডাকে?"

"না, ভারতবর্ষের কুকু ডাকে কুউউ। একটানা মেলডি। তোমাদের কুকু বলে কুক্-উ। দুটো নোট। আর তোমাদের উড পিজন ডাকে কতকটা আমাদের ঘুঘুর মতো।"

"দেখ দেখ, ব্লু বেল ফুল দিয়ে ছাওয়া জমিটুকু যেন একখানি গালিচা।"

"জলের ঝর ঝর শুনছ?"

"তা আর শুনছিনে?"

বনের শেষে যেখানে পৌঁছলুম সেটার নাম ক্রাই-ভে স্ট্রীট, কিন্তু শহর নেই, গ্রামও নেই। জলার ধারে একটা সরাই, নাম স্টীফান ল্যাংটন। দেখা গেল সরাইতে বসে গ্রামের লোক গান করছে। কাছাকাছি এক জায়গায় বসে আমরা কিছু শুকনো প্রুন (prunes) খেলুম, আর কিছু কিসমিস। গোটাকয়েক ওয়াটার ফাউল ডানা ঝাপটে জল সরগরম রেখেছিল। তবু যে দু'একটা মাছ সাহস করে মাথা তুলছিল না তা নয়। অবশিষ্ট প্রুনটা তাকে দিয়ে বললুম, "জানো তো, শেষের রুটিখানা বা ফলটা যে খায় সে বছরে হাজার পাউণ্ড বা সুন্দর স্বামী যেটা হোক একটা পায়।" সে মিষ্টি হাসল।

জিনিসপত্তর হাতে ধরে ও ঝুলিয়ে আমরা উঠলুম। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পরে আমাদের ফার্ম হাউসে পৌঁছানো। পথে একদল গ্রাম্য ছেলেমেয়ে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। ফার্মহাউসে যখন পৌঁছই তখন সূর্য ডোবে। কিন্তু গোধূলির আভায় দিগঙ্গনার মুখ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে যেন আমার সঙ্গিনীর মুখ।

২

দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল। মহিলাটির চলনে বলনে চাহনিতে কেমন এক দুঃখের স্থিরতা। যেন বুকের উপর পাষাণ চেপে রয়েছে। আমার সঙ্গিনী বললে, "আমার বান্ধবী মিস লায়নের আজ এখানে আসার কথা ছিল। তাঁর অসুখ। তাঁর বদলে আমি এসেছি। আমার এই বন্ধুটিকে একখানি ঘর দিতে পারেন কি?"

মহিলাটি ভেবে বললেন, "বোধ হয় পারব।"

মহিলাটি ঘর তৈরি করতে চলে গেলে পর আমি পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম করে বসলুম। বললুম, "ঘর পাওয়া গেছে ভালোই, নইলে পাহাড়ে ওঠা নামা করে আর-কোথাও ঘরের খোঁজে বেরোনো আমার সামর্থ্যে কুলোত না। হাঁ, যেতুম বটে বাড়ি খুঁজতে যদি একখানা ট্যাক্‌সি করে আমাকে পাহাড় থেকে নামাতে। কিংবা একখানা এরোপ্লেন করে।"

"দুঃখের বিষয় দশ মাইল না হাঁটলে কোনোখানাই পাওয়া যায় না।"

"অগত্যা তোমাকেই গোলাঘরে পাঠিয়ে তোমার ঘর আমি দখল করতুম।"

এবার আমরা হাত মুখ ধুতে গেলুম। মহিলাটি আমাদের জন্যে ডিম রুটির বেশী আর কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। সে ডিম খায় না বলে মুশকিলেই পড়ত যদি না কৌটাবদ্ধ সারডিন বাড়িতে থাকত। সে বললে, "তোমার জন্যে কোকো করতে বলেছি।"

আমি বললুম, "খালি দুধই সব চেয়ে পছন্দ।"

"তোমাকে না মিসেস নরউড্ রোজ রাত্রে কোকো খাইয়ে ঘুম পাড়াত?"

"ও বদ অভ্যাসটা মিসেস ফিশার ছাড়িয়েছে। এবার খালি দুধ ধরেছি।"

"সেই ভালো। ফার্ম হাউসে খাঁটি দুধ পাবে, আর তাজা।"

সত্যই দুধটা ছিল সুন্দর। সে কিন্তু দুধ খায় না।

সাপারের শেষে খানিকটা বাইরে বেড়ানো গেল। আঁধার হয়ে আসছে দেখে সে বললে, "তবে উপরেই যাওয়া যাক আমার ঘরে।"

তার ঘর থেকে পশ্চিম আকাশের তখনো কিছু আভা দেখা যাচ্ছিল। যত দূর চোখ যায় গাছপালা। ফার্ম হাউসের মাঠে একটা ঘোড়া চরতে চরতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘুমের ঘোরে। কুকু তখনো ডাকছিল।

সে বললে, "দুটো কুকু।"

আমি বললুম, "একটা।"

ব্ল্যাকবার্ডের কণ্ঠে শ্রান্তির সুর। বাতাস বয়ে আনছিল গর্স্ (gorse)এর সুগন্ধ। ঘোড়াটা বসল। তার পরে গড়াগড়ি দিতে দিতে মড়ার মতো শুলো। আমরা এই উপলক্ষে কিছু পশুতত্ত্ব আলোচনা করলুম। একটা ব্যাঙ ডাকছিল কতক দূরে। একটা ঝিঁঝিঁ পোকা কিছু কাছে।

অন্ধকার যখন সবাইকে ঘুম পাড়ালো তখন সে বললে, "এবার তোমার ঘুমোবার সময় হয়েছে।"

আমি ঠিক করে ফেললুম আর মায়া বাড়াব না। এই পর্যন্ত আমরা আমরা। এর পর থেকে সে সে, আমি আমি। বোধকরি একটু ক্ষিপ্র গতিতে তার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলুম। তাকে কোনো কিছুর অবকাশ না দিয়েই বললুম, "গুড-নাইট।"

সে প্রায় ছুটে এলো, আমার মাথাটিকে দু' হাতে ধরে, দুই গালে দুটি

চুমু খেলো। আমি কৃতজ্ঞতার ভারে তার বাহুতে ভেঙে পড়লুম। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বললুম, "আজ সারা সকাল দুপুর কী ভেবেছি জানো?"

"কী ভেবেছো?"

"ভেবেছি, আজ যদি তাকে না দেখি তো বাঁচব না। দুটি দিন দেখিনি। মনে হচ্ছিল দুটি বছর।" সে চুপ করে রইল। বললুম, "কোনো প্রার্থনা নিষ্ফল হয় না। এক মনে ডাকলেই সাড়া মেলে।"

বিদায় নিতেই হলো। তবু মনটা ভরে রইল। গাছ পাখি ফুল থেকে তার মন প্রাণ ফিরিয়ে এনে সে আমার গালে ধরে দিল। আমার ঘরে যখন গেলুম তখন খোলা জানালা দিয়ে গর্সের সুবাস এসে আমার বিছানায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লুম। তন্দ্রার শেষের দিকে বোধ হচ্ছিল কত কাছাকাছি আমরা এসেছি। মাঝখানকার দেয়ালটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে আমরা একই ঘরে পাশাপাশি শয্যায়।

সকালে উঠে প্রথম ভাবনা, দাঁত মাজি কেমন করে? মুখ ধোবার জায়গায় যে সাবানখানা ছিল তাই দিয়ে কাজ চালানো গেল। চুল আঁচড়াই কেমন করে? মোমবাতির সঙ্গে যে দেশলাইটা ছিল তার গোটা পাঁচেক কাঠি মিলিয়ে চিরুনির মতো করলুম। কিন্তু দাড়ি কামাবার উপায় কিছুতেই খুঁজে পাইনে। সসংকোচে নিচে নামলুম। পোড়ো জমিটাতে দু'তিন ডজন মুরগীর ছানা কিলবিল করে চরে বেড়াচ্ছিল। যিনি যত সদ্য ডিম থেকে বেরিয়েছেন তাঁরই ব্যগ্রতা তত বেশী। ঘোড়াটা অনেকক্ষণ উঠেছে। পাখিরা এতক্ষণে অর্ধেক কাজ বা অকাজ করে রেখেছে। ন'টা বাজে। তারা উঠেছে চারটের আগে। গোধূলির সঙ্গে।

সে নিচে নেমেই বললে, "তোমাকে একটা নতুন পাখির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। Yellow Hammer."

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন ঘুমুলে?"

"একেবারেই ঘুমুতে পারিনি। নতুন জায়গা বলেই বোধ হয় কেমন কেমন লাগল। এ বাড়িতে একটি খোকা আছে দেখেছ?"

"না। পুরুষ মানুষ এক আমি ছাড়া আর কেউ আছে বলে তো মনে হয়নি।"

কালকের সেই মহিলাটি আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেলেন। পাফ্‌ড্‌ রাইস্‌ যা ছিল তা একজনের মতো। বললুম, "তুমি যখন ডিম খাবে না এবং

বেকন যখন দু'জনেই খাব তখন ওটা তোমারই ভাগে পড়ে। তা ছাড়া অমন নরম মুড়ি ভারতবর্ষের লোকের মুখে রোচে না। আমাদের মুড়ি মুড় মুড় করে।"

সে আমাকে চা ঢেলে দিলে। আমি তাকে রুটি কেটে দিলুম। জোর করে একটুখানি বেকন দিতে গেলুম। উল্টে আমারই পাতে ফেলে দিলে। বললুম, "বেকন আমার ভালো লাগে না।"

"ওঃ, জানতুম না। আরেক পেয়ালা চা?"

"নাঃ। তুমিই নাও।" সে আরো দু' পেয়ালা ক্রমান্বয়ে নিলে। বললুম, "একটা কমলালেবু খাবে? চমৎকার কমলালেবু এগুলি।"

"না। ফল আমি আলাদা খেতে ভালোবাসি। রাত দশটায়।"

অগত্যা আমিই খেলুম একলা।

ব্রেকফাস্টের পরে তার ঘরে যাওয়া গেল ব্যাগ নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে। আচমকা আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কোথা থেকে একটা চিরুনি বার করে আঁচড়াতে শুরু করে দিলে। "দেখ দেখি কেমন সুন্দর দেখায় তোমাকে ক্রীম না মাখলে। কেন ক্রীম মাখো?"

বললুম, "ক্রীম না মাখলে চুল ওড়ে। তোমার চুলের মতো শক্ত চুল নয় তো আমার। সিংহের কেশর তো নয়!" তার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। "আচ্ছা, আরেকটু লম্বা চুল রাখো না কেন?"

"বব্ করতে বলছ?"

"জানিনে বব্ করা কাকে বলে। আমি ভেবেছিলুম এই বব্।"

"না। এ হলো শিংল্। ঘাড়ের দিকে আরেকটু লম্বা হলে বব্।"

ভেবে বললুম, "এই ভালো। শিংল্ ছাড়া আর কিছুতে তোমাকে মানাবে না। অর্থাৎ আর কিছুতে তোমার ক্যারেকটার ব্যক্ত হবে না।"

"তা নয়। আমার চুলগুলো কোনো মতেই বাগ মানবে না। লোহার শিকের মতো সোজা ও খাড়া থাকবে, সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে এমন করা।"

গোয়ালঘর দেখতে গেলুম। গোটা পাঁচেক পুষ্টকায় গোরু। একটা নাদুসনুদুস শূয়োর। একটা ছেলে যন্ত্র চালিয়ে টারনিপ কুচি কুচি করছিল। অনেকগুলো বেড়া টপকিয়ে মাঠ পেরিয়ে ঝরা পাতা মাড়িয়ে আমরা বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। শহর থেকে উইকেণ্ড কাটাতে এসে কারা সব মাঠের কোণে caravanএ বাস করছে। গাড়ির ভিতরেই তাদের শোবার ঘর,

খাবার ঘর, রান্না ঘর, কিন্তু দিন ভালো থাকলে তারা বাইরে টেবল পেতে খায়, খেলা করে। আমি বললুম, "কারাভানেই যদি থাকতে হয় তবে জিপসীদের মতো সমস্ত ইংলণ্ড ঘুরে বেড়ানো উচিত। যেমন সেদিন সিনক্লেয়ার লুইস বেড়িয়েছিলেন।"

সে বললে, "এরাও ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু এক বছরে সবটা নয়, প্রতি বছর একটা করে জায়গা। আগামী বছর এদের কারাভান আর এখানে থাকবে না।"

আমরা বনের ভিতর এক জায়গায় বসে পড়লুম। বসতে বসতে অর্ধশয়ান। পাইন গাছের তলায়। তার মানে ছায়া যার সামান্যই, রোদ যার ভিতর দিয়ে পড়ে, এমন গাছের তলায়। ঘাসের উপর নয়, পাইনের ছুঁচের উপর বসতে তার ভালো লাগে। বললে, "ফ্রানসিস্ টমসন্ পড়ে শোনাও।"

বললুম, "তোমার গলার স্বর মিষ্টি, তুমিই পড়ো। আমি বেছে দিই। হাউণ্ড অফ হেভ্‌ন।"

বললে, "বিষম বড়। ছোট নেই?"

বললুম, "আচ্ছা, ডেজী।"

সে পড়ে চলল। যখন শেষ করল তখন আমি বললুম, "কয়েকটা লাইন ভারি সুন্দর। না? ঐ যেখানে বলছেন, 'The rose's scent is bitterness to him that loved the rose' আর 'We are born in others' pain and perish in our own."

"কাছেই ফ্রানসিস টমসন্ বাস করতেন। Meynellরা তাঁকে যত্নে রেখেছিলেন। বেচারার প্রথম জীবন কিন্তু বড় কষ্টে কেটেছিল। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতেন। রাত্রে নদীর বাঁধের উপর পড়ে ঘুমোতেন। কিন্তু সব অবস্থাতেই কবিতা লিখতেন।"

"তবু ভাগ্য ভালো বেঁচে থাকতেই যশ পেলেন। এখন তো যশ বাড়তে লেগেছে। যেখানে যাও সেখানে তাঁর সুখ্যাতি।"

"বড় আন্‌প্র্যাকটিকল মানুষ ছিলেন। ভোলা মন। কখন কী পড়তেন কী করতেন—একেবারে ছেলেমানুষ।"

"ওটা কবিপ্রকৃতি। ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল শেক্‌স্‌পীয়র বা ভিকটর হুগোর মতো মহাকবিদের বেলা। ওঁদের ব্যবসায় বুদ্ধিটা ছিল কবিপ্রকৃতির মতোই জোরালো।"

"এবার দেখ ক'টা বেজেছে। উঠতে হবে।"

সাড়ে এগারোটা। ওঠা গেল। চলতে চলতে কত কথা। একটা টাওয়ার। সেকালে যারা মাশুল এড়িয়ে জাহাজের জিনিস বাজারে চালান দিত তাদেরই গড়া কিংবা তাদের ধরবার জন্যে গড়া। গোটাকয়েক কমলালেবু কিনতে পেয়ে কিনলুম। মাটিতে বসে বহু দূরস্থিত সমুদ্রের দিকে তাকালুম। সে বললে, "সমুদ্র ত্রিশ মাইল দূরে।"

আমি বললুম, "অত না।"

প্রথম লেবুটা প্রায় পচা। সে বললে, "আর একটা খাও।" তাকে আর একটা খেতে বলায় সে কিছুতেই খেলো না। তখন সেটাকে বিতরণ করার জন্যে তুলে রাখলুম।

সে বললে, "কবি ট্রিভেলিয়ানের নাম জানো নিশ্চয়। সেই যিনি গ্রীসের বিষয়ে লেখেন। তাঁর বংশের সবাই ডিপ্লোমাট বা পলিটিসিয়ান। তিনি কিন্তু দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। কেবল কবি নন, গ্রীসের কবি। বিয়ে করেছেন এক ডাচ চিত্রকরকে। সুখী দম্পতী। এই পাহাড়ের তলায় তাঁদের বাড়ি।"

রবিবার। লণ্ডন থেকে বহু লোক বেড়াতে এসেছে। গাছতলায় বসে একদল স্ত্রী পুরুষ বনভোজন করছে। দূরবীণ চোখে দিয়ে কেউ কেউ সমুদ্র দেখছে। কেবল যে মেয়েটি চকোলেট ও কমলালেবু বিক্রি করছিল তার ছুটি নেই। বনের খানিকটা কাটা গেছে জার্মান যুদ্ধের বন্দীদের দিয়ে। যুদ্ধের সময় নরওয়ে থেকে কাঠ আসা বন্ধ ছিল বলে বনের সৌন্দর্য হ্রাস। সে করুণ নয়নে চেয়ে রইল। যেন বনের ব্যথা তারও ব্যথা। কারা সব বনভোজন করে রাবিশ ছড়িয়ে গেছে দেখে তার যা রাগ। কেন ওরা নিজেদের রাবিশ নিজেরা বাড়ি নিয়ে যায় না? ওদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

আমরা পথ হারিয়েছিলুম। বাঁকা পথে ঘুরে ফিরে এক জায়গায় দেখি কতগুলি ছেলেমেয়ে গাছে চড়ছে ও গাছের তলায় খেলা করছে। আমার হাতের সেই কমলালেবুটাকে বিতরণ করার সময় এলো। তিনটি খুকীর সামনে গিয়ে বললুম, "কাকে এই কমলালেবুটা দিই বল তো?" একটি খুকী একটুও দ্বিধা না করে বললে "আমাকে।" তাকেই দিলুম। সঙ্গিনী তাকে অনুরোধ করলে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে। মজা এই যে খুকীর দাঁত বলতে গুটি চার পাঁচ। তবু তার দাবি বলতে গোটা কমলালেবুটা।

খুকীদের কাছ থেকে পথের সন্ধান যোগাড় করে আবার সেই ক্যারাভানওয়ালাদের মাঠ বেয়ে বাসায় ফেরা গেল। দুটো ঘোড়াকে দুটি খুকী কী যেন খাওয়াচ্ছিল, ঘোড়া দুটি অখণ্ড মনযোগ সহকারে খাচ্ছিল।

আমরা ফিরতেই গৃহকর্ত্রী ডিনার দিয়ে গেলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা আরম্ভ করতে পারলুম না।

৩

রোস্ট বীফ, ভাজা আলু, সিদ্ধ শাক। ডিম কাস্টার্ড, গুজবেরী, রুবার্ব। সে খুব আস্তে আস্তে খায়। বকবক করবার অবসর আমারই বেশী।

আমি বললুম, "রেবেকা ওয়েস্ট এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'মেয়েরা বড় বেশী ব্যক্তিবিশেষ হয়ে উঠছে। এটা কাম্য নয়।' কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষরাও যখন অত্যন্ত বেশী ব্যক্তিবিশেষ হয়ে উঠেছে মেয়েরাও না হয়ে পারে না। ভাইয়ের পক্ষে এক নিয়ম ও বোনের পক্ষে আরেক নিয়ম খাটে না। এই জন্যে খাটে না যে ওরা একই মালমশলা দিয়ে তৈরি। বোনের মধ্যেও খানিকটা পুরুষ আছে, ভাইয়ের মধ্যে খানিকটা নারী।"

সে হেসে বললে, "তাই বোধ হয় কেউ কেউ বলে থাকে রেডমণ্ড যদি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হতো আর রোজালিণ্ড হতো মেয়ে না হয়ে পুরুষ তবেই তাদের ঠিক মানাত।"

"প্রকৃতি তো এগারো ঘণ্টা ধরে সেই চেষ্টাই করে এসেছিল। এগারোটার সময় হঠাৎ তার হাত বেঁকে গেল, সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। তোমার উপর ভুল করে খানিকটা নারীত্বের আরক ঢেলে দিয়ে দেখে, সর্বনাশ! এ যে পুরুষালি মেয়ে।"

"আচ্ছা, তুমি কি সত্যি মনে করো যে নারী হয়ে বা পুরুষ হয়ে জন্মানোটা একটা আকস্মিক ঘটনা? এর পিছনে বিধাতার অভিপ্রায় বা নিজের মনস্কামনা নেই?"

"একশোবার আছে। আমি ঠাট্টা করছিলুম না। নিছক ঠাট্টাও নয়। আসল কথা, আমাদের মধ্যে যেটি ব্যক্তি সেটি গভীরতর। যেটি নারী বা পুরুষ সেটি ভাসাভাসা। আমি যে আমি এইটে আমার চরম পরিচয়। আমি যে পুরুষ এটা আমার গুণ।"

সে এবার আর একটু রুবার্বের রস ঢেলে দিলে। যত বললুম, "আজ একটু কাস্টার্ড খাও", খেলো না। ছ'ঘণ্টা পরে জানলুম আমার কথা না রেখে আমাকে বাঁচিয়েছে। কাস্টার্ডের ডিম তার মাথা ধরার কারণ।

খাওয়া শেষ হলে সে বললে, "আমি যাচ্ছি। একটু রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমোব। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।" এই বলে একটা বালিশ চেয়ে আনল। যেখানে গর্সের কাঁটা পড়ে ঘাস থেকে নরমত্ব চলে গেছে, যেখানে মাটি আবড়া খাবড়া ও আগাছা পরগাছা গায়ে ও পায়ে খোঁচার মতো বিঁধছে সেইখানেই তার শোবার ইচ্ছা। আমি কিন্তু অমন জায়গার ত্রিসীমানায় বসতে পারব না, তাই অনেক ঘুরে তার ও আমার উভয়ের রুচি মিলিয়ে অনেক কষ্টে এক অর্ধেক কাঁটাবন ও অর্ধেক নরম জমি আবিষ্কার করা গেল।

আমার রাইটিং প্যাডখানাকে উল্টেপাল্টে দেখলে। দেখে বললে, "একটাও কবিতা লেখোনি যে। এই বেলা লেখো বসে।" এই বলে বালিশ পেতে মাথা রাখলে। ভাবলুম সে আর কথা বলবে না, ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু কেমন করে কী জানি তর্ক উঠল আমাদের ইহকালের অভিজ্ঞতাগুলো আমরা পরকালে নিয়ে যাব কিনা। আমি বললুম, "কখনো না। অভিজ্ঞতার বোঝা বয়ে নিয়ে গেলে সেই বোঝার ভারে নুয়ে পড়ব, নতুন অভিজ্ঞতা কুড়োব কেমন করে?

সে বললে, "এত কষ্ট করে যা কিছু শিখলুম তার কিছুই যদি সঙ্গে না নিলুম তবে শিখলুম কেন?"

আমি বললুম, "শিখলুম শেখানোর জন্যে। নিলুম দেবার জন্যে। জন্মের পরে যা কিছু হয়েছি মরণের আগে সব হওয়াটি জগৎকে ধরে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা খালাস। দেহ বলো, মন বলো, স্মৃতি বলো, শিক্ষা বলো. ইহকালের কোনো ধারই পরকালে ধারব না।"

সে ভীষণ অবাক হয়ে রইল। তার চিরন্তন হাসি মুখ থেকে নিবল না বটে, তার চিরন্তন শিশু-চোখ রহস্যের পাতালপুরীতে মুক্তা খুঁজতে নেমে গেল।

"কী ভাবছ?

"ভাবছি তুমি যা বললে তা কি সত্যি?"

"কেন সত্যি নয়? মনুষ্যত্বের বোঝা বয়ে কাঁহাতক আমরা অনন্তকাল চলব? এখনো কত হওয়াই বাকী। ফুল হতে হবে, গাছ হতে হবে, তারা

হতে হবে, সূর্য হতে হবে। কত কী যে হতে হবে কে জানে! জানবার জন্যেই মরা দরকার। মানুষ হওয়াটাই যে শেষ হওয়া বা সেরা হওয়া এ কুসংস্কারটা তোমারো আছে নাকি?"

এবার সে চোখ বুজে বললে, "থামো। ঘুমোতে দাও। কাব্য লেখ।"

কাব্য লেখার ইচ্ছা আমার আদপেই ছিল না। কাব্য ভোগ করবার এই যে সুযোগ একে আমি যেতে দেব না আজ। তার মুদিত মুখখানির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলুম। কোনো ভাস্কর যেন শাদা পাথর কুঁদে গড়েছে। নিটোল সুষম শক্ত। চোখ দুটি পদ্মকোরকের মতো। বড় নম্র, বড় নিরীহ। তার চরিত্রের দৃঢ়তা তা হলে কী দিয়ে ব্যঞ্জিত হবে? ওষ্ঠ দিয়ে। শোবার আগে সে গা থেকে জুতো ও মোজা খুলে ফেলেছিল। তার খালি পা দেখে মনে হচ্ছিল তার ঐ অঙ্গগুলি যেন সবচেয়ে কচি।

তার ঘুম আসেনি বুঝতে পারছিলুম। আবেদন জানালুম, "আমারও ঘুম পাচ্ছে।"

সে বললে, "তবে জুতো খুলে ফেল তুমিও।"

আমার মাথার জন্যেই ভাবনা, জুতোর জন্যে নয়। এ কথা তন্দ্রামরীকে বুঝিয়ে বললুম। তখন বালিশের আধখানা ছেড়ে দিলে। সে বোধ হয় মিনিট দশেক ঘুমুতে পারলে। আমার ঘুম এলো না। মুক্ত আকাশ, মেঘহীন, দীপ্ত নীল। বাতাসে ফুলের গন্ধ। চোখ মেললে কত শত যোজন দেখা যায়। ঘুমুতে আমার মায়া করছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছিল তার চোখের উপর চোখ রেখে দেখি সে কি সত্যি ঘুমিয়েছে? তার ঘুমন্ত শ্রী দেখতে দেখতে আমার এই কথাটি মনে হচ্ছিল যে সে সমস্ত সত্তার সঙ্গে ঘুমোয় না। সে ঘুমোয়, কিন্তু তার ওষ্ঠে মৃদু হাসি জেগে থাকে।

আবছায়ার মতো মনে হচ্ছিল আমি তার কত কাছে এসেছি। এক বালিশে মাথা রেখে মুখের কাছে মুখ আনা। সে যদি আমারই মতো মানুষ হয়ে থাকত তার বিপদ ঘটত। কিন্তু সে মিরাণ্ডা, সে প্রকৃতিসরল।

কেমন করে সে বুঝতে পারলে আমার ঘুম আসছে না, তাই তারও ঘুম এলো না। বোধ হয় তার অস্বস্তি বোধ হলো। কখন দেখি বালিশের উপর দুটি হাত রেখে হাতের উপর মুখ রেখে আমাকে দেখছে। বললে, "তোমার চুলগুলি যদি এই রকম থাকে তো আমার দেখতে ভালো লাগে।"

আমি খুশি হয়ে বললুম, "যে আজ্ঞে। ক্রীম কিনতে আমার যে খরচ সেটা তা হলে বাঁচবে।"

চায়ের সময় হলো দেখে আমরা উঠলুম। সে কিছু স্কোনের গায়ে মাখন মাখিয়ে খেলো। আমি গোটাকয়েক কেক। ক্ষিদে ছিল না। আটটার সময় লণ্ডনে ফিরব, টাইমটেবল দেখে ঠিক করা গেল। সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়া যাবে গৃহকর্ত্রীকে বলে। ডরকিংএ ট্রেন ধরে ট্রেনে সাপার খাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি উপরে গেছলুম। নিচে এসে দেখি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পার্সটা পড়ে আছে। পার্সটা সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল গৃহকর্ত্রীর প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার জন্যে। পার্সটা আমি পকেটে পুরলুম দুষ্টুমির মতলবে।

আটটার সময় আমরা রওনা হব এটা স্থির করে বেড়াতে বেরোলুম। রবিবার কাটাতে লণ্ডন থেকে অনেকে এসেছে। কেউ মোটরে, কেউ মোটর সাইকেলে, কারা সব পায়ে হেঁটে। এক ঝোপের আড়ালে শখের অপেরা অভিনয় চলেছে। একটি তরুণী উঁচু মাটির উপর দাঁড়িয়ে সুর করে কী একটা প্রেমের গান গাইছে। তার উত্তরে একটি যুবক নিচের মাটিতে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়াচ্ছে ও গান গাইছে। দলের লোক হাততালি দিচ্ছে।

একটি তরুণ পিঠে রুকসাক বেঁধে পথ চলেছে, তার গলায় হাত জড়িয়ে তার সাথী হয়েছে একটি তরুণী।

আমরা অনেক দলের কাছ দিয়ে অনেকের ভিতর দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে আবার এক কাঁটাবন বেছে অর্ধশয়ান হলুম। আমার আপত্তিটা প্রথমে সে না-মঞ্জুর করল, কেননা কাঁটাবনের চেয়ে সুখকর আর কী থাকতে পারে! পরে যখন বললুম, "তোমার মতো আমার পোশাক তো পশমী খদ্দর নয়, আমার এটা পাৎলা টুউড। পোশাক নষ্ট হলে তুমি সাত গিনি দেবে?" তখন সে বললে, "তবে ওঠ।"

তখন আমি এত হাসতে লাগলুম যে কারণ বুঝতে না পেরে সে মহা বিব্রত হয়। "ব্যাপার কী? আমার মধ্যে এমন কী দেখলে যেটা হাস্যকর?"

"তোমার মধ্যে নাও হতে পারে।"

"তবে আমার জিনিসপত্রের মধ্যে?"

"বলব না। বলব যদি এক পাউণ্ড দিতে রাজি হও।"

"এক পয়সাও না।"

"দশ শিলিং।"

"এক কাণাকড়িও না।"

"আচ্ছা, আধ ক্রাউন দিলেই চলবে।"

"না।"

"তবে হো হো হো হো—"

আমার হাসির বাণে তার মুখের অবস্থাটা বিপন্ন বোধ হলো দেখে আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললুম "তোমার মতো সৃষ্টিছাড়া মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছে! যত রাজ্যের কাঁটাবন বেছে বেছে বসো কেন?"

তখন সে যেন একটা কিনারা পেলে। তার মুখে হাসির রেখা দেখা দিলে। সে বললে, "এর পর তুমি উইকেণ্ডে এলে মিসেস্ নরউডকে এনো, আমাকে না।"

আমি জুড়ে দিলুম, "এবং ট্যাকসি করে তাঁকে হাওয়া খাইয়ো এবং সিনেমায় নিয়ে গিয়ে সিগারেট খাইয়ো।"

একবার সে বলেছিল, "আমার সব চেয়ে কী ভালো লাগে জানো? পাহাড় পর্বত পাথর। তার পরে গাছপালা কাঁটাবন। পশু আমার তেমন ভালো লাগে না, মানুষও না।"

আমি বলেছিলুম, "মানুষই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে, তার পরে পশু পাখি।"

এইবার সেকথা উঠল। সে বললে, "পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠি তখন সে যে কী আনন্দ বোঝাতে পারব না। এমন একটা sense of space আর কোথাও বোধ করিনে। যেন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে মুক্তি লাভ করেছি।"

"আর কাঁটাবনে বসে কী রকম sense বোধ করো?"

"প্রাণের রোমাঞ্চন। অহরহ যে প্রাণ সঞ্চারিত পল্লবিত হচ্ছে কাঁটার খোঁচা যেন তারই সত্যতাকে জাহির করতে থাকে, ভুলতে দেয় না।"

বাসায় ফিরে চললুম, পথ হারালুম। পথ খুঁজে পেয়ে আশ্চর্য হলুম। এত সোজা পথ হারিয়েছিলুম কী করে! ফার্মহাউসে ফিরে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলুম কিছু খাবে কি না সে বললে, "ভীষণ মাথা ধরেছে।" যকৃৎ-জনিত মাথাব্যথা। ওষুধ না খেলে সারবে না। ওষুধ কোথায় পাব! অগত্যা

লণ্ডনে না পৌঁছানো পর্যন্ত মাথাব্যথা সইতে হবে। উৎসবের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে দগ্ধ হয়ে গেল।

তাকে খুশি করলে যদি বেদনার কিছু লাঘব হয় এই ভেবে হাসি তামাশা চালালুম। চুরি করে ব্লু বেল তুলব পরের বাগান থেকে। পুলিশ এসে দু' জনাকে ধরে চালান দেবে। ও পথ দিয়ে সোজা যেয়ো না গো। ঐ প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রেমালাপে ব্যাঘাত হলে ওরা অভিশাপ দেবে। দেখ, দেখ, পাঁচটি বীচ গাছ কেমন পাঁচ ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। আঁকবার মতো।

বাস্ যেখানে দাঁড়ায় সেখানে আমরা আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়েও বাস্ পেলুম না। এতক্ষণে তার মনে পড়ল পার্সটার কথা। "তোমাকে দিয়েছি?"

অতি কষ্টে হাসি চাপতে লাগলুম।

আমার একটা পকেট টিপে দেখলে। তার মুখ শুকিয়ে গেল। ঝুলিটাকে উজাড় করে ঝাড়ল। তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। "তবে কি ঐ বাড়িতেই ফেলে এসেছি? য়্যাঁ!"

তার চেহারা দেখে আমার ভয় করতে লাগল। পাছে মাথাব্যথা বাড়ে। পার্স টা যে পকেটে ছিল সেইটে তার দিকে ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। সে কী মনে করে পকেট টিপল। পার্সটার সন্ধান পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি আশ্বস্ত হলুম। বললুম, "এবার বুঝলে তো। কেন অত হাসছিলুম?"

"ওঃ! এইজন্যে!"

"তখন আধক্রাউন দিতে রাজি হচ্ছিলে না। এখন গোটা পার্সটাই আমার।"

অনেক দেরিতে যে বাস্টা এলো সেটা আমাদের ট্রেন ফেল করিয়ে দিলে। সে বললে, "চলো তবে আমার বান্ধবী মুরিয়েলের বাড়ি যাই। সে যদি দুটো ঘর দেয় তো থাকা যাবে। নয়তো পরের ট্রেনে লণ্ডন।" তার মাথাব্যথার জন্যেই ছিল আমার মাথাব্যথা। তাই সে যখন তার বান্ধবীর বাড়িতে আমাকে নিয়ে পৌঁছল তখন আমি আলাপ পরিচয়ের পর মুরিয়েলকে বললুম, "একমাত্র এঁর জন্যে জায়গা আছে তো ভালোই। আমার জন্যে ভাববেন না।"

মুরিয়েলের বন্ধু জো আমাকে কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়ে চললেন। সঙ্গিনী বললে, "আমার পার্স থেকে আমাকে সামান্য কিছু দিয়ে বাকিটা তুমি রেখো।"

আমি তাকে খ্যাপাবার জন্যে বললুম, "তোমার পার্স কিসের? আমার পার্স থেকে তোমাকে কিছু দান করে বাকিটা আমি পকেটে পুরলুম।"

তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কিন্তু পরিহাস করবার মতো অবস্থাও বিদায় নিল। সকলের সামনে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সাজতে হলো, যদিও তার পীড়িত মুখখানির দিকে চেয়ে আমার মন কেমন করছিল। সারা রাত তাকে মনে পড়ছিল যখন তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলুম যে আমাদের দু'জনের দেহ যত দূরেই থাক আমাদের আত্মা তো অভিন্ন।

পরের দিন সকালে দু'জনে মিলে ওয়াটারলু ফিরে এলুম। তখনকার বিদায়টাই সত্যকারের বিদায়। কেননা দিনের কোলাহলে ও কাজকর্মের মাঝখানে দু'দিনের একত্রবাস স্বপ্নের মতো অলীক বোধ হলো।

(লণ্ডন ১৯২৯)

বাংকা বধূ

১

কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কনক শুনতে পেয়েছে কে যেন ছাদের উপর পায়চারি করছে। আজ সকালে দাড়ি কামাবার সময় সে-কথা তার মনে পড়ল।

মেনকা? ছাদে ওঠার বাতিক মেনকার আছে বটে, কিন্তু নিশুতি রাত্রে! ভূত? ভূতকে কনক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অবিশ্বাস করে। রাত্রিতে, দুটি মানুষের সংসার, ছাদে যদি কেউ উঠে থাকে তো সে মেনকাই। অথবা কনকের অলীক কল্পনা।

কনক যখন বাগানে এসে মেনকার প্রতীক্ষা করবে ভাবছে, দেখল মেনকা গালে হাত দিয়ে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে। রাতের কাপড় ছাড়েনি। অবাক হবার কারণ ছিল কনকের। মেনকা শেষ রাত্রে উঠে পোনীতে চড়ে বেড়িয়ে আসে, কনক ঘুম থেকে জাগে, দু'জনের মিলন হয় বাগানে। দু'জনে মিলে নদীতে সাঁতার কাটতে যায়।

"মে, তোমার অসুখ করেছে?"

মেনকা যখন হাসে তখন তার চোখের পাপড়িগুলি বুজে আসে। যেন হাসি নয়, আবেশ। মেনকা উত্তর দিল না।

কনক শুধাল, "আজ ঘোড়ায় চড়া হয়নি?"

মেনকা ঘাড় নাড়ল। মুখ তুলল না।

"মে, তুমি দিন দিন বড় অনিয়ম করছ। কেন যাওনি?"

"ভালো লাগে না একা যেতে।"

কনক ভেবে বলল, "হুঁ।"

২

বিয়ের পূর্বের সঙ্গে বিয়ের পরের কত তফাৎ। মেনকাকে যখন প্রথম দেখে কনক তখন সে তার ইস্কুলের সব ক'টা দৌড়-ঝাঁপে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, সে ছোরাখেলায় অদ্বিতীয়া, তার শরীরের গড়ন এমন সুষম যে

ভিনাস ডি মিলোকে মনে পড়ে যায়। ইতিপূর্বে কনক ভালো ভালো সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, "ম্যাট্রিক পাস করা দুগ্ধপোষ্য বালিকা।" কিংবা "বিশ্রী রকম সেকেলে ব্রীডিং।" কিংবা "রং নিয়ে কী করব! আমি চাই গড়নের সিমেট্রি।" সেই কনক একদিন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় গিয়ে একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে মনে মনে বরণ করল।

বন্ধুরা যে তাকে মাথা-পাগলা বলত সেটা অহেতুক নয়। মেনকাকে বিবাহ করে আনার প্রথম দিন তার নিত্য কর্মের রুটিন স্থির হয়ে গেল। সে শেষ রাত্রে উঠে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে এলে কনকের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যাবে। প্রাতরাশের পর দু'জনে মিলে লাইব্রেরীতে বসে পড়বে। এগারোটার সময় কনক অফিসে গেলে মেনকা সারা দুপুর কাঠ পাথর কুঁদে মূর্তি বানাবে।

কনক বলেছিল, "একটা অতি সাধারণ গিন্নীবান্নি হয়ে ব্যর্থ হবে, মে! নিজের জীবনটাকে বড় স্কেলে নির্মাণ করো। আপাতত তোমাকে ভাস্কর্য দিয়ে আরম্ভ করতে বলছি। ক্রমে তোমাকে দিয়ে সৌধ নির্মাণ করাব।" মেনকা তার কথা বুঝতে পারে কি পারে না তা নিয়ে কনক মাথা ঘামায় না। সে তো বোঝবার জন্যে কথা বলে না। প্রভাবিত করার জন্যে বলে।

চায়ের পর টেনিস। অতঃপর দুগ্ধ পান করে দুগ্ধপোষ্য বালিকাটি নিজের ঘরে ঘুমোতে যায়। এবং সাপার খেয়ে সরকারী কাগজপত্র নিয়ে কনক বসে আফিস-ঘরে। এই পর্যন্ত কনককে বেগ পেতে হয়নি। মেনকা উৎফুল্ল হয়ে রাজি হয়েছে। সে তো খেলা করতে পেলে আর কিছু করতে চায় না। তবু ভাস্কর্য তাকে পাগল করেছে। কনক বলেছে, "মে, তোমার দেহের গড়নটি sculpturesque, কার সাধ্য যে বলবে তন্বলতা। মে, তুমি একখানি জীবন্ত sculpture!" সে কথা শুনে মেনকার উৎসাহের অবধি নেই। ভগওয়ানদাস বেহারার আট বছরের মেয়ে লছমী হয়েছে তার মডেল।

মেনকা বেঁকে বসল কনক যখন বিধান দিল, "দিনের বেলা ফ্রক পরতে হবে কাজের সুবিধার জন্যে। রাত্রে তুমি যা খুশি পরতে পারো। দ্রৌপদীর মতো দীর্ঘকেশ দ্বাপর যুগে বেশ ছিল, কলি যুগে অচল। বব্ করতে হবে। দৈনিক দু' হাজার দু'শো পঞ্চাশ ক্যালরি পরিমাপ খাদ্য খেতে হবে। তার মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদির অনুপাত এক চুল বেশী কম হবে না। এবং ভাইটামিনের জন্যে কাঁচা সবজি চিবিয়ে খাওয়া চাইই।"

এই নিয়ে মেনকা এখনো মাঝে মাঝে সত্যাগ্রহ করছে। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। বেশ সম্বন্ধে কনক পীড়াপীড়ি করছে না। পাছে স্বামীকে ভয় করতে, লজ্জা করতে, কামনা করতে শেখে, পাছে স্বামীসচেতন হয়, এই আশঙ্কায় কনক মেনকাকে অধিকবয়সী মহিলাদের সঙ্গে মিশতে দিত না। ওঁরা যদি তার বালিকা বধূটিকে পাকিয়ে তোলেন! তথাপি কেমন করে মেনকা তাকে "ওগো" বলে ডাকতে শুরু করেছে। সেদিন বলছিল, "না গো, আমি এত বেশী দুধ খেতে পারব না।" অন্য সময় হলে কনকের কানে বেসুর বাজত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মেনকা শাড়ি পরে সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। তখন তার মুখে "ওগো" শুনতে মিষ্টি লাগে।

৩

চায়ের সময় কনক জানতে চাইল, "মে, কাল রাত্রে ছাদে পায়চারি করছিল কে?"

মেনকা উত্তর দিল, "কিছুতেই ঘুম আসছিল না।"

"একলাটি ঘুম আসছিল না?" রসিকতা করল কনক।

"ধ্যেৎ!" মেনকা রেঙে উঠল।

চায়ের পর মেনকা বলল, "আজ কিন্তু আমি টেনিস খেলতে পারব না।"

"কী করবে সেই সময়টা?"

"লক্ষ্মীটি, তুমি রাজি হও। আমার সেজবৌদিদির বাপের বাড়ি এই শহরে। এতদিন যাইনি বলে তাঁরা নিজেরাই আজ এখানে আসতে চেয়েছেন।"

"অসম্ভব। টেনিস বন্ধ রাখা যায় না। আরেক দিন চায়ের নিমন্ত্রণ কোরো। আমিও তোমাদের আলাপে যোগ দেবার সুযোগ পাব।"

প্রস্তাবটা মেনকার মনে ধরল। সে চিঠি লিখে তাঁদের নিরস্ত করল সেদিন।

টেনিসের পর কনক বলল, "বুঝলে গো, মে। আজ টেনিস বন্ধ রাখলে অন্তত একশো ক্যালরি খাবার কমাতে হতো। তার ফলে তোমার ওজনের আধটি ছটাক কমে যেত।"

মেনকা স্বামীর মুখে চোখ রেখে মিষ্টি হাসল। বলল, "মরণ হলেই বাঁচি!

আমার জন্যে এত বেশী ভেবে তোমার নিজের চেহারা কী হচ্ছে আয়নার কাছে গিয়ে দেখো।"

সে কথা কনক জানত। কনকের হৃদয়ের কীট তার দেহকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। ভেবেছিল মেনকাকে বিবাহ করলেই মে'কে ভুলতে পারবে। কিন্তু ভুলতে পারল কই! কত বার মেনকাকে একটি চুম্বন দিতে সাধ গেছে। কিন্তু মে'র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে না? যে মুখ দিয়ে মে'কে চুম্বন করেছে সেই মুখ দিয়ে মেনকাকে! আগে মে'র স্মৃতি মিথ্যা হয়ে যাক, আগে মে'র বিবাহসংবাদ আসুক।

কনক বলল, "আমার কথা আলাদা।"

"কেন আলাদা। বলছ না কেন? বল না!"

"ছেলেমানুষ। আগে বড় হও।"

"ইস্। নিজে তো ভারি বড়! দেখলে মনে হয় উনিশ কুড়ির বেশী নয়।"

"আশ্চর্য! না? তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে কেউ ভাববে না যে দ্বিতীয় পক্ষ চলছে। অথচ—"

মেনকা কনকের মুখে হাত চাপা দিল। "থাক, আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না।"

কনক অনেকবার আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। মেনকা এত কম-বয়সী যে গভীর সত্য বুঝবে না। বলবে "মিথ্যা" অথবা অবুঝের মতো আত্মনিগ্রহ করবে। কনক ভাবে মেনকা যে বেশী বয়সের মেয়েদের সঙ্গে মিশে স্বামীকে সন্দেহ করতে বা স্বামীর পূর্বজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে শেখেনি এই এক সৌভাগ্য। নতুবা এত দিনে কনককে জেরা করে অপরাধী সাব্যস্ত করে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসত।

৪

মেনকাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে কনক আজ রাত্রে কাজ ফেলে চিঠি লিখল। লিখল—

ফ্লোরেন্সে, মে ডারলিং, কী বলেছিলে মনে পড়ে? বলেছিলে, "তুমি তো মানুষ নও। ফ্রা এঞ্জেলিকোর ঐ যে গেব্রিয়েল দেখছ, তুমি সেই।" মে

ডিয়ার, আমাকে এখন দেখলে কী বলতে? বলতে, "তুমি তো এঞ্জেল নও। তুমি বিষয়ী মানুষ। তোমার বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, নারী হয়েছে। তুমি আদালতে উকিল মোক্তার হাঁকাও, চাপরাশিকে ফাইন করো, অপরাধীকে কারাদণ্ড দাও। তুমি দু'বেলা সেলাম লুটছ। তুমি কি আমার আকাঙ্ক্ষিত ফ্রী ম্যান?"

মে ডিয়ার, তুমি আমার উপর কোনো বৃহৎ আশা রেখো না। আমি কোনো মহৎ কীর্তি, কোনো বৃহৎ চিন্তা দিয়ে যেতে পারব না জগৎকে। বড় জোর আমার জেলার কচুরিপানা ধ্বংস করব। এই সান্ত্বনা আমার থাকবে যে আমি আমার দেশের একটি বালিকাকে ফ্রী উওম্যান হবার সুযোগ দিয়েছি। একদিন সে এমি জন্‌সনের মতো আকাশে উড়বে, জোসেফিন্ বাট্‌লারের মতো কঠোর হস্তে পতিতাকে পাঁক থেকে তুলবে, এমিলি হবহাউসের মতো শত্রুর প্রতি অবিচার ঘটতে দেবে না। এবং তোমার মতো বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপাসনা করেও ফলিত সৌন্দর্যের সাধনা করবে। সে একদিন সুন্দরী মানসীকে পাষাণে রূপ দেবে, সেই নমুনা দেখে মানবীরা সুন্দরী হবার প্রেরণা পাবে। সে একদিন সুন্দর কুটীর রচনা করবে, তার পর থেকে দেশে অসুন্দর কুটীর আর থাকবে না। সে একদিন সুন্দর পল্লী পত্তন করবে, সেই পল্লীর আদর্শ দেশময় পরিব্যাপ্ত হবে।

মেনকার মধ্যে তুমি ও আমি বাঁচব। তোমার নাম সে শোনেনি, নাই বা শুনল। আমাকেও সে চেনে না, চেনে একজন খেয়ালী সংস্কারককে, একটা বেদরদী বুরোক্রাটকে। ক্ষতি কী! সে আমাদের না চিনলেও আমরা তার মধ্যে সার্থক হব।

কনক সে রাত্রে স্বপ্ন দেখল, ভেরোনা। এই যে ভেরোনার রোমান যুগের আরেনা।...মে, আমরা ইতালীর এত জায়গা দেখলুম, কিন্তু ভেরোনার মতো ভালো লাগে না কোনোটা। জায়গা ভালো না লাগলে জায়গার দোষ নয় ততটা, আমাদের মনের অবস্থার দোষ। তুমিই বল না, ভেরোনায় আমরা যত কাছাকাছি আছি তত আর কোথাও ছিলুম কি?

কিছুক্ষণ পরে কনক দেখল রিভিয়েরার একটা ছোট্ট স্টেশনে মে নেমে গেছে কনকের জন্যে খাবার কিনে আনতে। ট্রেন চলল, কিন্তু মে এলো

না। সমস্ত ট্রেনটার করিডোর বেয়ে কনক তাকে খুঁজল, কিন্তু পেল না। সামনে দু'জন জার্মান যুবক বসে কলহাস্য করছে, কিন্তু কনকের দৃষ্টি গ্রাস করেছে চরাচরব্যাপী অন্ধকার। তার কানে প্রলয়পয়োধির ঢেউ ভেঙে পড়ছে। মার্সেলসে জাহাজ ছাড়বে কাল, কনক দেশে রওনা হবে, মে'র সঙ্গে শেষ দেখা হবে না। মে'র যে আজ রাত্রে কী দশা হবে ভাবতেও আতঙ্ক বোধ হয়। তার সব টাকা কনকের কাছে, সব জিনিস কনকের জিম্মায়। সে ফরাসী ভালো বলতে পারে না। ইংরেজী যদি কেউ না বোঝে!

ও কি তুমি, ডিয়ার! অবাক করলে! ছিলে কোথায়? এই ট্রেনের সঙ্গে জোড়া আরেক সেট কামরায়? ভগবান!

একটা দমকা হাওয়া এসে শিয়রের জানালাটা খুলে দিল। এক অঞ্জলি চাঁদের আলো কনকের মুখে ছড়িয়ে গেল। কনক চোখ চেয়ে দেখল, তার একান্ত নিকটে মেনকা শুয়ে আছে। পূর্ণ চাঁদের আলো তার মুখে পড়ায় এত সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন মে ও' নীলের শুভ্র মুখ। কনক নির্নিমেষে অবলোকন করল। মেনকা আর বালিকা নয়, মেনকা নারী।

নারী। হাঁ, নারী বৈকি। বেশী বয়সের বিবাহিতা মহিলারা এই বালিকাটিকে নারী করে তুলবে এমন আশঙ্কা কনকের ছিল। চাঁদের আলোর মতো তার মনকে আবিষ্ট করল এই সত্য যে পুরুষের সঙ্গ নিঃস্পৃহ হলেও বালিকাকে নারী না করে ছাড়ে না।

(১৯৩০)

পুত্রচরিত

১

"আপনার সঙ্গে," ভদ্রলোক ইংরেজীতে শুরু করলেন, "দেখা করবার জন্যে আপনার বাংলোয় যেতে পারিনি, বুড়ো মানুষ। শুনলুম আপনি খাস কামরায় আছেন, তাই—"

"বসুন।" আমি চেয়ার দেখিয়ে দিলুম।

"ইস্! কী ধুলো!" ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "আপনার উপযুক্ত নয়। আপনাকে আরো ভালো ঘর দেওয়া উচিত।"

আমি ভদ্রলোকের কার্ডখানা আরেকবার পড়ে দেখলুম। হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য। মিউনিসিপাল কমিশনার। কার্ডের সঙ্গে ভদ্রলোককে মিলিয়ে দেখতে লাগলুম। বয়স সত্তর হতে পারে। বেশ শক্ত আছেন, তবে চোখে একপ্রকার সজলভাব।

"বিশেষ প্রীত হলুম," তেমনি ইংরেজীতে, "আপনার সঙ্গে দেখা করে। শুধু আপনার নয়, আমার সম্রাটের সকল প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে আমি আনন্দ পাই।"

ভদ্রলোক পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পরলেন, আবার পকেট হাতড়ালেন।

"পড়ুন কী লিখেছে।" ভদ্রলোক আমার হাতে যা দিলেন তা একটি খাম। এই রকম আরো কয়েকটি খাম তাঁর হাতে রইল। আমার নামের খাম দেখে আমি খুলে পড়লুম।

একখানি মূল্যবান কাগজে দুটি ভাষায় ছাপা সংবাদপত্রের বচন। তার মর্ম হরিশ্চন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ নন্দন হর্ষবর্ধন ভট্টাচার্য সাত বৎসর কাল ইউরোপে বাস করে প্রথমে বার-য়্যাট-ল এবং পরিশেষে ডি-লিট হয়েছেন। কোথাকার ডি-লিট? প্যারিসের। কী লিখে? "বাংলা সাহিত্যের উপর ল্যাটিন প্রভাব।"

আমার তাক লেগে গেল। আমি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম সংবাদপত্রের অভিনন্দন।

"পড়লেন তো?" ভদ্রলোক সগর্বে বললেন, "প্রথমে ইচ্ছা করেছিল

প্যারিসে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু আমার পেট্রন সার ল্যান্সলট লয়েড সাহেব তাকে প্যারিস থেকে লণ্ডনে ডাক দিয়ে বললেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে করতে চাও কী? চাকরি? ব্যারিস্টার হয়েও কী চাকরি করা যায় না? সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট জজ করে দেব। হায়রে দুঃখ! এরই মধ্যে নিয়ম বদলে গেছে।"

ভদ্রলোক চশমা খুলে নামিয়ে রাখলেন। "তিন বছরেই ছেলে আমার বার-য়্যাট-ল। সার ল্যান্সলট স্বয়ং তাকে সার অতুলের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ আমার ফ্রেণ্ডের ছেলে, একে জায়গা জোগাড় করে দিন।' তিন বছরে যে পাশ করে ফেলবে, আশ্চর্য নয় কি?"

আমার এতক্ষণ পরে মুখ ফুটল। "তা তো বটেই।"

"তার পরেও এক বছর আর্টিকেল হয়ে ছিল বিলেতের এক বড় কৌঁসুলীর কাছে। স্পেশাল ফেভার। সার ল্যান্সলটের দয়া। তারপর দেশে ফিরে আসতে লিখলুম। টাকার শ্রাদ্ধ। কিন্তু ছেলে লিখল, চারশ' ব্যারিস্টার কলকাতায়। তাদের উপর টেক্কা দিতে হলে আরো কিছু শিখে যেতে হয়। আবার গেল প্যারিসে। ফরাসী ও ল্যাটিন বেশ ভালো জানা ছিল। দেড় বছরেই ডি-লিট।"

২

আমার মনে পড়েছিল প্যারিসের সেই দিনগুলি যখন ল্যাটিন কোয়ার্টারে আড্ডা গেড়েছিলুম। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এক রাশিয়ান রেস্তোরাঁতে। লম্বা, ষণ্ডা; চোখে প্যাঁস্‌নে চশমা, মুখে সিগরেট। যাকে বলে ম্যান য়াবাউট টাউন, সেই রকম হাবভাব। ফরাসীটা তখনো আয়ত্ত করেনি। গোটা গোটা করে বলে।

"আপনি বুঝি এই প্রথম প্যারিসে এসেছেন?" বাতাশারিয়া (Bhattacharya) আমাকে জিজ্ঞাসা করল। "পার্লেভু ফ্রাঁসে?" আমাকে নিরুত্তর দেখে বললে, "আচ্ছা, কোনো ভয় নেই। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।"

প্যারিসে এই দেখানো জিনিসটি নিছক স্বার্থত্যাগ নয়। এর জন্যে আমাকে স্ব অর্থ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

"এসো হে, মশিয়ে সিন্‌হা," মশিয়ে বাতাশারিয়া বললে, "আমরা অন্ত রেস্তোরাঁয় যাই। এ শা—রা আমাদের কদর বোঝে না। এদেরকে শা—মজুমদারের দল হাত করেছে। খবরদার, মজুমদারের দলে মিশো না। ও শা— একটা স্পাই।" আমি ঘাবড়ে গেলুম। চললুম দোসরা রেস্তোরাঁয়।

"দিদিমণি," বাতাশারিয়া মাদামোয়াসেলকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় সম্বোধন করলে। "দিদিমণি, সিলভুপ্লে।" পরিবেশিকা এসে দাঁড়াল। সরলদর্শনা তরুণী। গ্রাহককে খুশি করা তার কর্তব্য। নইলে চাকরি যায়। তাই তাকে হাসতেই হবে। উপায় নেই।

বাতাশারিয়া চায় তার সঙ্গে একটু বাতচিৎ করতে। তা সে রাজি হবে কেন? দু'একটা এক তরফা রসিকতার পর বাতাশারিয়া অর্ডার দিল, এটা চাই ওটা চাই। বফ্ রোতি অর্থাৎ রোস্ট বীফ তার মধ্যে ছিল।

"দিদিমণি," বাতাশারিয়া আমার পানে চেয়ে বললে, "একেবারে আমাদের দেশের মেয়ের মতো। ওর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে। ঐ রাশিয়ান ছি—গুলোর মত নয়।—লীরা মজুমদারকেই চেনে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। বফ্ রোতি আনতে বললে রাগু দ্য মুতোঁ (ভেড়ার মাংস) নিয়ে আসে। আর ওদের ওখানে ভালো ভ্যাঁ পাবার জো নেই। তবে চা'টা ওদের খাঁটি রাশিয়ান চা!"

আমি গেছলুম লণ্ডন থেকে। প্যারিসের চালচলনের অশ্লীলতা লণ্ডনে আমাদের অভাব্য। লণ্ডনে কোনো ওয়েট্রেসকে অমন করে ডাকো দেখি। সে একটা সীন বাধাবে। বলবার কিছু থাকে তো তার স্থান কাল কৌশল আছে। আর কী রুচি! ওয়েট্রেসের সঙ্গে প্রেম।

আমি দিব্যি শকড হলুম। বাতাশারিয়া দত্তকে সম্বোধন করে বললে, "কী রে দাত্তা (Datta), তুই কী বলিস? আমাদের নতুন মক্ষিরানী পছন্দ হলো?"

বাতাশারিয়া লণ্ডনে কখনো এমন চিৎকার করে কথা বলতে সাহস পেত না। আর এই সব কথা! দত্ত ছেলেটি ভিজেবেড়াল। চোখ টিপে তাকে হুঁশিয়ার করে দিলে আমার সম্বন্ধে। যেন আমি তাদের বাড়িতে চিঠি লিখে জানাতে যাচ্ছি।

"আরে যাঃ। সব শা—কে চিনি।" বাতাশারিয়া বেপরোয়াভাবে বললে। "তোমরা লণ্ডনওয়ালারা কম শয়তান নও। আমি যাচ্ছি লণ্ডনে। রোসো। আগে প্যারিসের পথ ঘাট চিনি।"

তারপর সেই মেয়েটিকে বাংলায় বললে, "দিদিমণি, আমার কোলে শোবে? কেন লজ্জা কিসের?"

মেয়েটি একবিন্দুও বুঝতে পারলে না। ভাবলে কিছু একটা হাসির কথা হবে। গ্রাহককে সন্তুষ্ট করবার কড়া হুকুম আছে। কোনো গ্রাহক যদি মিথ্যা করেও তার নামে অভিযোগ করে তবু পাত্রঁ (মালিক) তাকে ছাড়িয়ে দেবে, যদি না সে মালিকের প্যারী হয়ে থাকে। রেস্তোরাঁর চাকরি এক মজার চাকরি। মাইনে নেই। আছে খোরাকি। আর গ্রাহকদের বখশিস। বখশিসেরও ষোলো আনা নেবার যো নেই। বখরা করতে হয় সর্দার বা সর্দারনীর সঙ্গে।

মেয়েটি মুচকি হাসলে। তা দেখে বাতাশারিয়া হো হো করে হেসে উঠল। যেন কত বড় তামাশা করেছে। দত্ত আমার দিকে চুরি করে চেয়ে রেগে উঠল। আমি ঘেমে উঠলুম। এ অত্যাচারের শাসন নেই। ফরাসী রেস্তোরাঁ হৈ হৈ ব্যাপার। কতগুলো ভিখিরী এক কোণায় দাঁড়িয়ে ব্যাঞ্জো বাজাতে কখন শুরু করে দিয়েছে। অন্যান্য টেবলেও হট্টগোল। সবাই সমান বাচাল।

দুটি একটি করে বাতাশারিয়ার দলের যুবকরা এসে জুটতে লাগল। তাদের কেউ বাঙালী, কেউ গুজরাটী, কেউ পাঞ্জাবী। তাদের কারুর কারুর সঙ্গে নায়িকা ছিল। বাতাশারিয়া উঠে গিয়ে তাদের টেবলে খানিক বসে নায়িকাদের সঙ্গে দুটো ফরাসী কথা কয়ে আসে। বেশ, বেশ, তোমরা আমাদের দলে। বড় সুখের বিষয়। এই তার প্রধান বক্তব্য। তা বলে সে তামাশাও কম করে না। যাদের নায়িকা তারা কী মনে করলে বাতাশারিয়া তা গ্রাহ্য করে না। গায়ে তার গুণ্ডার জোর। কে তার সঙ্গে লড়তে যাবে। তার চেহারা থেকে অনুমান হয় সে একটা গোঁয়ার গোবিন্দ।

"বাহবা ক্লোদিন," সে বলে একটি মেয়েকে, "তুমি নাকি বিয়ে করছ অঁরিকে।" তার ভাবী স্বামীর দিকে চেয়ে বলে, "অঁরি, তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমাকে আর পয়সা খরচ করতে হবে না।"

ওরা দু'জনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ছেলেটি বোধ হয় আর্টিস্ট। অন্য কিছু হলে রেগে লাল হতো। আর মেয়েটি বড় ভালো জাতের। আমি ওদের সহিষ্ণুতা লক্ষ করে চমৎকৃত হলুম। হাজার হোক ওরা ফরাসী।

দেশ ওদের। ইচ্ছা করলে কি ওরা শিক্ষার বন্দোবস্ত করত না আমাদের ইঞ্জিনিয়ার দাদার?

পরদিন আমি ওর সংস্রব এড়াবার জন্যে অন্যত্র খেলুম। বিশেষ কোনো-খানে না, যেখানে খুশি। তবে আমার প্রিয় ছিল একটা পাতিসেরি। সেখানে পেট ভরে পিঠে খেতুম। আর কন্টিনেণ্টাল ডেলী মেল কিনে পড়তুম। আমি আগে জানতুম না যে মজুমদার তাঁর দলের হাত থেকে পালিয়ে এসে নিরিবিলিতে সেইখানে ক্লাসের পড়া তৈরি করতেন। এক আশ্চর্য মানুষ এই মজুমদার। সন্ধ্যাবেলায় যে তাঁকে দেখে সে ঠাওরায় লোকটা আমোদপ্রমোদ নিয়েই আছে। অসাধারণ আড্ডাবাজ। কিন্তু নিজের কাজটি বেশ গুছিয়ে নিতে জানেন। ফরাসী ভাষা দুরস্ত করে ডাক্তারী পড়ছেন মন দিয়ে। সুপুরুষ। নাচতেও পারেন ভালো। মেয়েরা যদি তাঁকে ঘেরাও করে তবে সেটা কি তাঁর অপরাধ? প্যারিসের ভারতীয় ছাত্ররা মিলে একটা সমিতি করেছিল, তার উদ্যোক্তা ছিলেন মজুমদার। বাড়িওয়ালা তাঁকে বিশ্বাস করে ভাড়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না, দোকান-দারেরা তাঁর খাতিরে বাকী ফেলে রাখত। বণিক শ্রেণীর ভারতীয়দের কাছ থেকে চাঁদাও তুলেছিলেন তিনি ঢের। তবু তাঁর প্রতিপক্ষরা বললে, সমিতিতে তিনি মেয়েদের আসতে দেন, এ এক গুরুতর অপরাধ।

বাতাশারিয়া দল পাকিয়ে সমিতি ক্যাপচার করলে। তারপর মজুমদারের নামে রটালে তিনি অনেক টাকা খেয়েছেন, হিসাব দেননি। মজুমদারের বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে সমিতি থেকে বেরিয়ে গেল। তার ফলে পাওনাদারেরা সমিতিকে ছেঁকে ধরলে। বাতাশারিয়ার দল রাতারাতি সমিতির নাম বদলে বাড়ি বদলে মজুমদারে কীর্তি লোপ করলে।

"কী, মিঃ সিনহা," মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে যে? বাতাশারিয়া আপনাকে আসতে দিলে।"

"মিঃ মজুমদার," আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, "আমি সাবালক।"

লক্ষ করলুম মজুমদারকে খুঁজতে সেখানেও মেয়েরা আনাগোনা করে। ভাগ্যবান পুরুষ। বাতাশারিয়া যে হিংসা করবে তার আশ্চর্য কী? আমারি হিংসা করতে প্রবৃত্তি হয়। তবে এদের এই নিয়ে দলাদলি আমার বিশ্রী লাগে। লণ্ডনে আমাদের দলাদলি পলিটিকল। আমরা কেউ কমিউনিস্ট, কেউ সোশ্যালিস্ট, কেউ ন্যাশনালিস্ট, কেউ মডারেট। কিন্তু

প্যারিসের ভারতীয়দের দলাদলি নারীঘটিত। কার ক'টি নায়িকা আছে এই তাদের গণনা।

আমি বোধ হয় কতকটা হতাশ হয়ে প্যারিস ছাড়লুম। আমার একটিও বন্ধুনী মিলল না। সকলে আমাকে একটু অনুকম্পার চোখে দেখল।

৩

মাস ছয়েক পরে আবার প্যারিসে গেলুম। এবার থাকার জন্যে নয়। প্যারিস আমার পথে পড়ে। তাই নামলুম। ল্যাটিন কোয়ার্টারের উপর অশ্রদ্ধা ধরে গেছল। উঠলুম লিঁয় স্টেশনের অনতিদূরে। আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলুম গুহ ঠাকুরতাকে। সে এলো।

প্যারিসের কে কেমন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। সেই সূত্রে উঠল বাতাশারিয়ার কথা।

"তার কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে ব্যথা দিলে সিন্‌হা," বললে গুহ ঠাকুরতা। লোকটি নরম স্বভাবের। পড়াশুনা নিয়ে থাকে। স্ত্রীজাতির ছায়া মাড়ায় না। প্যারিসে এমন ছাত্রও যে মেলে অন্তত আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে গুহ ঠাকুরতাকে না চিনলে আমি বিশ্বাস করতুম না। সেই গুহ ঠাকুরতা আমাকে করুণ কণ্ঠে বললে, "বাতাশারিয়া আমাকে খুন করতে বাকি রেখেছে সিন্‌হা।"

আমি অবাক হয়ে গেলুম। মিথ্যা বলবার পাত্র নয় গুহ ঠাকুরতা। তার চোখ ছলছল করছে।

"আমার পক্ষপাত মজুমদারের প্রতি। তা বলে আমি যে মজুমদারের দলের তা নয়। আমি কোনো দলের নই।"

"যার বন্ধুনী নেই তার দল থাকবে কী করে?" আমি হেসে বললুম।

"যাও," গুহ ঠাকুরতাও হাসল। "একদিন মজুমদার এসেছেন আমার হোটেলে, আমার ঘরে। আমি তাঁকে এক পেয়ালা শোকোলা করে খাওয়াতে যাচ্ছি। এমন সময় বাতাশারিয়া, দত্ত, ঘোষ, হাজরা, জামিয়াৎ সিং, দিনশাজী ইত্যাদি এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল। কী হয়েছে! আমরা মজুমদারকে চাই, ছেড়ে দাও। আমি বললুম আমার ঘরে আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা ঢুকলে কেন? ওরা আমাকে পা দিয়ে হটিয়ে দিয়ে অশ্লীল

ভাষায় জবাব দিলে। মজুমদারের গায়ে হাত দিতেই আমি বলে উঠলুম, উনি আমার অতিথি। ওরা আরেকটা অশ্লীল বাক্য বলে আমাকে রাগিয়ে তুললে। তখন আমি বেল টিপলুম। ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাতে মোচড় দিলে। মজুমদার ইতিমধ্যে কুস্তি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুস্তিতে না পেরে ওরা আমার ঘরের আসবাবপত্র একে একে ছুঁড়ে মারতে থাকল। ঘা লেগে জানালার কাচ গেল ভেঙে। আরো লোকসান হতো; কিন্তু লোকজন এসে পড়ল। তখন তারা শাসাতে শাসাতে বেরিয়ে গেল।"

"কিন্তু কেন হঠাৎ এ অভিযান?" আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম প্যারিসের ছাত্রদের নীচতার বিবৃতি শুনে। লণ্ডনের গ্রামেও ছোটলোকেরা এমন হাঙ্গামা বাধায় না, ভারতীয় ছাত্ররা তো ভদ্র পাড়ায় ভদ্রলোকের মতো বাস করে।

"সেই যে পাতিসেরীতে তুমি খেতে মনে পড়ে?"

"খুব মনে পড়ে।"

"সেখানে একটি মার্কিন মেয়ে খেত মনে পড়ে?"

"মনে পড়ে বইকি।"

"মিস হিলটন মজুমদারকে বিশ্বাস করে একশ ফ্রাঁ রাখতে দিয়েছিল। সামান্য একশ ফ্রাঁ। বাতাশারিয়ারা গন্ধ পেয়ে তাকে বলেছে, মজুমদার তহবিল তসরুফ করেছে। ওকে বিশ্বাস কোরো না, ওর কাছ থেকে টাকাটা বের করে আমাদের জিম্মা দাও। আমরা তোমার হিতৈষী। সে বড় বোকা মেয়ে। যে যা বোঝায় তাই বোঝে। মজুমদারকে চাইলে টাকা। মজুমদার জেরা করে জানলে বাতাশারিয়ার কারসাজি। বললে তুমি তোমার হিতৈষীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

"ওঃ! কী ইতরতা!" আমি উচ্চস্বরে বললুম, "মার্কিন মেয়ের কাছে দেশের লোকের সুনাম নষ্ট করে। তাতে যে দেশেরই সুনাম নষ্ট। ছি ছি, সামান্য একশ ফ্রাঁ, যার নাম গোটা এগারো বারো টাকা। মার্কিনীদের পক্ষে যা একবেলার খোরাক।"

"কিন্তু তাই শেষ নয়, সিন্‌হা। বাতাশারিয়া দেশের লোকের মুখে আরো চুনকালি মাখিয়েছে।"

গুহ ঠাকুরতা এর পরে যা বললে তা আরো রোমহর্ষক। তা নিয়ে আরেকখানা হর্ষচরিত গ্রথন করা যায়। সংক্ষেপে এই—

সেই যে দিদিমণি, তাকে শেষপর্যন্ত বাতাশারিয়া কায়দা করলে। মেয়েটি

খাস প্যারিসের নয়, মফঃস্বলের। আত্মরক্ষার পদ্ধতি তেমন রপ্ত করেনি বলেই মনে হয়। নন্দনের আগমন সূচনা পেয়ে হর্ষবর্ধনের ক্রন্দন। সে বললে, হতভাগী, তোকে এত যত্নে জন্মসংযম শেখালুম। তোর মতো এমন অসংযত মেয়ে তো দেখিনি। বামুনের ছেলে আমি। তোকে বিয়ে করে জাত দেব?

কোন এক হাতুড়ের কাছ থেকে দাওয়াই এনে ওকে খাওয়ালে। ফলে ওর মরণাপন্ন অবস্থা। তখন খেয়াল হলো যে মজুমদার ডাক্তারী পড়ে। সে যদি দয়া না করে তবে অন্য ডাক্তার এসে বাতাশারিয়াকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। মজুমদারের কাছে সোজা না গিয়ে গুহ ঠাকুরতাকে সাধলে মজুমদারের কাছে নিয়ে যেতে। হাজার হোক দেশের লোক। বিদেশে বিপাকে পড়েছে। মজুমদার বললে, কাজটা বেআইনী। জেলে যেতে চাইনে। তখন গুহ ঠাকুরতা সারা প্যারিস চুঁড়ে চোরের মতো কত ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে অবশেষে একজনকে পটালে। গুহ ঠাকুরতার সেবায় মেয়েটা প্রাণে বাঁচলে।

কিন্তু ডাক্তারের বিল মেটাবার সময় বাতাশারিয়া বললে, "আমার কাছে টাকা কোথায়, ঠাকুরদা! আর বিল কি সোজা বিল? না ডাক্তার ভেবেছে আমি লক্ষপতি। না বাবা, এখনো লক্ষনারীর পতি কিংবা উপপতি হইনি।"

অগত্যা গুহ ঠাকুরতাকে একরকম সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে।

আমি বললুম, "বেশ হয়েছে। অপাত্রে দয়া করলে সে দয়া পাপ, সে পাপের সাজা আছে।" কিন্তু আমার পক্ষে ওকথা বলা সোজা। আমি তো গুহ ঠাকুরতার মতো হৃদয়বান নই। আমি হৃদয়বত্তার দামও দিই নি। গুহ ঠাকুরতাকে সান্ত্বনা দিতে একটা মামুলি কথা বললুম, "যাক, ভগবান আছেন।"

৪

দেশে ফিরে এই কয়েক বছরে ওসব ভুলে গেছলুম। আজ হরিশবাবু দেখা করতে এসে মনে পড়িয়ে দিলেন।

"আমি চিনি আপনার ছেলেকে।"

"চেনেন? শুনে সুখী হলুম। বাবা আমার সম্প্রতি রওয়ানা হয়েছে। সামনের মাসে পৌঁছবে। দীর্ঘ সাত বছর পরে। বার-য়্যাট-ল। ডি-লিট। দেশের গৌরব, দশের একজন।"

গুহ ঠাকুরতার কী হলো জানিনে।

(১৯৬৩)

১৭১ হেনরিয়েটা রোড

১

বাংলার বাইরে যদি কোথাও বাংলা থাকে তবে সে ১৭১ হেনরিয়েটা রোড, লণ্ডন, এন. ডব্লিউ. ফোর। বাড়িটা এডওয়ার্ডীয় যুগের। যুদ্ধের পর এক আইরিশ বাড়িওয়ালীর হাতে আসে। বাইরে থেকে দেখতে জমকালো, যদিও ভিতরে অত্যাধুনিক স্যানিটারি বন্দোবস্তের অভাব। সে অভাব না থাকলে বাঙালীর ভাগ্যে এমন বাড়ি জুটত না, বাড়িওয়ালী অসম্ভব দর হাঁকত। বাঙালী যে কবে প্রথম এ বাড়িতে উপনিবেশ স্থাপন করলে তার ইতিহাস অদ্যাপি অলিখিত। কিন্তু বাঙালীরা এখানে অন্য জাতের লোককে ভিড়তে দেয় না।

এ বাড়ির অনেক সুবিধা। এখানে তুমি ডাল ভাত খাও, ধুতি পাঞ্জাবী পর, বাংলায় কথা বল—

আমি যখন দেশে ফিরি তখন অন্যান্য উদ্ভট প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটিও শুনেছিলুম, "আচ্ছা, আপনারা কি ওদেশে নিজেদের মধ্যে বাংলাতে কথা বলতেন?"

হাঁ, ১৭১ হেনরিয়েটায় বাংলা—বিশুদ্ধ বাংলা—কথা বল, কর বাংলা গান, কেউ তেড়ে আসবে না। বাড়িওয়ালীর বিপুল বপু। তার নাম দেওয়া যেতে পারে বপুমতী। বেচারী বেসমেণ্ট থেকে উপরে উঠতে পারে না বলে সেইখানেই বাস করে। তার হয়ে খবরদারী করে তার ষোড়শী কন্যা নোরা। ষোড়শী, কিন্তু ইতিমধ্যেই আড়াই মণ। তা হোক, মেয়েটি লক্ষ্মী। এত লক্ষ্মী যে সরস্বতীর সঙ্গে তার আজন্ম শত্রুতা। সবাই তাকে স্নেহ করে। জাহাজে বা সৈন্যদলে যেমন একটি বেড়াল বা বেঁজি থাকে, যাকে বলে ম্যাস্কট্, এ বাড়িতে নোরা হচ্ছে তাই।

"নোরা," কেউ যদি তাকে ডাকে, সে বলে, "যাই।" ঐরকম দু' চারটে বাংলা বুলি ও শিখে নিয়েছে।

মেয়েটি সকলের প্রতি যত্নবতী, সকলের ফাই-ফরমাশ খাটে। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সে সামন্তের সম্ভবপর বধূ। সামন্ত অর্থাৎ আশুতোষ সামন্ত, এ বাড়ির রাজা। নামে আশুতোষ গুণেও তাই। যেমন আমুদে তেমনি দরদী। পড়াশুনা নামমাত্র করে, মাঝে মাঝে

ফরাসী ছুটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে ঘুময়। সেও একরকম পড়া। কিন্তু কারুর কোনো বিপদ আপদ ঘটলে সব আগে ছুটে যায় সামন্ত। পকেট খালি। থাকে বাড়িওয়ালীর কৃপায়। রোজ বলে, এই মাসেই তোমার পাওনাটা চুকিয়ে দেব, মিসেস ওমালি। বাড়িওয়ালী বোঝে যে বেচারার আত্মসম্মানবোধ ওতে পরিতৃপ্ত হয়। মনে মনে হাসে। সামন্ত যে তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে এটা সেও কল্পনা করে সুখ পায়। বিয়ে করে কিন্তু দেশে নিয়ে যেতে পারবে না। একমাত্র মেয়ে। মেয়ের মাও এমন নয় যে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে। তাকে জাহাজে তুলতে ক্রেনের দরকার হবে। ওজনে অন্তত পাঁচ মণ।

সামন্ত ছাড়া এ বাড়িতে যে কয়জন স্থায়ী অতিথি তাদের নাম পরিচয় নিম্নলিখিত বিধ :—

হেরম্বনাথ চাকী। ইনি প্রবীণকল্প ব্যক্তি। কিন্তু গানে—বিশেষত হাসির গানে—লণ্ডনের বাঙালী সম্প্রদায়ের তানসেন। কারুর সাতেও না পাঁচেও না। নিজের রিসার্চ নিয়ে জোর পরিশ্রম করেন। কেবল মাঝে মাঝে জলসায় কান ঝলসান।

দুলাল দাশগুপ্ত। ইনি প্রত্যেক বছর আই-সি-এস দেন। সারা বছর চব্বিশ ঘণ্টা ঘর থেকে আঙিনায় ও আঙিনা থেকে ঘরে ঠাঁই বদল করেন। সর্বদা মুখ ভার। কিচ্ছু হচ্ছে না পড়াশুনা। কেন হচ্ছে না? এমনি। মন লাগছে না। মন কিসে লাগছে? কিচ্ছুতে না। কেবল ঘটা করে চুলে ব্রিলিয়াণ্টিন মাখেন। গায়ে যত রাজ্যের সাবান পাউডার স্নো। পুষিমেনির মতো সেজে গুজে থাকেন দামী ইংরাজী পোশাকে। কার তরে এত সজ্জা? কারুর তরে নয়। সেইখানেই তো ট্র্যাজেডি।

এঁরা বাড়িতে স্থিতিবান রায়ত। কী জানি কবে থেকে আছেন। এঁরা ছাড়া অন্য দু' একজন থাকেন। তাঁরা ঋতু অনুসারে বদলান। ১৭১ হেনরিয়েটা রোড বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে এই তিনজন। আর এঁদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাঁরা আসেন, তাঁরা। তাঁদের সংখ্যা অগুন্তি। বলা বাহুল্য আমিও একজন।

যখন যাই দেখি দুলাল পায়ের উপর পা রেখে একখানা বই কোলে নিয়ে একটু ঘুমচ্ছে। "না, ঘুমচ্ছি না, এই চিন্তা করছি, হলো কী! বৃথা কেটে যায় বর্ষ কেন!"

"আসুন, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।"

"না, ভালো লাগে না। আচ্ছা, সিন্‌হা, আপনি কী করে জীবনে এত রস পান। কিছু পান করেন কি?"

আমি হাসি। বলি, "আপনি অন্তত প্রেমরস পান করুন।"

"নাঃ। ভালো লাগে না।"

সামন্তকে দেখি নোরার কোলে পা তুলে দিয়ে ব্যোম ভোলানাথের মতো বসে আছে। নোরা পরিয়ে দিচ্ছে জুতো। ব্রাশ দিয়ে চকচকে করে দিচ্ছে। সামন্ত হাই তুলে বলছে, "হাঃ। যেতে হবে ক্লাসে। এই করতে করতে বয়স চলে গেল।"

"টাক পড়ে গেল মাথায়।"

"কে হে তুমি আমার কাছে ফুটানি করছ।" সামন্ত বলে ঢাকাই টান দিয়ে।

ওর সমস্ত কৌতুককর, শুধু এইটুকু নয়। ও বিনা আয়াসে হাসায়। বেশ গম্ভীর ভাবে হাসায়। লোকটা কাউকে কেয়ার করে না। কোথাও রাস্তার মাঝখানে ভিড় জমেছে—সামন্ত জানতে চায় কী ব্যাপার। অমনি মোড়লের মতো পকেট থেকে নোটবুক বের করে কী যেন টুকতে শুরু করে দিল। টুকছে তো টুকছেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করছে, "আপনার নাম?" আরেকজনকে, "আপনার কী মত?" ওরা ঠাওরায়, খবরের কাগজের রিপোর্টার হবে। বলাবলি করে, "এই, পথ ছেড়ে দাও। দেখছ না ইনি কী লিখছেন?"

এমনি মজার মানুষ সামন্ত।

গম্ভীরভাবে এমন সব আজগুবি কাহিনী বানিয়ে বলে যে শুনে রোমাঞ্চ বোধ হয়, হাসিও আসে। সামন্ত বলে, "হাসির বিষয় নয়। আমার অভিজ্ঞতা। ভাববার বিষয়। দেশ বলে আপনারা যাকে বলেন, যেখানে ফিরে যাবেন বলে তৈরি হচ্ছেন, সেখানকার মানুষের দস্তুর ঐ। সারারাত কীর্তন গায়, কবে আমার সুদিন হবে, নাড়া মুড়া মিশে যাবে।"

হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা হয় অন্যত্র কোনো গানের আসরে। ১৭১ নম্বরে তিনি রাত করে ফেরেন। সেখানে কী হয়, না হয়, কে যায়, কে না যায় সেসব খবর রাখেন না। নোরার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক কম। কিন্তু যে কেউ ১৭১ নম্বরে গেছে সে প্রথম দিনই নোরাকে স্নেহের চোখে দেখেছে, বার বার গেছে নোরার মিষ্টি কথা ও মিষ্টি সুর শুনতে। অমন মেয়ে দুর্লভ। বুদ্ধিশুদ্ধির ধার ধারে না। কোনো একখানা বই দিয়ে বল, "পড় নোরা।" সে দুই কাঁধ

তুলে বলবে, "পারব না।" সে লজ্জিত নয় তার নিরক্ষরতার দরুন। তার এত কাজ যে সময় কখন লেখাপড়া করবার। তবে খুব মন দিয়ে শোনে কী আলোচনা হচ্ছে। কেউ যদি বলে, "তুমিই বল না, নোরা, বড়-লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের সম্পত্তির উপর ডেথ ডিউটি বসানো কি ন্যায়সঙ্গত?" নোরা চুপ করে সরে যায়। যেন ওকে মূর্খ বলে উপহাস করা হলো।

এরূপ স্থলে সামন্ত প্রাণপণে নোরার মান পাহারা দেয়। কেউ যদি নোরার প্রতি অবজ্ঞা সূচক একটি কথা বলেছে অমনি সামন্ত রুখে বলে, "মুখ সামলাইয়া কথা কহেন মশয়।"

আমিও বেফাঁস কিছু বলে সামন্তর বকুনি খেয়েছি। "বাজে কথা কও ক্যান?"

"আমাকে বলছ?"

"হ হ। কুবাইক্য কহন ভালো নয়। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়নি?"

মোট কথা সামন্ত কাউকে রেহাই দেয় না। নোরা ল্যাণ্ডলেডির ডটার বলে তাকে আমরা সংক্ষেপে এল এল ডি বলতে পারব না। তাকে নোরা বলে ডাকলেও সামন্ত মনে মনে চটবে। বলতে হবে মিস্ ওমালি। ওরা হচ্ছে উচ্চ বংশের লোক। গরিব হয়ে পড়েছে সংসারচক্রের আবর্তনে। আবার উঠবে।

সামন্ত নোরাকে আদর করে না, তাকে হিন্দু বালিকার মতো খাটিয়ে নেয়। কড়া কথা বলে। স্বামী হলে সে অতি জবরদস্ত স্বামী হবে। স্ত্রৈণ হবে না। কিন্তু স্বামী যে সে হবে কার সাধ্য এ নিয়ে তাকে কিছু বলে! এমন ভাব দেখায় যেন সে নোরার জ্যেঠামশায়।

"না, না। ঠাট্টার বিষয় নয়। বিয়ে হলো ভগবানের হাত।"

"তা কি জানি নে! ওটা এখনো ট্রান্সফার্ড্ সাবজেক্ট হয়নি।"

"তবে ক্যান বাজে কথা কও? যদি বিয়ে না হয়?"

"না হয় নাই হলো।"

"তবে? তবে ক্যান মেয়েটার মাথা খারাপ কইরা দাও?"

কিন্তু মেয়েটার মাথা খারাপ হয়েই রয়েছে। সে যখন সামন্তের টাকের উপর ম্যাকাসার অয়েল মাখিয়ে দেয় কিংবা তার জন্যে বিশেষ কিছু রাঁধে তখন আমি লক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি কী প্রগাঢ় ভক্তি তার মুখভাবে।

বালিকা বধূর সঙ্গে তার এমন কী প্রভেদ? সে যেন মনে মনে জপ করছে, স্বামীর জন্যে। আমার স্বামীর জন্যে।

অন্যের বেলায় সে মা কিংবা বোন। সামন্তের বেলায় সে বধূ।

একদা আমার প্রিয় বন্ধু বোস ও বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বোসকে দেখতে গিয়ে দেখি নোরা তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। শুনলুম রাত্রেও নাকি সে বোসকে ছেড়ে ঘুমতে যায় না। বোস কৃতজ্ঞভাবে বললে, "ও আমার কতকালের বোন।"

কিন্তু সবাই তো গোপেন্দ্র বোস নয়, পৃথিবীতে সরীসৃপ শিকদারও আছে। পরে বলব ওর কথা। চাকী আমাকে তখনি বলেছিলেন একান্তে, "তোমার বন্ধু একটা কুদৃষ্টান্ত দেখালেন। ছোট ছেলের মতো অধৈর্য হয়ে কেবল নোরা নোরা বলে ডাকলে নোরা কি সাড়া না দিয়ে পারে?"

২

সকল সমবয়সিনী মেয়ের মতো নোরারও নানা অভিলাষ ছিল। সামন্ত তাকে নিয়ম করে বায়োস্কোপে নিয়ে যায়। ভাবে এই তার পক্ষে যথেষ্ট বিনোদন। আমি খুব বড় লোক হবার প্রত্যাশা রাখি না। আমার স্ত্রীকে এই বয়স থেকে এমন করে তালিম করব যাতে সে এর বেশী বাবুয়ানা না করে। দিস ইস দি লিমিট।

নোরারও সেই ধারণা। সামন্ত যা উপভোগ করে তাই তার উপভোগ্য, তা ছাড়া আর সব বিষ। সামন্ত নিজে একজন ছবিখোর। নোরাকে ছবি দেখতে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে নোরার সঙ্গ ছাড়া অন্য কারণেও উল্লাসকর।

সামন্তের ওখানে আড্ডা দিতে যারা আসত তাদের দলে কেমন করে এক ইটালিয়ান ছোকরা আমদানি হলো। ইটালিয়ানরা বোধ হয় প্রত্যেকে এক একটি দানুন্ত্সিও। নারী দেখলে তারা মনে মনে বাজি রাখে, একে যদি শিকার না করতে পারি তবে আমি কিসের পুং নর? যতই বেঁটে খাটো ময়লা কুঁড়ে হোক, নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা এক একটি উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ। এই ছোকরাটিও একটি বাচ্চা কামদেব। নোরাকে বললে, "নাচবে?"

নাচে না এমন মেয়ে ইউরোপে নেই। নোরা কিন্তু সামন্তের কল্পবধূ হয়ে অবধি নাচেনি। কবে ছেলেবয়সে নাচত, তারপর সুযোগ না পেয়ে ভুলে

গেছে। নাচলে হয়তো এত মোটা হতো না। কিন্তু সামন্ত বলে, নাচ আমার দেশে নষ্ট মেয়েমানুষদের পেশা। নোরা শিউরে ওঠে। সে নাচতে চাইবে কোন্ সাহসে! সামন্ত কি তা হলে তাকে বিয়ে করবে! তাই এত কাল নোরা চুপ করেই ছিল।

যেই যোভানি প্রস্তাব করলে "নাচবে?" অমনি নোরার মনে হলো জীবনটা ব্যর্থ গেল না নেচে। সে খানিকটা চোখের জল ঝরালে। মাকে বললে, "যোভানি বলছে ডান্স হলে নিয়ে যেতে।" মা বললে, "মিস্টার সামন্ত কী বলেন? ডাক তাঁকে।" সামন্ত শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। হায়! এত দীর্ঘকাল ধরে তালিম দেওয়ার পরে তাকে এমন কথা শুনতে হলো আজ! কুকুরের ল্যাজ কি সোজা হতে পারে! বৃথা পরিশ্রম। ইউরোপ কখনো হিন্দু হবে না। বিয়ে করতেই হবে একটা পাঁচি কিংবা খেঁদিকে। তা ছাড়া পন্থা নেই।

সামন্ত বললে, "নাচুক, তবে শুধু আজ কেন, সারা জীবন যোভানির সঙ্গে।"

মা মেয়েকে চোখ টিপে ইশারায় বোঝালে, দেখলি তো। আসল মানুষের মত নেই।

নোরা অত্যন্ত নিরাশ হলো। তার বয়সের সবাই নাচছে। সেই নাচতে পারবে না। পর পুরুষে এতই যদি আপত্তি তবে সামন্ত স্বয়ং আসুন না নৃত্যাগারে। সে মুখ ফুটে বললে একথা সামন্তকে। সামন্ত উগ্র মূর্তি ধরে উত্তর দিলে, "কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি কি বেহায়া যে সকলের সাক্ষাতে মেয়েলোক নিয়ে নাচব!"

পরদিন যোভানি সামন্ত যখন বাসায় থাকে না এমন সময় নোরাকে ফোনে ডাকলে। সে অনেক মেয়েকে মজিয়েছে। নোরা তো একটা বোকা হাতী। নিচের তলায় আস্তানা করলে কী হয়, মিসেস ওমালির শ্রবণশক্তি প্রখর। সে মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "ফোন করছিল কে?"

নোরা নিরুত্তর। মা তেতে উঠে বললে, "ধাড়ি মেয়ে। যোভানির সঙ্গে পিরীত করবার শখ। যোভানি কি দায়ে ঠেকলে বিয়ে করবে! ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে দেখিস। সামন্তের মতো বিশ্বাসী কেউ নয়। ভারতীয়রা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য। দেখ দেখি কেমন নারীবর্জিত জীবন এদের। যেমন সামন্ত তেমনি চাকী তেমনি দাশগুপ্ত। ইংরেজ কি ফরাসী হলে এমন জীবনের চেয়ে মরণ শ্রেয় মনে করত।"

৩

আমি কয়েক হপ্তা লণ্ডনে ছিলুম না। ফিরে দেখি ১৭১ নম্বরে একটি নতুন অতিথি উপনীত। বয়স কম। যোভানির মতো হাবভাব। গায়ের রং মিশ কালো, কিন্তু চেহারায় 'ইট্' আছে। ওকে কেমনতর ভীষণ দেখায়। ও যেন মানুষ নয়, সরীসৃপ। ওর যেন হৃদয় নেই। আছে ক্ষমতা। খেলায় ধূলায় পটু, গাইতেও পারে মন্দ না। বাজাতে জানে বাঁশি।

এমন সব্যসাচীর তুলনায় কী আছে সামন্তের? টেকো সামন্ত যত বয়স্ক নয় তার অধিক বয়স্ক বলে ভ্রম জাগায়। যৌবনে প্রৌঢ়। তাকে স্বামী ভেবে শ্রদ্ধা করা, তার বিচারের প্রতি আস্থা রাখা, কিশোরী মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে মন মাতানো কী আছে? আর সরীসৃপ শিকদার এক রাশ কালো কুঞ্চিত কেশের অধীশ্বর। তার চামড়া কেমন মসৃণ, তার চোখ কেমন জলজ্বলে, তার জুলপি কেমন লিকলিকে, কেমন ঢেউ খেলে যায় তার ভুরুতে। সুগঠিত সবল দেহ। সুচতুর বাক্যালাপ। ধূর্ত দৃষ্টিক্ষেপ।

সরীসৃপ সামন্তকে চাকীকে দাশগুপ্তকে প্রথম অবস্থায় ভারি আপ্যায়িত করলে। কাউকে সন্দেহ করতে দিলে না কী তার লক্ষ্য। সবাই সরীসৃপের উপর প্রসন্ন। ছেলেমানুষ এত কম বয়সে মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে। সামন্ত মিসেস ওমালির কাছে খুব একচোট সুপারিশ করলে সরীসৃপের। নোরাকে ধমক দিয়ে বললে, "শিকদারের জন্যে খিচুড়ি রাঁধতে পার না কেন? ও যে ভুনি খিচুড়ি বড্ড ভালোবাসে।"

ষোড়শোপচারে শিকদার-জয়ন্তী চাক্ষুষ করে আমি তো ধন্য হয়ে গেলুম। কিন্তু শিকদারের কথোপকথন আমার সহ্য হলো না। বাপের পয়সায় বিলেত এসেই অমনি ভুঁইফোড় কমিউনিস্ট। "আমরা বিশ্বের চির বঞ্চিত সম্প্রদায়, আমরা কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ভাগ করে খাই। আমাদের ব্যথা আপনি কী বুঝবেন, মিস্টার সিন্‌হা? কী বলেন, সামন্তদা?"

সামন্ত ঘাড় নেড়ে তারিফ করে। উল্লুক।

"বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা। হায় রে! শ্রমিকের আঁশু কেউ মুছায় না। শ্রমিকের লহু সবাই চোষে।"

আমার গা জ্বালা করে ঈদৃশ ন্যাকামির সাক্ষী ও শ্রোতা হলে। আমি ১৭১ নম্বরে যাতায়াত থামালুম।

৪

হঠাৎ একদিন খবর পেলুম, সামন্ত ও বাড়ি থেকে উঠে এসেছে। বিশ্বাস হলো না। সামন্ত ও বাড়ির সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত যে ১৭১ নম্বর হেনরিয়েটা রোড না বলে আমরা সংক্ষেপে বলতুম সামন্তের শ্বশুরবাড়ি। যেন সামন্ত ও বাড়ির গৃহজামাতা।

আমারই পাড়ার একটা অখ্যাত রাস্তায় এক শস্তা বাসায় সামন্তকে খুঁজে বের করে শুধালুম, "কী হয়েছে?"

সামন্ত আর সে সামন্ত নয়। বড় বাড়ির রাজচক্রবর্তী ছিল, তার হুকুমে ঘরকন্না চলত। তার পরামর্শ না নিয়ে বাড়িওয়ালী একটি দায়িত্বের কাজ করত না। সামন্ত ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। সেই আজ নামহীন মর্যাদাহীন ক্ষমতাহীন সামান্য বাসাড়ে।

কান্নার মতো হাসি হেসে বললে, "বোসো।"

কোনোমতেই ও প্রসঙ্গের ধার দিয়ে যায় না। বলে, "এমনি চলে এলুম। এই বাসা আমার পক্ষে সুবিধের। টিউবের সংলগ্ন। তুমি হবে প্রতিবেশী।"

এইটুকু ওর কাছ থেকে বের করতে পারলুম যে শিকদার একটা গ্রামোফোন কিনেছে আর তাই বাজিয়ে কলেজ কামাই করে নোরার সঙ্গে নাচছে, সামন্তের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। সামন্ত একদিন সকাল সকাল ফিরে ও-জিনিস প্রত্যক্ষ করে নোরার কান মলে দেয়। নোরার নালিশ শুনে তার মা সামন্তের কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে। সামন্ত বলে, কৈফিয়ৎ দাবি করার কথা যখন উঠেছে তখন বুঝতে হবে যে সে আর বিশ্বাসভাজন নয়। অনাস্থার পাত্র হয়ে সে ও বাড়িতে টিকতে চায় না।

আমি দুঃখিত হলুম তাঁর বিরহের জন্যে। বিরহ—বিচ্ছেদ না। এত কালের প্রেম কি এত সহজে চুকে যায়! নোরা নিশ্চয় তার পথ চেয়ে আছে, শুধু অভিমানবশত ছুটে আসছে না। দাশগুপ্তকে ফোন করে বললুম, "সামন্তকে ফিরিয়ে নাও না কেন?"

সে উত্তর দিলে, "কতবার আনতে গেছি। বলেছি নামমাত্র মাফ চাও। সে কিছুতেই মাথা হেঁট করবে না। কী করি বল?"

চাকীকে ফোনে অনুরোধ করলুম। তিনি বললেন, "আমি ওসবের মধ্যে নেই। ডিসগ্রেসফুল! বুড়োবয়সে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা! তাও স্বদেশে নয়।"

আমার অন্য কাজ ছিল। আর আড্ডাও তো আমার এই এক বাড়িতে নয়। আর ভারতীয় ছাড়াও আমার অন্য বন্ধু বান্ধব ছিল। আমি আর মাথা ঘামালুম না। বলতে কি, ভুলে গেলুম।

৫

তার মাস ছয় পরের খবর। দিলে বোস।

বোসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিকদারও বাধালে অসুখ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নোরা একেবারে প্রাণ ঢেলে সেবা করলে। তার কয়েক মাস পরে নোরার মায়ের শ্যেন দৃষ্টিতে ধরা পড়ল নোরার মোটা হওয়া যেন সর্বাঙ্গীন নয়, ঐককেন্দ্রিক। মা হঠাৎ চলচ্ছক্তি পেয়ে মেয়ের বব্ করা চুলের মুঠি ধরে গর্জে উঠলেন। "বল কে?"

নোরা সভয়ে বললে, "শিকদার।"

শিকদার নিচের তলার গর্জন ও আর্তনাদ শুনে তল্পি তল্পা গুটিয়ে উধাও।

তখন নোরার মা নিঃসহায়। ডেকে পাঠালেন সামন্তকে। সামন্ত ছুটে এল। তিন জনে মিলে সে কি সেণ্টিমেণ্টাল সীন! সামন্ত কাঁদে ভেউ ভেউ করে। নোরা কাঁদে মিউ মিউ করে। আর মা কাঁদে ছাদ ফাটিয়ে। বোসেরা এমন ভাব দেখালে যেন তারা কিচ্ছু টের পায়নি। প্রকৃতিস্থ হয়ে নোরার মা বললেন, এত দিন পরে সামন্ত এসেছেন বলে তাঁর বড় আনন্দ হয়েছিল। ওটা আনন্দের ক্রন্দন।

সামন্ত ও নোরার মা গুজ গুজ ফিস ফিস করেন। সামন্ত বলে, "ও হতভাগাকে ধরে নিয়ে আসি, ওর সঙ্গে নোরার বিয়ে দাও, নোরা সুখী হলে আমিও সুখী।"

মা বললেন, "উঁহু, তুমি বিয়ে করবে না তা জানি, কিন্তু ওর হাতে পড়ার চেয়ে আইবুড় থাকা ঢের ভালো। অতএব ডাক্তার ডাক।"

সামন্তের কাজ হলো ডাক্তার খোঁজা। অক্লান্ত অন্বেষণে ডাক্তার পাওয়া গেল। নোরা অকস্মাৎ সংকটাপন্ন পীড়িত বলে নিচের তলায় পর্দানশীন হলো। বাড়িওয়ালীর অনেকগুলি টাকা বরবাদ হয়ে গেল।

সামন্তের সুখ গেল বরবাদ হয়ে।

নোরার যা বরবাদ হলো তা স্বাস্থ্য, লাবণ্য, সরল বিশ্বাস।

সরীসৃপ সানুকম্প হাসি হেসে বললে, "বুর্জোয়া!"

(১৯৩৩)

নজরবন্দী

ভেবেছিলুম, বলব না।

যা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত, যা জগতে কারুর কোনো কাজে লাগবে না, শুনে বন্ধুরা লজ্জিত ও শত্রুরা উল্লসিত হবে অথচ কোনো পক্ষ বিশ্বাস করবে না, তা আমার সঙ্গে আমার চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাক এই ছিল আমার অভিলাষ। কিন্তু বয়স যতই বাড়ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর উপর কর্তৃত্ব ততই কমে আসছে, আর সম্প্রতি অহিফেন অভ্যাস করে অবধি মুখ থেকে সংযমের বল্‌গা খুলে পড়ছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। বার্ধক্যে নেশার ঘোরে কখন কার সাক্ষাতে কী বলে ফেলব, আমার মৃত্যুর পরে যখন ভক্তরা আমার প্রত্যেকটি উক্তি স্মরণ করে প্রবন্ধ লিখবে তখন আমার দুর্বল মুহূর্তগুলি অমর হয়ে আমাকে ভাবীকালের নিকট হাস্যাস্পদ করতে থাকবে। এর প্রতিকার আমি জ্ঞান থাকতে স্বহস্তে করে যাব। সেই কারণে আজ এই আত্মকাহিনী লিখতে বসা।

উর্বশীর যেমন জন্ম কিংবা শৈশব কিংবা বাল্য কিংবা কৈশোর ছিল না, সে যখন উদিতা হলো তখন যৌবনে গঠিতা, আমারও তেমনি জন্ম থেকে কৈশোর, উপরন্তু যৌবন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত। আমি যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলুম তখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। বাল্যের কথা ভালো মনে পড়ে না, স্মৃতির চোখে চাল্‌শে ধরেছে, কাছের জিনিসও ঝাপসা দেখায়। যৌবন যে কোনখান দিয়ে কেমন করে চলে গেল আজ পশ্চাদ্ধাবন করতে গেলে আশ্চর্য লাগে। যেন আমাদের বসন্ত ঋতু। শ্রীপঞ্চমীর সময় একটু উষ্ণ হাওয়া দেয়, দিন দু'তিন মনে হতে থাকে কোথায় কী একটা আয়োজন চলেছে উৎসবের। তারপরেই যা ধুলো, যা গরম!

এই মনে পড়ে, আপনার কথা ভাববার অবসর পাইনি। গোড়াতে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প ছিল, কিন্তু বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হতে গেলে যত রকম উপসর্গ চাই কোনোটা আয়ত্ত করতে পারলুম না। পলিটিক্স করতে উদ্দীপনা জাত হলো, কিন্তু সে পথে সকলে নেতা, কাকে অনুসরণ করব স্থির করতে পারবার পূর্বে অদৃষ্ট পুরুষ আমাকে ঠেলে দিলেন সেবা-কর্মে। কোথাও প্লাবন, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও মহামারী—কিছু না হোক মেলা বা মিছিল—বছরের পর বছর খাটতে খাটতে শরীরটাতে ঘুণ ধরে গেল।

আজ যেমন আমি পাঠক-পাঠিকার আহার-নিদ্রা কেড়ে নিচ্ছি (কিন্তু কেড়ে নিয়ে করছি কী! আমার নিজেরই যে ডিস্‌পেপসিয়া ও ইন্‌সম্‌নিয়া) সেদিন তেমনি আমারও আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছল। নিদ্রা অবশ্য বিনা পয়সায় পাওয়া যেত, কিন্তু আহারের সংস্থান সব দিন ছিল না। কঙ্কালসার মূর্তি নিয়ে আমি অবশেষে উঠলুম মধুপুরের এক স্বাস্থ্যনিবাসে। কী জানি কেন জীবনটার প্রতি আমার মায়া ছিল। বাল্যকালাবধি যে অনাথ, যার উপার্জনের উপর কেউ নির্ভর করে না, যাকে মেয়ে দিতে কোনো দিন কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণ এগিয়ে আসেননি, জীবনবীমাওয়ালাদের কাছে যার জীবনের দাম কানাকড়ি, তাকেও কেন জানি বেঁচে থাকতে হবে।

মধুপুরে বেশীর ভাগ সময় বিছানায় পড়ে কাটত। উঠে বসতে বল পেতুম না। না কোনোদিন আড্ডা দিয়েছি, না খেলেছি তাশ পাশা ব্যাড্‌মিণ্টন। ওদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করিনি, করলেও মিশতে পারতুম না। একা একা থাকি। চোখ বুজে ভাবতে থাকি এই জীবনটাকে কাটাতে জানলে কত রকমে কাটানো যেতে পারত। নিজেকে নানা অবস্থায়, নানা পরিস্থিতিতে, নানা মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে কল্পনা করি। সেই সকল মানুষের মনের ভিতরে, চরিত্রের ভিতরে নিজের কল্পনাকে অনুপ্রবিষ্ট করে দিই। তারা যেন আমার কাগজের নৌকা। তারা কোন দিকে ভেসে যায়, তাদের সঙ্গে আমিও ভাসি, ভাসতে ভাসতে দেখি তারা কোন ঘূর্ণীতে ঘোরে, কোন অঘাটে ভেড়ে, কিসের আঘাতে ডুবে তলিয়ে যায়। এক কথায়, কাল্পনিক কাহিনী বানাই। মন্দ খেলা নয়। এ খেলার বিশেষত্ব এতে সাথীর আবশ্যক করে না, সরঞ্জামও লাগে না।

বানানো কাহিনীগুলি মাঝে মাঝে এত ভালো ওৎরায় যে মনে হয় ওগুলি যেন এক একটি অভগ্ন স্বপ্ন, অতি সত্বর লিপিবদ্ধ না করে রাখলে স্বপ্নেরই মতো মিলিয়ে যাবে কিংবা গুঁড়িয়ে যাবে; পুনরুদ্ধার করতে কিংবা পুনর্বার গড়তে পারব না। লিখতে গিয়ে দেখি আরো মজা, কল্পনায় যা অস্পষ্ট ছিল কালির আঁচড় তাকে স্পষ্ট করলে, যা ছিল মুহূর্তের তা হলো চিরকালের। কল্পনার মতো কলমেরও স্বাধীনতা আছে। আমি ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে ওকে যথেচ্ছ বিহার করতে দিলুম। স্বাধীন লেখনী শব্দচাতুর্য, বর্ণনাবিভ্রম, রীতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলল।

গল্পরচনার সেই প্রথম দিনগুলি আমি কোনোদিন ভুলব না। সে

আনন্দের, সে ধৈর্যের, সে চমকের, সে আবিষ্কারের তুলনা নেই। আমার মনের মধ্যে এত ছিল। যেন ঘটনা আপনা হতে ঘটে যাচ্ছে, আমি সাক্ষীগোপাল। চরিত্র আপনা আপনি বিকশিত হচ্ছে, নব নব চরিত্র দ্বারে উঁকি মারছে, পুরাতন চরিত্র ভিড়ের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। মানস প্রসূত পুত্তলীগুলি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠছে। ধন্য গল্প লেখক। তুমিই সুখী।

আহার নিদ্রায় অবহেলার ফলে শরীর সারল না। এদিকে স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিচালক একদিন এসে অপমান করে গেল, দু'মাসের পাওনা বাকী। পোঁটলাপুঁটলি ফেলে রেখে রাতারাতি উধাও হলুম। ঝুলিতে আমার গল্পগুলির পাণ্ডুলিপি। সহায়সম্বলহীন ভাবে এক মাসিকপত্রের আপিসে যখন গেলুম দারোয়ান আমাকে ফকির ভেবে ঢুকতে দেয় না। সম্পাদক বললেন, "পয়সা খরচ করে ছাপলেও ছাপতে পারি, যদি পছন্দ হয়। কিন্তু দাম দিতে গেলে লোকসান যাবে। জানেন তো মশাই, মাসিকপত্রের সম্পাদককে গয়লা অমনি দুধ দেয় না, মুদি অমনি চাল দেয় না, মেছুনী অমনি মাছ দেয় না, আর সম্পাদকও আপনাদেরই মতো ওসব না খেতে পেলে প্রাণে বাঁচে না।"

যাক্, একটা গল্প তাঁর বিনা পয়সায় পছন্দ হলো, ছাপবেন বলে আশা দিলেন। নিজের চোখে নিজের নামটা তো ছাপার হরফে দেখতে পাব। একটি বন্ধুর ওখানে দু' বেলা পাতা পাড়লুম। ওদের বিরাট গোষ্ঠী, আমার মতো সামান্য প্রাণীকে একটা কোণে একটু আশ্রয় দিতে ওদের আপত্তি হলো না।

গল্পটি ছাপা হবার সাত দিন না যেতেই কী করে যে আমাকে খুঁজে গ্রেপ্তার করলে, জানিনে—পুলিশ নয়, অন্য এক সম্পাদক। বললেন, "বিশ্বদেব বাবু না? কন্‌গ্রাচুলেশনস্। আপনার গল্প পড়ে, মশাই, কাল থেকে ধরতে গেলে অভুক্ত রয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি আপনাকে হাৎড়ে। কী রিয়ালিস্‌ম্, কী ভূয়োদর্শিতা। বাঙালীর সমাজকে অণুবীক্ষণ দিয়ে আপনার মতো কে এমন করে দেখেছে? বললেই হলো বিশ্বদেব বিশ্বকবির ছদ্মনাম? বিশ্বকবি কি বাংলাকে গণনার মধ্যে আনেন! আমি ঠিক জানতুম এ এক নব আবির্ভাব।" ভদ্রলোক গদগদ ভাবে শেষ

করলেন, "আপনাকে লাভ করে আজ সাহিত্যিক কুল পবিত্র, সাহিত্য জননী কৃতার্থা।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলেও ভদ্রলোক থামলেন না. নিঃশ্বাস নিয়ে হাত দেখিয়ে আমাকে উত্তর দেওয়ার দায় থেকে নিবৃত্ত করলেন। "না বলবেন না, বিশ্বদেব বাবু। আমিই আপনার আবিষ্কর্তা, আমিই আপনার অস্তিত্বে প্রথম বিশ্বাসী। নিশিনাথ বড় জোর আপনার লেখা প্রথম ছেপেছে। কিন্তু সাহিত্যের ও কী বোঝে? না বলবেন না। বেশী নয়, একটি।"

ভদ্রলোকের গরজ দেখে আমিও একটু চাপ দিলুম।

"দেখুন মশাই, গল্পলেখককে গয়লা অমনি দুধ দেয় না।" ইত্যাদি।

ঈষৎ দমে গিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, বেশ, আপনার যখন দরকার, নিতান্তই যখন দরকার, তখন—" পাঁচ টাকার একখানি নোট বহুকষ্টে বার করে বারবার নাড়াচাড়া করে যথাসম্ভব বিলম্ব করতে থাকলেন। যতক্ষণ তাঁর দখলে থাকবে ততক্ষণ তাঁর, দিলে তো পরের হয়ে গেল।

এমন সময় আমার প্রথম সম্পাদক বোঁ করে কোত্থেকে এসে খপ্ করে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "খবরদার মধুসূদন বাবু। আমার কাগজের বাঁধা লেখককে তুচ্ছ পাঁচটা টাকা অফার করে অপমান করবেন না। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।"

কয়েক বছরের মধ্যে আমি লক্ষপতি। দশ পৃষ্ঠার গল্প একশো টাকার কমে ছাড়িনে। আমার তেইশখানা উপন্যাসের মধ্যে তিনখানার তেইশটা সংস্করণ হয়েছে। অপরিচিত সমালোচক অপরিচিত মাসিকের চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে আমার প্রতিভার প্রশস্তি গান করে। সকলের মুখে ঐ এক কথা। বাঙালীর সমাজকে এমন অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে আর কারুকে দেখা গেল না।

নারীরাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমি তাঁদেরই একজন। আমিও সেই থেকে দাড়ি গোঁপ মুড়িয়েছি। নারী মনের নিভৃত অস্ফুট বার্তা আমিই উদ্ধার করে জগৎকে শোনালুম। নারী যদি হয় লজ্জাবতী লতা আমি নারীর জগদীশ বোস। মেয়েরা শাড়ি পরে কি ধুতি পরে তা-ই কোনোদিন মুখ তুলে দেখিনি, মেয়েদের সঙ্গে আমার লক্ষ্মণের সম্বন্ধ। তা হলে কী হয়, আমি তাদের অন্তর্যামী। আমার তেইশখানা নভেলের কোথাও কেউ নায়িকার রূপ বর্ণনা বেশ বর্ণনা অলঙ্কার বর্ণনা অন্বেষণ করে পাবেন না, কিন্তু পাবেন

কী তাদের নিগূঢ় ভাবনা নীরব বেদনা নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সময় সময় কী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন তারা হতে পারে। কিন্তু তা বলে শয়তান তারা নয়। তারা দেবীই। যাতে তাদের দেবী বলে চিনতে ভুল না হয় সেজন্যে আমি তাদেরকে স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধনা করাই। তেমন কৃচ্ছ্র সাধনা ইন্দ্রের শচী তো দূরের কথা শিবের পার্বতীও করেননি। কাজেই তারা দেবীদের চেয়েও দেবী। বিশ্বদেব ভাদুড়ীর গ্রন্থের বেশ্যারাও ব্রহ্মচারিণী, ঝি-রাও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়ে, বিধবারা তো বিশুদ্ধতা মূর্তিমতী। চরিত্রের আদর্শ কঠোর বলেই ওরা হৃদয়হীন, ওরা নির্মম—কার প্রতি? না, প্রেমাস্পদের প্রতি। প্রেমে পড়তে ওরা ত্রুটি করে না, কে যে ওদের প্রেমিক তাও ওরা জানে, কেবল প্রেমের যা সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি সেইটে ওরা বাঁচিয়ে চলে। নায়ক-নায়িকাতে একটা চুম্বন বিনিময়েরও জো নেই, আলিঙ্গন তো অভাবনীয়।

নারীরা তো আমাকে তাঁদের একজন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তরুণরাও আমাকে নিয়ে নারীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছেন, আমি যে তারুণ্যেরও উদ্‌গাতা। আমার নায়কগুলি সাধারণত বাপের পয়সায় উচ্ছৃঙ্খল। প্রেমে যখন ওরা পড়বেই, না পড়ে ছাড়বে না, তখন ওদের জন্যে সে ব্যবস্থাও আমি করে থাকি। সমাজে বেশ্যা ও বিধবা নামক দুটি বেওয়ারিশ মাল বিদ্যমান থাকতে প্রেমিকের ভাবনা কী? কিন্তু প্রেম তো জীবনের সবখানি নয়, ধনের প্রয়োজন, সামাজিক সম্মানের প্রয়োজন। তরুণ মনের বড় সাধের স্বপ্ন প্রেম, কিন্তু রূঢ় বাস্তবের রৌদ্র এসে স্বপন ভেঙে দিলে তরুণের অন্তর বলে, চাই ধন, চাই মান। আমি রিয়ালিস্ট বলে খ্যাত কেন? কারণ আমার নায়ক বেশ্যাকে কিংবা বিধবাকে বিবাহ করতে না পেরে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে। জাত কুল গণ গোত্র সমস্তই শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। অধিকন্তু আসে রাশি রাশি টাকা ও প্রভূত মর্যাদা।

স্ত্রীপুরুষের মিলিত স্তব ইতিমধ্যে আমাকে গড়ের মাঠের গুণীশ্রেষ্ঠদের মতো অশ্বারূঢ় করেছে। এখন মনে হয় ঐ যেন আমার জন্মগত অধিকার, আমার প্রকৃত স্থান। খ্যাতিকে আমি সহজে গ্রহণ করতে পেরেছি, কোনো-দিন তা নিয়ে উত্তেজনা বোধ করিনি। তবু 'ভক্ত' ও 'শত্রু' অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকের মতো আমারও অদৃষ্টে জুটেছে। খ্যাতির শুল্ক জোগাতেই হবে—নিরুপায়।

সেই স্বাস্থ্যনিবাসের নাকের কাছে মস্ত বাড়ি করেছি, বিল শুধতে না

পারার অপমানকে ব্যঙ্গ করতে। শরীরটা সারেনি, প্রকাশকরা দাদন দিয়ে যেন তেইশখানা হাড় খসিয়ে নিয়েছে। ভক্তরা অনাহূত ভাবে এসে কয়েক-দিন আমার এখানে পথ্য ও মাঠে হাওয়া খেয়ে যায়। বলে, "শরীরটাকে সারিয়ে তুলুন, বিশ্বদেব বাবু। দেশ আপনার কাছে এখনো অনেক আশা রাখে। নোবেল প্রাইজ্‌ এখনো জল থেকে ডাঙায় তোলা বাকী।" আমার ফটোগ্রাফ ও অটোগ্রাফ নিয়ে এবং আমার বইয়ের এক সেট ওদের উপহার দিতে হবে জানিয়ে ওরা "আবার আসব" বলে পরম আপ্যায়িত করে বিদায় হয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য, এই আমার বয়স, এই আমার স্বাস্থ্য, তবু এখনো আমার কাছে জীবনবীমার এজেণ্ট ও বিয়ের ঘটক আনাগোনা করে। তাদের অভ্যর্থনার জন্যে একটা সশস্ত্র গুর্খা পুষেছি, তাতেও ফল হয় না। তারা আসে আমার ভক্তের ছদ্মবেশে। আমার উপন্যাস বাস্তবিক ওরা পড়েছে, কথায় কথায় এর পাকা পরিচয় দেয়। জিজ্ঞাসা করে নতুন কী লিখছি, কবে প্রকাশিত হবে, "বজ্র ও বিদ্যুৎ" গল্পটার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় কী, "কে যায়" গল্পটার শেষ অমন হলো কেন, ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা পাড়ে। ভক্তকে ভাগিয়ে দিতে পারিনে। এজেণ্টকে বলি, "কার জন্যে বীমা করব? আমার তিন কুলে কেউ নেই।" অবশ্য কথাটা সত্য নয়। আমার মাসতুত ভাইদের খুড়তুত ভাইরা ও পুত্রকন্যারা ঘন ঘন আগমন করায় আমাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। তারা আর কিছু না হোক সেকেণ্ড ক্লাস রেলভাড়াটা না পেলে নড়বে না।

এজেণ্ট বলে, "আপনার মতো লোক স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের স্বার্থ ভাবলে দেশের অর্থবৃদ্ধি কেমন করে হবে? দেশের কাছে অনেক পেয়েছেন বিশ্বদেব বাবু। দেশকে কিছু দিন।"

ঘটককে বলি, "বানপ্রস্থের বয়স হলো। এই তো শরীর।"

ঘটক বলে, "আহাহা! ভোগায়তন শরীর। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে বানপ্রস্থের বিধি নেই। শরীরের যত্ন নেবার জন্যে চাই একটি গুণবতী স্ত্রী, তার নাই বা থাকল রূপ। (রূপ থাকলে তো তাকে রূপবতীই বলতুম)। হলোই বা তার কিছু বেশী বয়স এবং পিতা যদি তার দরিদ্র হয় তাতেই বা কী? আপনার মতো পরোপকারী দেশবান্ধব একটি কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করলে চিরকাল নাম থাকবে।"

একটা মোটা গোছের বীমা করতেই হলো। যে আসে তাকে দেখিয়ে বলি, "একটা আছে, আর পারিনে।"

কিন্তু ঘটককে ও কথা বলতে পারি কই?

গোপন করব না। ওদের ইঙ্গিত আমার বড় ভালো লাগে। একটি কল্যাণী বধূ আমার আয়ুর লক্ষণ আপন সীমন্তে ও করযুগলে ধারণ করবে। একটিবার ডাকবে, "ওগো"। একটি শিশুপুত্র বা কন্যা আমার কোলে উঠে একটিবার ডাকবে, "বাবা"। যে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেছি তিনি ধন সম্পদের দেবী। যে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আমার ঘরে পড়ল না তিনি মঙ্গলময়ী।

কিন্তু লোকে কী বলবে! আমার তরুণ ভক্তরা করবে না কন্‌ফারেন্সের সভাপতি, বলাবলি করবে, যে-মেয়ে আমাদেরই কোনো একজনের হতে পারত বুড়োটা তাকে টাকার জোরে আত্মসাৎ করেছে। আমার নারীভক্তরা আর চিঠি লিখে উচ্ছ্বাস জানাবেন না। আমি যে আজন্ম ব্রহ্মচারী, আমি যে কলির ভীষ্মদেব, আমার এই প্রতিপত্তি আমার সোনার মুকুট। একটিবার মাথায় সোলার টোপর পরলে এই সোনার মুকুট চিরকালের মতো খসবে। জানি আমার চেয়ে বয়সে বড় অনেক সাহিত্যিক এখনো দ্বিতীয় তৃতীয়বার সোলার টোপর পরছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদন নাকি বিপত্নীক কর্তৃক হবার নয়। কিন্তু আমার তো প্রবৃত্তি হয় না এই বয়সে।

আবার ভাবি কী এমন বয়স। যদি কোনো কল্যাণহস্ত এই রোগাতুর দেহটার উপর বীণার যষ্টির মতো ছুঁয়ে যায় তবে এরই ভিতর থেকে যে ঝঙ্কার উঠবে বাংলাদেশ তার অনুরূপ শোনেনি।

না। কোনোদিন ভালো করে স্ত্রীলোকের পানে তাকাইনি। লজ্জাও করে, ভয়ও করে। স্ত্রীলোককে কল্পনা করেই আমার স্বস্তি, প্রত্যক্ষ করতে আমার হৃৎকম্প। এই তো বেশ আছি। তাকে তেইশখানা বই তেইশটি শিশুর মতো শোভা পাচ্ছে। দেখে নিঃসন্তানের চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

মনের যখন এইরূপ দোলায়িত অবস্থা তখন একদিন একখানি চিঠি পেলুম। খামের উপরকার লেখা থেকে জানলুম বামা হস্তের লেখা। আর একখানি প্রশংসাপত্র হবে। তবু পড়ে দেখতে কৌতূহল হলো। যেমন প্রত্যেক বার হয়ে থাকে। প্রশংসা জিনিসটা পদসেবার মতো। ক্ষমতাশালীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, অথচ একবার ওর স্বাদ নিলে প্রত্যেকবার নিতে লোভ হয়।

কে একজন মঞ্জরী দেবী বিনয়নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন সুমনা চরিত্র

আমি কোথায় পেলুম? তাঁর বন্ধুদের ধারণা আমি তাঁকেই মডেল করে সুমনাকে এঁকেছি। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?—তিনি জানতে চেয়েছেন। —আমি কি কখনো তাঁকে দেখেছি? চিনেছি? যদি না দেখে থাকি, না চিনে থাকি, তবে কেমন করে তাঁর মনের ভাবনাগুলি পর্যন্ত আয়ত্ত করেছি? আমি কি তাঁর সখীদের মুখে তাঁর মনের কথা শুনেছি?

আমি একটু রাগই করলুম। প্রকারান্তরে বলা হলো আমি ফোটোগ্রাফার। যা আমার শত্রুরাও কস্মিন্‌কালে বলেনি। নিজের ঘরে বসে নিজের প্রাণের কথা লিখি, কারুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাইনে, অপরে আমার ভবন আক্রমণ করে আমার স্তুতি গান করে যায় এই তো জানতুম। ওদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের মতো কাপড় পরে না বলে তারাই যে নারী এই অনুমান করি। নইলে নারী বলে যে একটা জাতি আছে তা আমার অজ্ঞাত না হলেও অপরিলক্ষিত। ডাকঘরের সাহায্যে নিরীহ ভদ্রলোককে এমন সুকৌশলে গাল পাড়তে তো দেখিনি। এও এক প্রকার দণ্ড যা খ্যাতিমানকে বহন করতে হয়। চার পয়সা খরচ করে যে কোনো শত্রু সে বেচারার সকাল বেলাটার প্রশান্তি নাশ করতে সমর্থ।

একটা জবাব লিখতেই হলো। রাগ করতে আমিও জানি। কিন্তু এও জানতুম যে যা লিখব তা একদিন না একদিন কাগজে ছাপা হবে। প্রসিদ্ধ লেখকের বাজার খরচের হিসাব পর্যন্ত ছাপা হয়। লেখনীকে সংবৃত করলুম। মঞ্জরী দেবী তাঁর নামের অগ্রে বন্ধনী দিয়ে 'কুমারী' শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন। লেখার ছাঁদটিও কচি। বয়স বিশের নিচেই হবে যতদূর আন্দাজ হয়। "কল্যাণীয়াসু" ও "তুমি" লিখতেই রাগটা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। দেখলুম বক্তব্য যা ছিল কেমন করে তা রূপান্তর ধারণ করেছে। "না, আপনাকে জীবনে দেখিনি"—এর স্থলে লিখলুম, "তোমাকে যদি দেখে থাকি তবে সে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের নিরালায়, আমার আপন মনের মুকুরে। হয়তো তুমি যখন জন্মাওনি তখন থেকে দেখা। আমার আপন আইডিয়া অন্যের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়ে মঞ্জরী নাম নিলে, আমি জানলুম না, তাকে গ্রন্থে নামিয়ে সুমনা নামকরণ করলুম।"

কয়েকদিন পরে আবার সেই আকারের নীল খাম, সেই হাতের লেখা। খুলতেই একখানি ফোটো ঝুপ করে পড়ে গেল। রূপবর্ণনা আমার আসে না। যা তা উপমা দিয়ে পাছে মহানকে হাস্যকর করে তুলি সেই ভয়ে মঞ্জরীর

প্রতিকৃতিকে বিশ্লেষণ করব না। শুধু এইটুকু বলব যে সুমনা যদি কল্পলোক ছেড়ে মরলোকে অবতীর্ণ হতো তবে এই রূপই পরিগ্রহ করত।

লিখেছে, রাম না হতে রামায়ণ কেমন করে রচিত হয়েছিল তা একদিন বিশ্বাস করেনি। মনের প্রবণতা সংশয়ের দিকে। মা পুরাণকে ইতিহাস বলে বিশ্বাস করেন এজন্যে তাঁর সঙ্গে কত তর্ক করেছে। আমার এই যে অতিমানুষিক পুরোদৃষ্টির পরিচয় হাতে হাতে পেলে এতে ওকে সংশয়বাদীর প্রতি সংশয়াপন্ন করেছে। ওর ফিলসফির ছাত্রী হওয়া বৃথা। ফিলসফিতে তো এই রহস্যের নিরাকরণ নেই। অবশেষে সম্বোধন পূর্বক নিবেদন করেছে, "হে মনোজ্ঞ মনীষী, আমার প্রণতি গ্রহণ করুন।"

পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে, "একখানি স্ন্যাপ্‌শট পাঠাতে হঠাৎ খেয়াল হলো।"

এর উত্তরে আমার কিছু বলবার ছিল না। ছবিখানাকে অতি সন্তর্পণে বাক্সবন্দী করলুম, বাইরে রাখলে পাছে কেউ ভুল ভাবে। মাঝে মাঝে বাক্স খুলে আলোয় তুলে দেখি। আমার মানসে সুমনার যে প্রতিমা ছিল এ কি সত্যিই সেই? হাঁ, সেই। "মনোজ্যোৎস্না" যদি নাট্যাকারে অভিনীত হয়—যেমন আমার "পেয়ালা প্রেমিক" হয়েছে—তবে মঞ্জরীকে সুমনার ভূমিকায় নিখুঁৎ মানাবে। ইতিমধ্যে একখানা নতুন উপন্যাস আরম্ভ করেছিলুম। তাই নিয়ে এত নিবিষ্ট ছিলুম যে দাড়ি কামাতে ভুলে যাবার মতো মঞ্জরীর ছবি দেখাও ভুললুম।

কিন্তু ভুলতে দেয় কই? আবার সেই খাম, সেই গোটা গোটা অক্ষরে আমার নাম-ঠিকানা।—"আমার প্রতিদিনের প্রতীক্ষা ব্যর্থ। এক পৃষ্ঠার একখানি চিঠি লেখা আপনার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আপনার এক একটি ছত্র আমার খাদ্য পানীয়। আপনার বাণীর আলোকে আমি জীবনের পথ দেখতে পাই। সুমনাকে অনুসরণ করে চলেছি—আমার পুরশ্চারিণী ছায়া সে।"

এর পর কোন ভক্তের ভগবান স্থির থাকতে পারেন?

"বৌ কথা কও" লিখতে লিখতে আলাদা কাগজে মঞ্জরীকে চিঠি লিখতে শুরু করি। কিন্তু লেখবার কী আছে? আমার বাগানের ডালিয়া, আমার বাঘা কুকুর, আমার মালীর হাবা ছেলে, এদের বর্ণনা দিয়ে কোনো মতে একটি পৃষ্ঠা ভরানো গেল। লেখবার হাত যার আছে তার হাতের ছাইভস্মও সোনা আনে।

এমনি করে সে যাত্রা উদ্ধার পাওয়া গেল। কিন্তু মঞ্জরী ছাড়ে না। তার দাবি সে তার পরবর্তী পত্রে পরিস্ফুট করলে। সে চায় সাত দিনে একখানা করে আমার চিঠি। চাইলেই পারত সাত দিনে একবার করে আমার ফাঁসি। বুঝল না যে দর্শনের ছাত্রীকে লেখবার মতো বিষয় আমি কোথায় পাব। বিশ্বকবি "ভূমা" লিখে প্রকারান্তরে বলে থাকেন "ঘুমা"। আমার অমন কোনো code word নেই। পাঠক-পাঠিকাকে ঘুম পাড়াবার বায়না দিয়ে বিধাতা আমাকে পাঠাননি। বিষয়ের অভাবে অগত্যা তার সেই স্ন্যাপ-শটখানা —যার সম্বন্ধে আগের বারে অভিমত দিইনি বলে সে অভিমান জানিয়েছে— তার সম্বন্ধে আমার ধারণা জ্ঞাপন অর্থাৎ গোপন করলুম।

এর পর সে লিখলে, সে যে বান্ধবী নয়, সে যে আমার কল্পলোকের বাসিন্দে, ক্রমশ তার চেতনার ভিতর এই অনুভূতি ব্যাপ্ত হচ্ছে। সে মঞ্জরী নয়, সে সুমনা। সে পৃথিবীতে নেই, সে আছে সেই অমর্ত্য জগতে যে-জগতে আছে "মনোজ্যোৎস্না"র অন্যান্য চরিত্রগুলি—কুমারেশ, অপরাজিতা, পাঁচু খানসামা, জগু মালী, টম কুকুর। মঞ্জরী হিসাবে তার যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সে মরে যাবে। সুমনা হিসাবে সে অমর। আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, আমি তাকে প্রাণলোক থেকে তুলে নিয়ে অমরলোকে পৌঁছিয়ে দিলুম।—একটি মরা গোলাপ ফুল চিঠির গায়ে এঁটে দিয়েছে।

এরূপ এক একখানা চিঠি আমাকে অভিভূত করে আমার বিবেকে নাড়া দিয়ে যায়। সুমনাকে মঞ্জরী ও মঞ্জরীকে সুমনা বলে প্রতারণা করলুম না তো? অতিরঞ্জন? না, না। সত্যই বলেছি। কবি তার কল্পনার উপাদান এই পৃথিবী থেকে আহরণ করে। কখনো সজ্ঞানে, কখনো অজ্ঞাতসারে। সেই উপাদান দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে সে গড়ে মানব-মানবীর মূর্তি। অবশেষে একদিন ঐ মূর্তিগুলিকে প্রত্যর্পণ করে পৃথিবীরই হাতে। ওদিকে অনুরূপ উপাদান দিয়ে প্রকৃতিও মাতৃগর্ভের অন্ধকারে মানব-মানবীর মূর্তি বানায়, যথাকালে ঐ মূর্তিগুলিকেও পৃথিবীরই কোলে তুলে দেয়। দুই সেট মানবমানবীমূর্তির মধ্যে এমন দুটি কি খুঁজলে মিলবে না, যাদের সাদৃশ্য কেবল ভাবের নয়, রূপেরও? মনের নয়, মুখেরও? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হতে পারে, কিন্তু সত্য। হোরেশিওর ফিলসফিতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে না, কিন্তু হ্যাম্‌লেট একে স্বচক্ষে দেখেছে।

আমি অভিভূত হয়েছিলুম মনে পড়ে। মঞ্জরীকে লিখেছিলুম তার

চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন হলে আমি অর্থ সাহায্য করতে পারি। চিঠিখানা তাকে দিয়ে ভাবনা হয়েছিল ওখানা হয়তো কোনোদিন ছাপা হবে, তখন শত্রুপক্ষ ওর বিরূপ ব্যাখ্যা করবে। করুক, কিন্তু মঞ্জরীর বেঁচে থাকা তার নিজের পক্ষে যেমন আবশ্যক, তেমনি আমার পক্ষেও। কল্পিতাকে জীবিতা বলে জানা অসাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়, জগতে এর পূর্বে এমনটি ঘটেছে কি না সন্দেহ। গ্রীক ভাস্কর পিগ্‌মেলিয়ন তাঁর স্বনির্মিত শিলামূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। সে শুধু প্রবাদ। গ্রন্থের নায়িকা গ্রন্থকারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কোনোদিন কি বলেছে, "আমি শকুন্তলা" বা "আমি মিরান্দা" ?

আমার মৃত্যুর পর আমার এই ডায়েরী পড়ে বন্ধুরা বলবেন, বুড়ো বয়সে আফিং ধরে বিশ্বদেবদার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বয়সে নিশ্চয়ই তিনি এই তরুণীকে শিশু অথবা বালিকা রূপে কোনোদিন দেখে তারপর সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, গল্পের মধ্যে বিস্মৃতির অর্গল খুলে গেল। একটু খোঁজ করলে প্রকাশ পেত যে যমুনা নদীর বন্যায় দাদা একে ভেসে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছিলেন।

শত্রুরা বলবে, বিশ্বদেব বুড়োর বুদ্ধিভ্রংশ যে হয়েছিল সে বিষয়ে আমরাও একমত। তবে তার সঙ্গে কিছু অসাধুতাও ছিল। সোজা লিখলেই হতো যে মেয়েটিকে তিনি কোনোদিন চাক্ষুষ দেখেননি, সুমনা চরিত্রটি কল্পিত। লিখলেন কিনা মেয়েটিকে তিনি তার জন্মের আগে দেখেছেন। দ্বিতীয় সিরাজুদ্দৌলা। বোকা মেয়ে এই পড়ে সগর্বে পাঠালে তার ছবি। সে ছবি আমাদের চোখে পড়েনি, তবু আমরা জোর করে বলতে পারি যে সুমনার যে ছবি বইতে ফুটেছে—অর্থাৎ ফোটাবার নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়েছে—সে ছবির সঙ্গে ও ছবির সাদৃশ্য থাকতে পারে না। কিন্তু নেশার ঘোরে বৃদ্ধ মহারথী লিখলেন কিনা একই ছবি। এর পর যদি মেয়েটির যক্ষ্মা না সারে, যদি পড়াশুনা ও স্বাস্থ্যচর্চা ত্যাগ করে অলসভাবে ধ্যান করতে থাকে যে সে সুমনার মতো তিল তিল করে মরলে সেইটেই হবে রোমান্টিক মৃত্যু, তবে সেই বিপত্তির জন্যে দায়ী আমাদের পরলোকগত নারীঘাতক বিশ্বদেব ভাদুড়ী।

দুই পক্ষই ভুল করবেন গোড়াতেই। তাই এ স্থানে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলি যে মঞ্জরীর সঙ্গে আমার পত্র ব্যবহারকালে আমার কোনো প্রকার

মৌতাত ছিল না। বাক্যগুলো আমি সংশোধন না করলেও ভাবীকাল করবেন। অতএব মঞ্জরীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

মঞ্জরী লিখলে, আমি যে ওর চিকিৎসার জন্যে অর্থসাহায্য করতে ইচ্ছুক এতে আমার মহানুভবতার—মহামানবতার—আর একটি নিদর্শন পেয়েছে। কিন্তু কী লাভ! এই একই রোগে তার বাবা মারা গেছেন, তার দাদাও। এমন কেউ নেই যার জন্যে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। মা অবশ্য আছেন এবং মামারা। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ নেই। শুধু রক্তের সম্বন্ধ। ওঁদের চেয়ে আমি তার আত্মীয়তর। কিন্তু আমার জন্যে বাঁচা ও মরা দুই সমান। চিরকাল আমার স্মৃতিতে সে থাকবে।

আমারও মনে হয় ও যে বাঁচতে চাইলে না এর সত্যিকার কারণ "মনোজ্যোৎস্না"র সুমনাও বাঁচেনি। সুমনাকে সে অনুবর্তন করছিল চোখ বুজে। আমি যদি সুমনাকে দিন দিন মিলিয়ে যেতে না দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতুম তা হলে একখানা উপন্যাস মাটি হতো, কিন্তু একটি মানুষ বাঁচবার প্রেরণা পেত। Goethe তাঁর "Werther" লিখে কত যুবকের আত্মহত্যার হেতু হলেন, ভাবীকাল "মনোজ্যোৎস্না"র লেখককেও কত মঞ্জরীর মৃত্যুর ভাগী করবে। কী কুক্ষণেই "মনোজ্যোৎস্না" লিখেছিলুম ও কেন মঞ্জরীকে মিথ্যা বলিনি এ জন্যে আমার পশ্চাত্তাপ হয়। স্বয়ং যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলেছিলেন, আমিও বলতে পারতুম। কিন্তু আমার তো পুরোদৃষ্টি ছিল না। আমি দৈবজ্ঞ নই, জানতুম না যে মঞ্জরীর যক্ষ্মা দেখা দেবে।

আর একদিক থেকে যদি ভাবি তো পরিতাপের অবকাশ থাকে না। "মনোজ্যোৎস্না"র সুমনা ফুলের গন্ধের মতো মিলিয়ে গেল, পৃথিবীর রূঢ়তা তার সইল না। সুমনার সঙ্গে মঞ্জরীর যখন এমন অলৌকিক সাদৃশ্য তখন দু' জনের যে একই পরিণাম হবে এ তো বিধাতার বিধান। এমন তো হতে পারে যে কুশ-লবের মুখে রামায়ণ গান শোনবার পরে সেই গানের বিবরণকে অনুসরণ করা হলো রামচন্দ্রের শেষ জীবনের কাজ ও সে কাজ সাঙ্গ হলো তাঁর তিরোধানে।

মঞ্জরী যে সুমনা এ বিষয়ে তার সংশয়রাহিত্য তাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছিল। যা অনিবার্য তার গায়ে ডাক্তারী কবিরাজী ইত্যাদি নানা প্রকার ঠেকা দিতে তার আপত্তি ছিল। তার মা ও মামারা অবশ্য নিজেদের কর্তব্য করছিলেন। কিন্তু কালো মেয়েকে বাঁচাতেই হবে এরূপ দৃঢ় সংকল্প

তাদের ছিল না। তার বেঁচে থাকা এমন কী জরুরী! লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন, যাতে সে জীবনে একটা অবলম্বন পায়। তাঁরা তাকে সমুদ্রের ধারে বাস করতে নিয়ে গেলেন ও আশা করলেন যে ওই তার জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রতি সপ্তাহেই পুরী থেকে পেতুম সেই নীল খাম, সেই হাতের লেখা। মৃত্যুর ধীর পদক্ষেপ তাকে চকিত করেনি। তাড়াতাড়িতে লিখছি, ভুল-চুক মাফ করবেন, এমন ভাব সে লেখনীর গতিতে ব্যক্তি করেনি, লেখাতেও না। যা ঘটবার তা ঘটতে যাচ্ছে, ত্বরার অর্থ নেই, শঙ্কাও অমূলক। দশ এগারো মাস এই ছিল তার ধারা। তারপর হঠাৎ তার অসুখ গেল বেড়ে। ডাক্তার তাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করে দিলে। লুকিয়ে লিখতে গিয়ে সে ব্যস্ততা ও উত্তেজনা প্রকাশ করলে। আমাকে একবার দেখতে চাইলে।

এতদিনের জানাশুনা। তবু সাক্ষাৎ করবার কথা কোনোদিন মনে ওঠেনি। প্রস্তাবটা আমাকে বিব্রত করে তুলল। দেখতে না পেলে মঞ্জরী খেদ নিয়ে মরবে। আর যাওয়া কি আমার মতো প্রসিদ্ধ লোকের পক্ষে মুখের কথা? আমার গতিবিধির 'পর সমগ্র দেশের নজর। আমি আমার দেশবাসীর নজরবন্দী। খবরের কাগজের রিপোর্টার আমার উপর পাহারা দিচ্ছে। মধুপুর থেকে কলকাতা গেলে সাড়া পড়ে যায়, হাওড়া স্টেশনে ক্যামেরা ও অটোগ্রাফের খাতা দুটো করে পায়ের উপর ভর দিয়ে ভিড় করে আসে। পুরী যাচ্ছি, টের পেলে স্পেশ্যাল রিপোর্টার সঙ্গে চলবে। মঞ্জরীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কী অপরূপ রোমান্স রচিত হবে কে জানে? বন্ধুরা লজ্জিত হবে, শত্রুরা টিটকারী দেবে, বেচারী মঞ্জরী মরেও নিষ্কৃতি পাবে না। তার নাম মুখে মুখে ছড়াবে, ইতরগুলো তার নামে ছড়া কাটবে।

না, মঞ্জরী, যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমাকে তো তুমি মাসিকের সাপ্তাহিকের দৈনিকের ছবিতে দেখেছ। আমার বাণীও সপ্তাহে সপ্তাহে শুনেছ। দেখাশুনার কিছু বাকী আছে কি?

আমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল টপ টপ করে পড়ে আমার নূতন উপন্যাস "সতীর সতীন"-এর পাণ্ডুলিপি ভিজাল, অক্ষর মুছে দিল। সে যে মরণাপন্ন এ জন্যে নয়, মৃত্যু যার অবধারিত তার জন্যে শোক করে কী হবে? আমি যে তার সামান্য প্রার্থনাটুকু পূরণ করতে পারলুম না ক্ষোভ এই জন্যে। আমি লক্ষপতি, রেলভাড়ার জন্যে ভাবিনে। গরিব কেরানির

মতো ছুটি চেয়ে পাইনি এও নয়। আমার ভয় আমার স্তাবকমণ্ডলীকে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে। যতদিন অখ্যাত সেবাকর্মী ছিলুম, ততদিন মানুষকে ভয় করিনি। আজ আমার খ্যাতি আমাকে রেল প্ল্যাটফর্মের পানবিড়িওয়ালার নিন্দাভীরু করেছে।

দিন কয়েক পরে মঞ্জরীর বড় মামার পত্র পেলুম। যা অনুমান করেছিলুম তাই—মঞ্জরী নেই। যা অনুমান করিনি তাও ছিল। মঞ্জরী নাকি মৃত্যুকালে বলে গেছে যে আমি তার স্বামী।

বড় মামা জিজ্ঞাসা করছেন, তা কেমন করে হলো? যেমন করেই হোক মঞ্জরীর মা সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে শীঘ্রই এখানে আসছেন জামাতা বাবাজীকে আশীর্বাদ করতে।

আমি আফিং ধরলুম।

(১৯৩৩)

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া

আমি বয়সে তরুণ না হলেও আমার মনটা তরুণ এবং আমার লেখনী তারুণ্যের লক্ষণাক্রান্ত। তাই দশটা তরুণ লেখকের নাম করতে বললে লোকে আমার নামটাই করে সব আগে, আর গালাগাল যখন দেয় তখন আমাকেই দেয় সবচেয়ে বেশী। তা দিক, নিন্দায় আমার আয়ু কমে না, তাই মনটাও তরুণ থাকে। উপরন্তু আমার নামটা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক বিনা পয়সায় আমাকে বিজ্ঞাপিত করে। আমার কার্টুন যা ছাপে তা আমার চেহারার চেয়ে দেখতে ভালো। ট্রামে ট্রেনে বাসে মেসে আপিসে চায়ের দোকানে আমার নাম যতবার ওঠে কোনো ঠাকুর-দেবতার নাম ততবার ওঠে না। এখানে বলে রাখি আমি যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কটাক্ষ করলুম তাঁরা সশরীরে বর্তমান। না, আরো খোলসা করে বলব না।

সুখ্যাতি ও অখ্যাতির মধ্যে প্রভেদ যাই থাক, উভয়ই খ্যাতি। আমি খ্যাতি ভালোবাসি। পথে যেতে যেতে যখন কানে পড়ে কেউ ফিস্ ফিস্ করে অন্য কাউকে বলছে, "ইনিই তরুণ সাহিত্যিক মহেশ মহলানবীশ" তখন আমি অনেক কষ্টে আনন্দ সংবরণ করে গাম্ভীর্য রক্ষা করি।

আমাকে খ্যাতির চেয়েও যা উৎফুল্ল করে তা তরুণ সাহিত্যিকদের খাতির। তাদের সকলে যে সাহিত্যিক এটা একটু বাড়িয়ে বলা, হয়তো বানিয়ে বলা। কিন্তু তারা সকলেই তরুণ—বয়সে তরুণ। সন্ধ্যাবেলা তারা কম্পাসের দশটা দিক থেকে উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো আবির্ভূত হয় এবং আমার বৈঠকখানায় বসে আমার চা-সিগারেট উজাড় করতে করতে আমার গল্প উপন্যাস নিয়ে যতটা মেতে ওঠে ঠাকুর-দেবতাদের কথা শুনলে ততটা তেতে ওঠে। আমি যে তাদের একজন এই আমার গূঢ়তম সুখ। তারা যে আমাকে দাদা বলে, মামা কিংবা খুড়ো বলে না, এই আমার আতিথেয়তার চরম পুরস্কার। তারা আমাকে তাদের নিজের নিজের রচনা দেখতে দেয়, আমি আগাগোড়া পড়বার ফুরসৎ পাইনে, পেলেও পড়তে তন্দ্রা বোধ করতুম। তবু ঐ সব একসারসাইজের দু'চার জায়গায় দাগ দিয়ে মনে রেখে দিই, কথায় কথায় উদ্ধার করে লেখকদের উদ্ধার করি। ওরা অবাক, কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়। ওদের রচনার যেটুকু ওদের স্বকীয়, যেটুকু ওদের তারুণ্য, সেটুকু আমি চোখ দিয়ে আত্মসাৎ করি। কারুর আইডিয়া, কারুর ভঙ্গি, কারুর শব্দচাতুরী। তবে গল্পের প্লট যখন চুরি করি তখন জানিয়ে শুনিয়ে চুরি করা নিরাপদ জ্ঞান করি। "ওহে শৈলেশ, তোমার ঐ গল্পটা আমার এমন ভালো লেগেছে যে, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই—তুমি তোমার প্লটটি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" শৈলেশ বোধ করি ওটা কোনো কন্টিনেন্টাল নভেল থেকে টুকেছে। ও কাজ করতে তার কুণ্ঠা নেই। আর আমিও ব্যস্ত মানুষ। কন্টিনেন্টাল নভেল পড়ি কখন? এতে আমি অন্যায় কিছু দেখিনে। প্লটের গায়ে কপিরাইট লেখা নেই। কন্টিনেন্টালরাও যে কার কাছ থেকে সরিয়েছে কে বলতে পারে। স্বয়ং শেক্স্পীয়র দু'হাতে প্লট লুট করেছেন। "পূর্ণশশী মাথে মসী কালো বলুক দেখি?" শেক্স্পীয়রের বেলা কোনো শ্বশুরপুত্র অপহরণের অপবাদ দেয় না!

আমার তরুণ ভাইগুলির মধ্যে স্মরজিৎকে আমি একটু বিশেষ স্নেহ করি। ও আমার প্রশংসা করে ক্লান্ত হয় না। ও আমার চোরাই প্লটের উপর বাটপাড়ি করে। ভাষা নকল করে, শিরোনামা জাল করে। আর তামাশা দেখুন, আমার হাতে দিয়ে বলে, "দাদা, একবারটি দেখে দিন।" আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলি, "সাবাস।" সে যদি সত্যি সত্যি আমার ভাত মারতে পারত তা হলে আমি তাকে ধমকে দিতে ইতঃস্তত করতুম না। আমি জানি আমার একটি গুণ আছে যা বাংলা দেশের অন্য কোনো সাহিত্যিকের নেই। আমি অবচেতন মনের মনীষী। কিন্তু দেশের নাড়ী নক্ষত্র তো জানতে আমার বাকী নেই। ওরা ভাজে ঝিঙে, বলে পটল। আমিও তুলি পাঁক। কিন্তু তার অঙ্গে একটু গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে দিই। আমার গল্পের গন্ধ শুঁকে পাঠক ভাবেন পুণ্যার্জন করছেন। কারণ পাপকে আমি ঘৃণ্য ভাবে দেখাই সমাজকে পাপমুক্ত করতে। আমার বইয়ের শেষ পাতাটা আগে পড়বেন। দেখবেন পাপের শাস্তি আছেই। অন্তত পাপীর ব্যর্থতা আছে., ভয়ঙ্কর ব্যর্থতা। এই তত্ত্বটি স্মরজিৎ আবিষ্কার করেনি। তার যেমন মোটা বুদ্ধি করতে পারবেও না। তাই তার বইয়ের বিক্রি হবে না। পরন্তু সমালোচকরা তাকে বলবে মহেশ মহলানবীশের নকলনবীশ।

স্মরজিৎকে আমি বিশেষ স্নেহ করি তার আরো একটা কারণ আছে।

সে হলো কানাই বাচস্পতির ছেলে। "উল্টা রথ" প্রণেতা প্রাচীনত্বের পুরোধা কানাই বাচস্পতিকে কে না চেনে? দৈনিক পত্রে প্রতিদিন ওর দেড় কলম বরাদ্দ। লাইন পিছু এক আনা পায়। তা হলে বুঝুন ওর মাসিক আয় কত। আমার এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আর নেই। আর কিছু না হই আমি একজন এম-এ। আর কানাই হচ্ছে ঝুটো বাচস্পতি, পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে কোনো এক পরীক্ষা পরিষৎ থেকে উপাধি গ্রহণ করেছে। অথচ কানাই শুধু যে মোটর কেনবার মতো টাকাটা পাচ্ছে তাই নয়, তার নাম আজ গ্রামে গ্রামে। তারপর কানাই আমাকে অকারণে ঠুকছে। আমাকে ঠুকছে, আমার তরুণ ভাইদের ঠুকছে, আমাদের যা বাণী তাকে খোঁটা দিচ্ছে। আমরা নাকি এই সনাতন সমাজের মরা গাঙে পাশ্চাত্য সমুদ্রের কর্দমাক্ত জোয়ার আনছি। আমরা নাকি বাংলার পুরুষকে বিলাসী হতে, বাংলার কুললক্ষ্মীকে কুলটা হতে উদ্দীপনা দিচ্ছি। আরো কত কী! তবে রক্ষা এই যে, কানাই রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত কারুর মুণ্ডপাত করতে ছাড়ছে না। ও যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলীন্যগর্বী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা। বিংশ শতাব্দীর সমাজের স্কন্ধে ভর করেছে।

ওর ছেলে স্মরজিৎ আমার কাছে ওর নিন্দা করে, ওর জীবদ্দশায় ওর শ্রাদ্ধ করে, এতে আমি বাস্তবিক ভারি খুশি। খুশি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হতো। একবার ভেবে দেখুন কানাই লিখছে জামাই ষষ্ঠী সম্বন্ধে বিস্তর বাজে কথা। পরকে আপনার করা, পরের ছেলেকে ঘরের ছেলের চেয়ে সমাদর করা, বাংলার সনাতন বৈশিষ্ট্য, আর্যজাতির ধর্মঃ সনাতনঃ। তার স্থানে স্থানে দেখি গায়ে পড়ে আমাকে দিয়েছে কিলটা চড়টা। কথা নেই বার্তা নেই প্রবন্ধের মাঝখানে আমার নামটা চাপা রেখে (তা-ও যদি নামটা উল্লেখ করত!) আমাকে নিয়েছে একহাত। "তথাকথিত তরুণ লেখক কেহ কেহ বাঙ্গালীর পরম কল্যাণীয় জামাতা বাবাজীবনকে লইয়া পঙ্ক-হোলি খেলিয়াছেন। নিজের কলুষিত কল্পনার পিচকারীতে ছোপাইয়া স্নেহ-দুর্বলতাময়ী শশ্রুমাতাকে জামাতার নায়িকা করিতে এই কুকুরগুলার কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়?"

স্মরজিৎ বাপকে জানিয়েই আমার কাছে আসে, কেয়ার করে না। বলে, "দাদা, আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেইটে সত্য। ওঁর সঙ্গে যেটা সেটা আকস্মিক।" আমি বলি, "তোমার নাম স্মরজিৎ, আমার নাম মহেশ। কী রকম অর্থৈক্য। তুমি বই লিখলে লোকে ভাববে আমিই ছদ্মনাম নিয়েছি।"

স্মরজিৎ ইঙ্গিতটা বোঝে না। ওর বাপের মতো ওর বুদ্ধিটা স্থূল। কেন এবং কেমন করে ও বিপক্ষের শিবিরে এসে বিভীষণ হলো, সেইটে আমার আশ্চর্য ঠেকে। এমনো হতে পারে যে, ও অপর পক্ষের চর। সরলতার ভান করছে। কিন্তু আমি ওকে প্রায় এক বছর কাল পরখ করে দেখলুম। সত্যিই ওর মনটা শাদা। মনটা শাদা বলে গড়নটা মোটা। চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, নাকটা বোঁচা, হাঁটে থপ থপ করে, ওর সর্বদা বিগলিতভাব। ওর যখন পিঠ চাপড়ে দিই তখন মনে হয় ও যদি পুষি বেড়াল হতো তবে মোলায়েম স্বরে ঘড় ঘড় শব্দ করত।

তরুণদের সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করতে করতে আমি তাদের যে কয়জনের ব্যথার ব্যথী হতে পেরেছিলুম, স্মরজিৎ তাদের অন্যতম। তারা সুযোগ পেলেই তাদের পারিবারিক কাহিনী আমাকে ভেঙে বলে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্পে আমাকে কখনো ঘুম পাইয়ে দেয়, কখনো স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। তাদের প্রেমের উপাখ্যান শুনে যখন আমি বিশ্বাস করি তখন বলি, "এমন ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে, আমি এটা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব ঠিক করে রেখেছি।" আর যখন বিশ্বাস করতে পারিনে তখন বলি, "কোন বইতে পড়েছ, বলে ফেল।" কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করবার পরে প্রেমিক পুরুষ স্বীকার করেন যে, সবটা ঘটেনি, কিন্তু এই বলে তর্ক করেন যে, যা ঘটতে পারত তাও ঘটনার শামিল। আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমি আর কিছু না পেরে থাকি এটুকু জানতে পেরেছি যে; আমাদের অধিকাংশ তরুণ নিউরোটিক। আমার কাছে যারা আসে তাদের অধিকাংশই বায়োস্কোপ দেখে ও নভেল পড়ে তথাবর্ণিত কাল্পনিক জগৎকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করে ও নিজেদেরকে সেই জগতের মানুষ বলে ভাবতে ভাবতে সত্যি সত্যি তাই হয়ে যায়। গোলমাল বাধে যখন নভেল না পড়া পাঁচি কিংবা খেঁদি—যাদের ভালো নাম সুলতা কিংবা আরতি—তাদের অনুরাগ আকর্ষণ করে। অথবা পাশ না হতে পারলে বাবা কঠিন কথা বলেন। অথবা পাশ হলেও মার্চেণ্ট অফিসে পর্যন্ত আবেদন না-মঞ্জুর হয়। সাহেবের সঙ্গে একবার ইণ্টারভিউ পেলে কি শৈলেশ কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যে নব অভ্যুদয় সম্বন্ধে দু'চার কথা বলবার ছল পেত না? দুটো কোটেশন ও দশটা য়্যালিউশন দিয়ে নিজের বক্তব্যটা বিশদ ও উদ্দেশ্যটা সফল করত না?

স্মরজিৎ ঠিক নিউরোটিক না হলেও কালের হাওয়া তাকেও স্পর্শ করেছে।

সে আমাকে পিছু ডেকে বলে, "দাদা, আপনাকে বিরক্ত করতে সত্যিই চাইনে, কিন্তু একটা খবর না দিয়ে বিদায় নিতেও পারিনে।" আমি অগত্যা চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বসি এবং ঠাকুরকে বলি সবুর করতে। স্মরজিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, "এগারোটা। কিন্তু এতক্ষণ ওরা সব ছিল, ওদের কাছে কি বলা যায়?"

"কী কথা?"

স্মরজিৎ গৌরচন্দ্রিকা বিস্তার করে। আমি থামিয়ে দিই। আমার কাছে লজ্জা কিসের? আমি তো ওর স্বনামা। আমিও তো তরুণ।

স্মরজিৎ প্রেমে পড়েছে।

এতদিন পড়েনি কেন তার কৈফিয়ৎ দিক।

কাউকে এতদিন মনে ধরেনি।

মনে মনে বলি, স্মরজিতেরও মনে ধরবার দাবি আছে, যদিও তাকে কারুর মনে ধরা দুর্ঘট। তারপর?

তারপর স্মরজিৎ কবিতা লিখতে শুরু করেছে, কিন্তু কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। এই বলে সে এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে। সবগুলিই মুক্ত-বন্ধ। ভাবের তাড়নায় মুক্তকচ্ছ ভাবে ধাবমান।

ব্যাঙ কয়, হে আমার ব্যাঙানি
ঠ্যাং তুটি
প্রতিদিন তোমার গলির পথে
পেণ্ডুলাম সম।
তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

তার স্পর্ধা আমাকেও ঈর্ষান্বিত করলে। আমি এত কিছু পারলুম, কিন্তু কোনো মতে মিল জোটাতে পারিনি বলে কবিতা লিখতে পারলুম না। স্মরজিৎ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমি পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গেলুম।

তুমি যে উর্বশী নও
নও বিয়াট্রিস
আফ্রডিটি নও
নও হেলেনা যে

তাই তুমি সত্যতর
তাই তুমি আমার
প্রেয়সী।
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

আমি নিজের সবজান্তাগিরি প্রকট করবার জন্তে জায়গায় জায়গায় বদলে দিলুম। পরিবর্তিত সংস্করণ এইরূপ হলো।

"হে আমার ব্যাঙানি"—ব্যাঙ কয়—
"ঠ্যাং দুটি প্রতিদিন পেণ্ডুলাম সম।"
"কোনখানে?"
"তোমার গলির পথে"—ব্যাঙ
মক মক করে।
"তোমার ঘ্যাঙানি"—ব্যাঙ মুখ ফুটে বলে না—
"কানেই শুনিনি শুধু, শুনেছি প্রাণে।"
তারপর মুখ ফুটে—(বলে)—
"তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে।"

এর পর আমিও কবিতা লেখা ধরলুম। কাগজে যখন দুটি একটি ছাপা হলো কোনো কোনো সমালোচক ওগুলির নাম দিলে "গবিতা" এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা বানাল প্যারাডি। এই তো আমি চাই! সুনাম সকলের অদৃষ্টে জোটে না, কিন্তু দুর্নাম জোটে ক'জনের অদৃষ্টে? আমার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষের। আর দুর্নামে আমার হার হলো কই? কাগজওয়ালারা আমার গল্প আর কবিতা চেয়ে বিনামূল্যে ওদের পত্রিকা পাঠাচ্ছে। দাম দেবে না সেটা জানি। কিন্তু নাম তো হবে।

ইতিমধ্যে স্মরজিতের পায়ের পেণ্ডুলাম সুনলিনীদের পাড়ায় আন্দোলিত হতে হতে আন্দোলন তুলেছে। তাকে একদিন পাকড়াও করে সুনলিনীর বাবা তার বাবার নাম ঠিকানা আদায় করে কানাই বাচস্পতিকে চিঠি লিখেছেন। স্মরজিৎ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপকে ধরা দিচ্ছে না। তবে আমার এখানে হাজিরা দিয়ে যায়, বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে,—"দাদা, ব্যাঙানির বাড়ি ঠ্যাঙানি খেতে ভয় করিনে। কিন্তু ব্যাঙানিকে না দেখতে পেলে বাঁচব না।"

আমি দায়িত্বহীন প্রেম বরদাস্ত করতে পারিনে। যে বলে, "বাঁচব না", আমি তাকে ক্ষেপিয়ে বলি, "বেশ তো, আমি তোমার শব দাহ করতে নিয়ে যাব।" শুধু দায়িত্বহীনতা নয়, মিথ্যাও বটে। প্রাণ দিয়ে ফেলা কবিতা লেখার মতো সোজা নয়। আমার ব্যাঙানির গোঙানি শুনতে শুনতে আমিই কতবার আত্মহত্যার সংকল্প করেছি। তারপর সে সংকল্প ত্যাগ করে ওর শুশ্রূষা করতে লেগে গেছি।

ওকে বললুম, "মিতা, আমাকে কবিতা লিখতে তুমিই প্রবর্তিত করলে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি একটু মানুষের মতো হও তো আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করি।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা আমার পেশা নয়। আমি ইস্কুল মাস্টার নই। তবু স্মরজিৎকে হাতে নিলুম। কানাই বাচস্পতির উপর শোধ তুলতে হবে। স্মরজিৎ আমার অস্ত্র। ওকে বললুম আমার এইখানেই উঠতে। তারপর সুনলিনীর বাপের কাছে নিজেই গেলুম ঘটকালি করতে।

তিনি গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়িয়ে দু'জন ভদ্রলোককে শোনাচ্ছিলেন। আর ডান হাত উঠিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে টেবলের উপর চাপড় মারছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "আমারই নাম তিনকড়ি, বসুন।"

আমি প্রথমটা বুঝতে পারলুম না এই সকাল বেলা গান বাজনার এ আয়োজন কেন। তারপর তিনি নিজেই আমার সংশয় ভঞ্জন করলেন।

"এই আমাদের নিউ মডেল। কেমন পরিষ্কার আওয়াজ। কেমন মজবুৎ মেশিন। দাম মোটে দুশো দশ টাকা। আমার কাছে কিনলে দশ পারসেণ্ট কমে পাবেন।" এই বলে আমার দিকেও তাকালেন।

আমি ছাড়া যে দু'জন আগন্তুক বসেছিলেন তাঁদের একজন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—আমাদের অন্য একটু কাজ ছিল। আগে এঁর পরিচয় দিই। ইনি হলেন পণ্ডিতরাজ কানাই বাচস্পতি।"

তিনকড়িবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এতক্ষণ বলেননি! না জেনে বড় অপরাধ করেছি। ওরে ও ফেলি, পান নিয়ে আয়।"

হাত জোড় করে বাচস্পতিকে মস্ত একটা নমস্কার করে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই রইলেন। বাচস্পতি মৃদু হাস্য করতে থাকলেন। আমিও বাচস্পতিকে অবহিত হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। দিব্য বলীবর্দের মতো আকার ও

আকৃতি। মুণ্ডিত মস্তকে বিল্বপত্রমণ্ডিত শিখা। পায়ে পণ্ডিতী চটি ও গায়ে কোরা চাদর।

বাচস্পতির সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সেটি বোধ করি তাঁর আপিসের কেউ হবে। সে বললে, "এই যে—এই—আপনার কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়ে বাচস্পতি মশাই একান্ত বিচলিত হয়েছেন। তিনি দেশকে যে বাণী দিনের পর দিন শুনিয়ে যাচ্ছেন এক কথায় সেটি হচ্ছে এই যে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। স্বধর্ম কাকে বলি? না, যা স্বদেশের ধর্ম। আর ধর্মই বা কাকে বলি? না, যা লোকাচার। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন তার থেকে অনুমান হয় যে, তাঁর নিজের গৃহেই পরধর্ম—ম্লেচ্ছাচার—বিজাতীয় কোর্টশিপ প্রবেশছিদ্র অন্বেষণ করছে।"

বাচস্পতি মৃদু হাস্য করতেই থাকলেন। দেখে মনে হলো না যে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত।

সেই লোকটি নিঃশ্বাস নিয়ে তার বক্তৃতার অনুবৃত্তি করলে। "বাচস্পতি মশাই স্বনামধন্য সমাজরক্ষী। তিনি আভ্যন্তরিক শত্রুর ভয়ে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করছেন। তাঁর মতে এর একমাত্র প্রতিকার পুত্রের মতি পরিবর্তন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের মতি তিরস্কার বা সদুপদেশের বাধ্য নয়। অতএব নিতান্ত দায়ে পড়ে তিনি স্থির করেছেন—নিতান্তই নিরুপায় হয়ে তিনি প্রস্তাব করছেন যে—"

বাচস্পতি অমনোযোগের ভান করলেন। আমি মনোযোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলুম। গ্রামোফোনের এজেণ্ট তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে হাঁ করে সেই লোকটির কথাগুলি গিলতে থাকলেন।

"প্রস্তাবটা বেশী কিছু নয়। বাচস্পতি মশাই যখন বিপত্নীক ও মেয়েটি বিবাহযোগ্যা তখন আপনার দিক থেকে আপত্তি না থাকবারই সম্ভাবনা। থাকলে কিন্তু আমরা আপনার উপর পীড়াপীড়ি করতে অনিচ্ছুক।"

তিনকড়ি বাবু স্তম্ভিত। আমিও তদবস্থ। বাচস্পতি তখনো মুখ টিপে হাসতে থাকলেন। আর সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। পান হাতে করে ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার করলে একটি সতেরো আঠারো বছর বয়সের তন্বী। সুন্দরী নয়, কিন্তু সপ্রতিভ। পান দিয়ে এক পাশে চুপ করে দাঁড়াল তার বাবার আদেশের অপেক্ষায়। তিনকড়িবাবু বোধ করি তার সঙ্গে বাচস্পতিকে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিলেন। আমিও তাই করছিলুম।

বাচস্পতির স্বপক্ষে একটি পয়েণ্ট তার গায়ের রং ধবধবে শাদা। সুনলিনীর বিপক্ষে তেমনি একটি পয়েণ্ট তার গায়ের রং মলিন শ্যাম। সে গা মেজে আসার সময় পায়নি, পেলে হয়তো মলিনের স্থলে উজ্জ্বল লিখতে পারতুম।

তিনকড়িবাবু মেয়েকে যাবার অনুমতি দিয়ে বাচস্পতির বান্ধব প্রতিভূকে বললেন, "এ আমার আশাতীত। কল্পনাতীত। ধারণাতীত। তাই মনঃস্থির করতে গৃহিণীর সহায়তা লাগবে। বুঝলেন কিনা এসব তো গ্রামোফোনের ব্যাপার নয়—"

প্রতিভূটিকে অভিজ্ঞ ঘটক বলে মনে হলো। তিনকড়ি দরদস্তুর না করে মেয়ে ছাড়বেন না, এটা আঁচতে তাঁর দু'মিনিট লাগল না। "বেশ, আপনিও চিন্তা করুন, আমরাও। মহেশ মহলানবীশের সাগরেদ হয়ে ছেলেটা বখেছে। নইলে বাচস্পতিদার এমন কী গরজ।" কিছুক্ষণ নীরব থেকে সশব্দে— "আমি মশাই, পশুর মতো স্পষ্টবাদী। সারাজীবন গ্রামোফোন চিনলেন, মানুষ চিনলেন না। বাচস্পতিদা'র চরণে চর্ম পাদুকা ও গাত্রে উত্তরীয় দেখেছেন, বাইরে যে তাঁর নিজের কেনা অস্টিন দাঁড়িয়েছে সেটা দেখেননি। তালতলা গলিতে যে তাঁর নিজের করা দ্বিতল ইষ্টকালয় আছে সেটা দেখেননি। তাঁর পকেট নেই বলে তিনি যে মাসের পয়লা তারিখে গড়ে তিনশো টাকা কোনখান দিয়ে নিয়ে যান তাও অনুমান করতে পারেন না। আর ঐ তো আপনার মেয়ে। বয়স পঁচিশের কম হবে না। আর বাচস্পতিদা'র মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স, তার মধ্যে তেরো বছর বিপত্নীক।"

আমি একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়েছিলুম। মহেশ মহলানবীশের কার্টুন কে না দেখেছে? ওরা যে এতক্ষণ চিনতে পারেনি এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে ওরা একটু পরে চিনতে পারবে না।

তিনকড়ি দমে গেলেন। তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, "ত-ত-তা আমার পাঁচটি নয় সাতটি নয় ঐ একটি মাত্র মেয়ে। এ-এ-এইবার আই-এ দেবে। গ-গ-গরিব হলেও আমার যে একেবারে কিছুই নেই তা নয়। সোজাসুজি না বলছিনে, শুধু কিছু সময় চাইছি, কী নাম আপনার?"

"গিরিজাপতি—"

"গিরিজাপতি বাবু।"

কানাই তার বিরাট বপু নিয়ে উপবেশন সুখ উপভোগ করছিল, গিরিজাপতি তাকে ঠেলা দিয়ে বললে, "উঠুন বাচস্পতিদা, উঠুন। আপনার

সময় এত স্বল্পমূল্য নয় যে, চাইলেই দান করে ফেলবেন। কালকের কাগজেই তিনকড়ি বাবুর মেয়ের কোর্টশিপ কাহিনী ছাপা হবে। আর আপনি তো ঘেঁটু পূজার উপর লিখতে যাচ্ছেন, ওরই এক জায়গায় একটু কলমের খোঁচা—"

বলতে বলতে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠে বসল। তিনকড়ি বাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, "দেখলেন তো মশাই গুণ্ডামি।"

আমি অসহায় বোধ করছিলুম। কানাইয়ের হাতে দৈনিকপত্রের শিলনোড়া। দৈনিক একটা করে তিনকড়ির দাঁত ভাঙবে। তিনকড়ি মামলা করতেও রাজি হবে না, পাছে পারিবারিক প্রাইভেসী ক্ষুণ্ণ হয়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, "কই মশাই, কনক দাসের এক সেট রেকর্ড দেখালেন না? আমি কখন থেকে বসে রয়েছি।"

তিনকড়ি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, "এই যে" "এই যে" করতে করতে রেকর্ডের বাক্স ঘাঁটতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। তাঁর মন ছিল অন্যত্র। বোধ হয় অন্দরে, গৃহিণীর আঁচলে। আমি দয়া করে উঠলুম। বললুম, "থাক মশাই, অর্ডার দেওয়া রইল। ঠিকানাও দিয়ে যাই। সময়মতো পাঠিয়ে দেবেন।"

আমার কার্ড পড়ে তিনকড়িবাবু দাঁত বার করে হাস্‌লেন।—"কী সৌভাগ্য, স্বনলিনী আপনাকে কতবার দেখতে চেয়েছে। আপনার সমস্ত বই ওকে কিনে দিতে হয়েছে। একটু অনুগ্রহ করে বসতে আজ্ঞা করেন তো ওকে বলি চা করে আনতে।"

আমি ঘাড় নাড়লুম। অন্য একদিন আসব। এ পাড়া ও পাড়া।

স্মরজিৎকে ডাক দিলুম। সে রাশি রাশি "মুক্তকচ্ছ" লিখে বিরহ উদ্‌যাপন করছিল। আমার ডাক শুনে খাতাশুদ্ধ উপস্থিত হলো। আমি টান মেরে বললুম, "ওসব রাবিশ রাখো। কাজের সময় কাজ, লেখার সময় লেখা।"

ও খুব ভয় পেলে। আমি একটু নরম হয়ে বললুম, "তোমার বাবা স্বনলিনীকে বিয়ে করবেন বলে ক্ষেপেছেন। এ বিয়ে বন্ধ করা চাই-ই।" জানতুম তিনকড়ি দু'দিন পরে বাচস্পতির পায়ে না ধরে পার পাবে না।

স্মরজিতের মুখ শুকিয়ে গেল। তার চোখে জল দেখা দিলে। তার হাত থেকে কবিতার খাতা মেজেতে পড়ে হাওয়ায় উড়ল। সে একবার বললে, "ও হো হো।" তারপর বললে, "আমি বাঁচব না।"

আমি ধমক দিয়ে বললুম, "আলবৎ বাঁচবে। ও মেয়েকে বিয়ে করতে হবে তোমাকেই।"

স্মরজিৎ কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ক্ষমা করুন দাদা। বাবা যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন সে আমার মা। মাতৃগমন মহাপাপ।".

আমি দেখলুম রাগ করাটা এ ক্ষেত্রে ভুল পলিসি। তা হলে স্মরজিৎ হাতছাড়া হবে। কানাই জিতে যাবে।

আমি স্মরজিতের মাথায় হাত বুলিয়ে বললুম, "সে-ই বীর যে ঠিক সময়ে ঠিক কর্তব্যটি করে। সে-ই পুরুষ যে নারীকে অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ইতস্তত করে না, অন্যায়কারী যেই হোক।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া কি একদিনের কাজ? হপ্তাখানেক পরে স্মরজিৎকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম যে, সে সুনলিনীকে যেমন করেই হোক বিয়ে করবে। ওদিকে কানাই তিনকড়িকে নিয়ে বিয়ের তারিখ ফেলেছে। আমার কাছে কন্যাপক্ষের একখানা নিমন্ত্রণ পত্রও এসেছে। কানাই যে খুব ধুমধাম করে বৌ আনতে যাবে এ গুজব আমি তার আপিস থেকে আনিয়ে নিয়েছি। বিনাপণে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে সে। বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ পেয়ে এজন্যে তাকে অভিনন্দন করে এক প্যারাগ্রাফ ইতিমধ্যেই তার কাগজে বেরিয়েছে।

আমারও রোখ চেপেছে কিছুতেই এ বিয়ে আমি হতে দেব না। আমার ভক্ত পাঠিকা কানাইয়ের হাতে পড়ে আমার নিন্দা শুনতে থাকবে? অসম্ভব! এ কালের কলেজে পড়া মেয়ে একটা "রাজভাষা" পড়ে ইংরাজী শেখা ছাত্রবৃত্তি পাশ টিকিওয়ালার ঘর করবে? অসম্ভব! যেখানে বয়সের সামঞ্জস্য নেই, শিক্ষার সামঞ্জস্য নেই, রুচির সামঞ্জস্য নেই, সেখানে সুখেরও আশা লেশমাত্র থাকতে পারে না।

বিয়ের দিন স্মরজিৎকে ডেকে চুপি চুপি বললুম, "রাঁধুনি বামুন সেজে সুনলিনীর বাড়ি বহাল হতে হবে। ওর বাবা তোমাকে বাবুবেশে দেখেছেন, খালি-গায়ে দেখলে চিনতে পারবেন না। ওদের বাড়ীতে কাল বিয়ের হৈ চৈ, কে কার খোঁজ রাখে। এক সময় সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বোলো সাড়ে ন'টায় আমি মোটর নিয়ে গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করব। তোমরা এলে তোমাদের এখানে এনে সেই রাত্রেই বিয়ে দেব।"

রাঁধুনি বামুন সাজতে ওর লজ্জা, সুনলিনীর সঙ্গে দেখা করতে ওর শঙ্কা এবং সুনলিনীকে বিয়ে করতে ওর বাসনা; এই টে-টানায় পড়ে ও কেমন হয়ে

গেল। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। ন যযৌ ন তস্থৌ। আমি ব্যঙ্গ করে বললুম, "কী হে, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে। ঐ সাহসের একটি কণা দেখালে বিয়েও করবে, শ্বশুরের গ্রামোফোনের টাকাও পাবে, হয়তো মাঝারি লেখকও হয়ে দাঁড়াতে পারো।"

ওকে তালিম দিলুম। ওর নাম ক্ষেত্রমোহন। ওর বাড়ী পুরুলিয়া। কলকাতায় নতুন এসেছে কাজ খুঁজতে। কে ওকে বলেছে এ বাড়ীতে বিয়ে। ওর রান্নার নমুনা দেখুন। শ্রীযুক্ত মহেশ মহলানবীশ ওর রান্নার প্রশংসা করে ওকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন।

ওকে কয়েকটা রান্নাও শিখিয়ে দিতে হলো। কানাইয়ের চিরদিন এই সমৃদ্ধি ছিল না। কানাই যখন ভিক্ষা করে খেত তখন স্বরজিৎকেই রান্না করতে হতো। সে সব সে একেবারে ভুলে যায়নি, তবে ভোলবার ভান করছে। তাই আমিও শেখাবার ভান করলুম।

বলিদানের পাঁঠার মতো চমকে চমকে ওঠে, একবার এগোয়, একবার থমকে দাঁড়ায়, একবার ফেরে। ওকে তিনকড়িবাবুর গলির মাথায় পৌঁছে দিয়ে আমি একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলুম।

ওর উপর আমার ভরসা ছিল না। শেষ পর্যন্ত ও হয়তো তিনকড়ির তিন তাড়া খেয়ে পিটটান দেবে। তিনকড়ি ওকে চিনে ফেলতেও পারেন। গেলুম আমার এক পুলিশ বন্ধুর কাছে। খুলেই বললুম। না বললেও চলত। কেননা কানাইয়ের কাগজ ওকেও ঠুকেছে, ওর রাগ আছে কাগজের কর্তাদের উপর। ও বললে, "কিছু করতে হবে না। কানাইকে আমি চিনি। অমন ভীতু লোক ভু-ভারতে নেই। আমি ওর আপিসে ফোন করে জানাচ্ছি, খবর পাওয়া গেছে ওর লেখা পড়ে মুসলমানেরা ক্ষেপেছে। ও যেন এক্ষুণি কলকাতা ছাড়ে।"

শুধু ওইটুকুতে কি ফল হবে? আমার সংশয় গেল না। কিন্তু ভারিণী বললে, "ফলেন পরিচীয়তে। তুমি সবুর করে দেখ, এ ঠিক মেওয়া ফলবে।"

গলিতে ঢুকে শুনতে পেলুম একজন আরেক জনকে বলছে, "আবার বাধল।"

"কী বাধল, মশাই?"

"হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। শোনেননি, কানাই বাচস্পতির ভুঁড়িটা ফাঁসিয়েছে?"

আমি পুলকে শিউরে উঠলুম। নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি রেখে হর্ন বাজালুম। স্বরজিৎ ও তার বধূ আসে না। বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম দক্ষযজ্ঞের মতো ব্যাপার। পাড়ার অর্ধেক খালি হয়ে গেছে, কলকাতা ছেড়ে উধাও। বাড়ির চাকর-বাকরেরাও বলছে, "আমাদের ছেড়ে দিন, কর্তা। আমরা পালিয়ে বাঁচি।" ভিতর থেকে মহিলাদের কান্নার রোল কানে আসছে। আর আমাদের স্বরজিৎ রাঁধুনি বামুনের বেশে পেণ্ডুলামের মতো একটি রেখা ধরে একবার অন্দরের দিকে ছুটে যাচ্ছে, একবার সভার দিকে ছুটে আসছে। আমি তার গতিরোধ করে দাঁড়ালুম। বললুম, "কী ঠাকুর, কী হয়েছে?"

তাকে নেপথ্যে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে বললুম, "Mind your own business. নিজের কাজ কতদূর?"

এখনো সে সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়নি। অকর্মণ্য! কলকাতা ছাড়বার জন্যে নিশ্চয় সুনলিনী ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। এই তো সুযোগ। তাকে তাড়া দিলুম, "যাও, দেখা করে বলো তুমি ওকে উদ্ধার করতে এসেছ।"

সে কি শোনে? শুধু বলে, "হায় হায় বাবা।"

আমি প্যারডি করে বললুম, "হায় হায় হাবা!" তারপর তাকে ধরে নিয়ে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম। সে যেন আমার বাড়ি গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করে। তার বাবার খবর নিতে যেন নিজেদের বাড়িতে যায় না। সেটা গুণ্ডারা ঘেরাও করেছে।

"এই যে শ্রীযুক্ত মহলানবীশ", তিনকড়ি বাবু উন্মাদের মতো বললেন, "ওসব বিশ্বাস করবেন না, বুঝলেন? মাথার উপর ভগবান থাকতে এ কি কখনো হতে পারে? আমার দশাটা একবার ভেবে দেখা তো ভগবানের উচিত?"

আমি মনে মনে বললুম, ভগবানকে যত বড় ভাবুক লোকে মনে করে তিনি তত বড় নন। মহেশ তাঁর উপর খোদকারী করবে। দেবেই আজ রাত্রে স্বরজিতের বিয়ে।

খবর নিতে তিনকড়ি যাকে পাঠিয়েছিলেন সে এসে পড়ল। বললে, "বাচস্পতি মশাই গুম হয়েছেন।"

তিনকড়ি কপালে চাপড় মেরে ডাক ছাড়লেন, "হা ভগবান, গুণ্ডার হাতে দৈবী খুন।"

ভিতরে ধামাকণ্ঠের সানাই বেজে উঠল।

দাঙ্গা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যে ক'জন বাকী ছিল তারাও সরে পড়তে লাগল। পাড়ার ছোকরাদের উপর এতদিন তিরস্কার বর্ষণ হচ্ছিল তারা নিষ্কর্মা বলে। এখন তারাই হলো পাড়ার ভরসা। দেখতে দেখতে অনেকগুলি হকি স্টিক্ ক্রিকেট ব্যাট টেনিস র‍্যাকেট বারবেলের ভাঙা কাঠের মুগুর নির্গত হলো।

বাপ মরলে ছেলের বিয়ে সেই রাত্রে হতে পারে না। আমার শেষ চাল ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি তিনকড়ির বাড়ি থেকে তারিণীকে ফোন করলুম। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে কানাইয়ের খুনের গুজব রটেছে। কে জানে এই অবলম্বন করে শেষ কালে একটা সত্যিকার দাঙ্গা বেধে বসবে। তারিণীও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বললে, আসছে।

ইতিমধ্যে সকলে তিনকড়িকে ধরাধরি করে একখানা তক্তপোষের উপর শুইয়ে দিয়েছিল। পুলিশের লোক দেখে তাঁর চেতনা ফিরল। তারিণী বললে, "তিনকড়িবাবু, আপনি বিবেচক ব্যক্তি। পুলিশের কাছে খবরটার সত্য মিথ্যা যাচাই না করে চট করে বিশ্বাস করে ফেললেন যে, বাচস্পতি মশাই খুন ?"

"শুনলুম তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

"অদৃশ্য হয়তো তিনি স্ব-ইচ্ছায় হয়েছেন। অমন একটা গুজব শুনলে কে না অদৃশ্য হয়ে যায় ?"

এইবার আমার পালা। তিনকড়ি ও তাঁর দাদা রাখোহরি বাবু আমাকেই মুরুব্বি পাকড়ালেন। "শ্রীযুক্ত মহলানবীশ, বিবাহ তো স্থগিত থাকতে পারে না।"

"তা তো পারেই না।" আমি এতক্ষণ মনে মনে মহলা দিচ্ছিলুম, মহলানবীশের মহলা। বললুম, "হয় আজ রাত্রেই বাচস্পতি মশাইকে খুঁজে বার করতে হবে, নয় পাত্রান্তরে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে।" তিনকড়ি ও রাখোহরি মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। হয়তো ভাবলেন মহলানবীশ নিজেই কেন বরের পিঁড়িতে বসে যান না ? কানাইয়েরই সমবয়সী, তফাতের মধ্যে আছে এক চির শয্যাগতা স্ত্রী। না থাকারই সামিল।

আমি প্রলোভন দমন করলুম। সুস্থকায়া স্ত্রী পেলে আমি তো আর অবচেতন মনের মনীষী রইব না, আমার পেশা যাবে, বাংলার সাহিত্য আমার বিশিষ্ট দান থেকে বঞ্চিত হবে।

বললুম, "দেখুন, বাচস্পতিকে আজ রাত্রে কলকাতায় পাবেন না। প্রাণ আগে, না পরিণয় আগে? তা বলে বাচস্পতি ছাড়া কি পাত্র মেলে না? এই তো বাচস্পতিরই ছেলে স্মরজিৎ রয়েছে—"

তিনকড়ি কথা কেড়ে নিয়ে ভারি উষ্মার সহিত বললেন, "সেই হতভাগাটার জন্যেই তো এই বিপদ। দু'বেলা সামনের গলিতে ঘুর ঘুর করত। ফেলির পড়াশুনায় মন বসত না, তাই জানিয়েছিলুম বাচস্পতি মশাইকে। কী কুক্ষণেই জানিয়েছিলুম। শ্রীযুক্ত মহলানবীশ তো স্বচক্ষে দেখেছেন সে কী জুলুম।"

"ও কথা ভুলে যান, তিনকড়ি বাবু।" আমি প্রবোধ দিয়ে বললুম। "উপস্থিত বিবেচনা করুন আজকের এই অর্ধেক খালি কলকাতা শহরে স্মরজিৎকে মেয়ে দেবেন কি অন্য কাউকে খুঁজতে বেরোবেন। স্মরজিৎ বি-এ পাশ, এইবার ল দেবে। আপনার মতো মুরুব্বি আর আমার মতো হিতৈষী পেলে ও যে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাসবিহারী কি তৃতীয় আশুতোষ হবে না কে একথা জোর করে বলবে? যৌবনকালে কত মহাপুরুষ কত কীর্তি করেছেন। ও তো শুধু নিজের পায়ের জুতো খইয়ে আপনার বাড়ির সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে।"

তিনি একবার গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বহুবিধ কাতরোক্তি করতে করতে বললেন, "সেই মেয়ে পাগ্‌লাকেই মেয়ে দেব। এখন তাকে পাই কোথায়?"

সে ভার আমিই নিলুম। গেলুম স্মরজিৎকে আনতে। ভগবানের চেয়েও বড় ভাবুক আছে। সে মহেশ। সেই মহলানবীশের মহলা বিধির বিধানকে পরাজিত করে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারে সেই মহলানবীশ।

কিন্তু কোথায় স্মরজিৎ? রয়েছে একখানা চিঠি।—"দাদা, পিতার ইঙ্গিতাকে পত্নী করতে পারব না। আমার মরণ শ্রেয়। চললুম মরণের সন্ধানে। ইতি। অভাগা স্মরজিৎ।"

এইখানে গল্পটি শেষ করে দিলে পাঠক হয়তো স্মরজিতের মরণে অশ্রুপাত করবেন। সেটা অনর্থক। স্মরজিৎ দিব্যি বেঁচে আছে, তবে আমি ও আমার নবীনা স্ত্রী তার মুখদর্শন করিনে।

উপযাচিকা

বাবা লিখেছিলেন সন্ধ্যার গাড়িতে আসছেন। তাড়াতাড়িতে বাংলোটাকে নৈষ্ঠিক হিন্দুর আবাস করে তুলতে আমার মতো একা মানুষের সামান্ত পরিশ্রম হয়নি। অবশেষে স্টেশনে গিয়ে দেখলুম তিনি আসেননি। ভাবলুম হয়তো ট্রেন মিস্ করেছেন, ভোরের গাড়ীতে আসবেন। তাঁর জন্যে হিন্দুর দোকানের খাবার আনিয়ে রেখেছিলুম, তুলে রাখলুম, যদিচ জিনিসগুলির উপর আমার নিজের বৈলাতিক বিরাগ ছিল না মোটেই।

ভোরের গাড়ির জন্যে রাত থাকতে উঠতে হয়। অতটা পিতৃভক্তি আমার মতো ঘুমকাতুরে লোকের শরীরে সয় না। পাঠালুম আমার চাপরাশীকে। বাবার নামটা পঞ্চাশবার মুখস্থ করালুম, চেহারাটাও বাক্য দিয়ে এঁকে কান ধরে দেখালুম। "রবিনাশ বাবু নয়, অবিনাশ বাবু। মনে থাকল?" "জী হুজুর।"

একটু বেলা করে ঘুম ভাঙল। বাবা না জানি কী মনে করছেন। লাফ দিয়ে উঠে দেখি—কোথায় বাবা?

চাপরাশী একটা সেলাম ঠুকে এক গাল হেসে বললে, "হুজুর এসেছেন।"

দেখতে না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় তিনি?"

"ঐ যে, ঐ গাছতলায় বিড়ি খাচ্ছেন।"

কী! আমার সাত্ত্বিক নিরামিষাশী বাবা বুড়ো বয়সে বিড়ি খাচ্ছেন! দেখলুম কে একটি ছোকরা গাছের দিকে মুখ করে লুকিয়ে বিড়ি টানছে।

"হতভাগা! কী নাম ধরে ডেকেছিলি? ওর কী আমার বাবার বয়স?"

"হুজুর, রবিবাবু রবিবাবু বলে কত ডাকলুম। কেউ সাড়া না দিলে আমি কী করব? ইনি সুধালেন বোস সাহেবের কুঠি জানো, সর্দার? আমি ঠাওরালেম ইনি হুজুরের—"

"চোপ রও, শূয়ার।"

চাপরাশী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দুই হাত জুড়ল।

গাছতলার ছোকরাটি সাহেবী গলা শুনে চমকে উঠে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। চুরি করে দেখলে সাহেব স্বয়ং। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললে, "গুড্ মর্ণিং, সার। চিনতে পারছেন?"

গালে ও গলায় মাংস নেই, মাথায় প্রচণ্ড টেরি, সিঁথির গোড়াতে এক মণ্ডল। কাঁচা বাঁশের মতো লম্বা লকলকে গড়ন। মাজা দুর্বল। আমি যতক্ষণ ভাবতে থাকলুম, কে এ, সে ততক্ষণ ময়লা দাঁত বের করে হাসতে চেষ্টা করলে, কিন্তু ভরসা পেলে না।

"আরে এ যে বৃন্দাবন।" আমি সোল্লাসে বললুম, "বৃন্দাবন না?"

"মনে আছে দেখছি।"

"বৃন্দাবন, বিন্দে, তুই হঠাৎ কোত্থেকে এলি? আয়, আয়।"

বৃন্দাবন আমাকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলবে কি না ঠিক করতে না পেরে ঘুরিয়ে বললে, "এই বাংলোতে থাকা হয়?"

"হ্যাঁ! এটা আবার একটা বাংলো! দেখছিস তো এতে না আছে লাইট না আছে ফ্যান। তুই হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে, বৃন্দাবন। আগে কিছু খেয়ে তারপর অন্য কথা।"

বৃন্দাবন। বিন্দে। আমার আশৈশব বন্ধু। থার্ড ক্লাস থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় চলে গেল। পরে শুনলুম সে রেলের কনট্রাক্টর হয়ে দিব্যি রোজগার করছে। আমি পড়ি কলেজে, হাতে একটা পয়সা থাকে না, বৃত্তি যা পাই তাতে পেট ভরে খাওয়াই হয় না। আর বৃন্দাবন দু'হাতে টাকা ছড়াচ্ছে। বড়, মেজ, সেজ ও ছোট সাহেবদের ঘুষই খাওয়াচ্ছে কত!

তারপর চাকা ঘুরেছে। এই সেই বৃন্দাবন ও এই সেই ললিত।

রাত্রের তুলে রাখা সন্দেশ রসগোল্লা সহযোগে ছোটা হাজরি খেয়ে বৃন্দাবন যেন বাল্যকালে ফিরে গেল। কখন এক সময় 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ও 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' ধরলে। বললে, "বেড়ে আছিস তুই ললতে। তোদেরই, ভাই, সার্থক জীবন। মাইনে পাস আড়াই শো—"

"আড়াই শো তো নেটিভদের মাইনে। আমার মাইনে হলো সাড়ে তিন শো।"

"সা—ড়ে—তি—ন—শো টাকা! শুরুতেই এই। উঠতে উঠতে কত উঁচুতে উঠবি কে জানে। তারপরে পাবি পেন্‌সন। নিশ্চয়ই কিছু উপরি পাওনাও আছে।" এই বলে সে এক চোখ বুঁজে জিভ কাটলে।

আমি চুপ করে থাকলুম।

সে বক্ বক্ করতে করতে প্রশ্রয় পেয়ে বলে বসল, "বিয়ে করিসনি, তা

তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন বল দেখি। বিলেত থেকে একটি আনতে পারলিনে ?"

আমি ওর চেয়ে ভদ্র ভাষার প্রশ্ন আশা করিনি। রেলের কন্‌ট্রাক্টর আর কত ভদ্র হবে! হাসির রেখা টেনে বললুম, "বিলিতী মেমসাহেব তোকে এমন করে অভ্যর্থনা করতেন বলে তোর বিশ্বাস হয় ?"

বৃন্দাবন ভড়কে গেল। বললে, "দেখিস ভাই, কক্ষণো মেম বিয়ে করিসনে, যদি আত্মীয় বন্ধুর প্রতি তোর বিন্দুমাত্র মমতা থাকে। (লক্ষ করে) সিগার ? কী নাম ? 'Corona' ? দেখব একটা মুখে দিয়ে ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

বৃন্দাবন কাশতে কাশতে বললে, "আমরা অবশ্য বিলেত-ফেরৎ নই। তবু খাস বিলিতী না হোক, এদেশী—যাকে বলে ফিরিঙ্গী—মেম আমরাও··· (খক্ খক্) ···আমরাও···। আচ্ছা, তুই ওদেশে লব্ করেছিস ?"

আমি রঙ্গ করে বললুম, "বিয়ে করতে বারণ করলি, বিয়ে না করলে love করি কেমন করে ? বিয়ের পরেই না love ?"

"না রে," বৃন্দাবন সিগার খেতে গিয়ে কাশতে কাশতে কাবু হয়ে বললে, "অমন লবের কথা বলিনি। ও তো স্বর্গীয় প্রেম। হিন্দু সতী ছাড়া কার কাছে ও প্রেম পাবি ? একটি ভালো দেখে বিয়ে কর। দেরি করছিস কেন ? বলিস তো আমি পাত্রীর খোঁজ করি।"

"না," আমি তার আন্তরিকতা লক্ষ করে গম্ভীর মুখে তামাশা করলুম। "ও সব পাত্রীটাত্রী আমার পোষাবে না। বিয়ে করলেই ধাত্রীর দরকার হবে। ছেলে এলেই রূপ যৌবন যাবে।"

বৃন্দাবন সিগার সরিয়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে বললে, "তবে ?"

"তবে ?" আমি একটু ইতস্তত করে বললুম, "তখন সেই তো রক্ষিতা রাখতে হবে, এখন থেকে রাখলে দোষ কী ?"

সে কী মনে করে হেসে ফেললে। বললে, "যাঃ!"

"সত্যি।"

"যাঃ।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না ? কেন, এতে নূতনত্ব কী আছে ?"

"রামঃ রামঃ রামঃ। অবিনাশ কাকার ছেলে না তুই ? কমার্স পাস্ করেছিস না ?" সে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সগর্বে বললে, "লব্ আমরাও করেছি। তা সে খাস বিলিতী মেয়ের সঙ্গে না-ই হোক। বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন? কী করে হবে? আমরা তো বিলেতও যাইনি, পাস্ও করিনি। কিন্তু বলুক দেখি কেউ যে আমি পিতৃপিতামহের পিণ্ডদানের জন্যে, সনাতন হিন্দু কায়স্থের কুলরক্ষার জন্যে, কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্ধারের জন্যে, বিবাহ করতে পশ্চাৎপদ হয়েছি। আরে, একটা কেন, দশটা বিয়ে করব। আমি যে পুরুষ।" এই বলে সে তার শীর্ণ গুম্ফরেখায় আঙুল বুলিয়ে দিলে, পাক দিতেও চেষ্টা করলে।

সেই পুরুষোত্তমের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করি? বললুম, "এই যাঃ। তোর বিয়ে হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।"

"ভুলে যাবিই তো। আমরা তো অফিসার নই, আমরা কেরাণী।"

"কেন রে? তুই না আসানসোলে কন্ট্রাক্টরি করছিলি?"

"ঐ কন্ট্রাক্টরিই আমার কাল হলো। তুই বিশ্বাস করবিনে, ললিত, একটার সঙ্গে লব্ হলে এক পাল এসে ঘেরাও করে। সবাইকে উপহার দিতে দিতে দেনা দাঁড়িয়ে গেল কত! তারপর সেই বিশ্রী রোগ—"

আমি আঁৎকে উঠলুম। এই লোকের সঙ্গে এক টেবলে খাচ্ছি।

"সেই বিশ্রী রোগে একটি বছর ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গেলুম। দেখ না, কেমন হাড় ফুটে বেরোচ্ছে। কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে—"

আমি হাঁফ ছেড়ে বললুম, "সেরেছে তা হলে?"

"সারবে না আবার?" বৃন্দাবন একগাল হেসে বললে। অবশ্য তার গাল বলে কোনো পদার্থ ছিল না। "সারবে না তো হিন্দুধর্ম মিথ্যা। ভুজঙ্গেশ্বর শিবের নাম শুনেছিস?"

"না।"

"ওসব তোদের মতো সাহেব সুবোর না শোনবারই কথা। তবে বড় বড় ফিরিঙ্গী সাহেব টমি সাহেবও বাবা ভুজঙ্গেশ্বরের পায়ে মানৎ রেখে কৃপা পেয়েছে। যাক, সেই ভুজঙ্গেশ্বরের পায়ে হত্যা দিয়ে পড়লুম। 'তুই আমায় না বাঁচালে কে বাঁচাবে, বাবা? বাঁচিয়ে দে, বাবা, বাঁচিয়ে দে।' সাত দিনের দিন বাবা মুখ তুলে চাইলেন। স্বপ্ন দিলেন, 'যা তুই বিয়ে কর একটি লক্ষ্মী মেয়ে দেখে। নিজের স্ত্রীর সহবাসে আপনি সেরে যাবে'।"

আমি হাসব কি রাগ করব ঠিক্ করতে না পেরে চোখে জল এনে ফেলেছিলুম। কোন লক্ষ্মী মেয়ের জীবন ব্যর্থ করলে এ মূঢ়!

বৃন্দাবন দর্পভরে বললে, "হিন্দু ধর্মের কিবা মহিমা। বিয়ে করলুম বারো বছর বয়সের অনাঘ্রাত কুসুম। আর দেখতে না দেখতে রোগ গেল ছেড়ে। শ্রীবৎস রাজার শরীর থেকে যেন শনি বেরিয়ে গেল।"

"কিন্তু," আমি বললুম, "তোর শরীর থেকে গিয়ে তিনি তোর স্ত্রীর শরীর আশ্রয় করলেন কি না সংবাদ নিয়েছিস?"

বৃন্দাবন টেবল থেকে ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বললে, "সতী লক্ষ্মী এয়ো রাণী। তাঁর আয়ু ফুরিয়েছিল। তিনি স্বামীর পায়ে মাথা রেখে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করলেন।"

আমি ব্যঙ্গ করে বললুম, "তারপর তুই বোধ করি আরেকটি নবীন বস্ত্র সংগ্রহ করলি?"

"সংগ্রহ করতে হয় না রে। আপনি এসে পড়ে। ভদ্রলোকের বয়ঃস্থা মেয়ে। বিয়ে না দিলে জাত থাকে না। মা বললেন, উদ্ধার কর। আমিও দেখলুম যে বিয়ে না করলে আবার খারাপ হয়ে যাব।"

বাল্য সুহৃৎকে নিয়ে বেড়াতে বেরলুম। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল যে তার একটা নিষ্কাসনের উপায় না করলে হয়তো ঘরে বসে অপঘাতে মরতুম।

"দ্যাখ বৃন্দাবন," আমি ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা পাড়লুম। "দেখলি তো আমার বাবুর্চিকে। না দিশী না বিলিতী কোনো রান্না শুদ্ধভাবে জানে না। এদেশে যাকে সাহেবী খানা বলে আমি, ভাই, ও জিনিস বরদাস্ত করতে পারিনে। ওর চেয়ে পুরোপুরি দিশী খাবার ভালো।"

"তা হলে," বৃন্দাবন প্রস্তাব করলে, "একটি ঠাকুর রাখতে পারিস।"

"ঠাকুর? না, ঠাকুর নয়। একটি ঠাকুরাণী পেলে রাখি।"

বৃন্দাবন থমকে দাঁড়াল। "কী? কী পেলে রাখবি?"

"পাচিকা।"

"যাঃ!"

"কেন রে?"

"যাঃ। ঠাট্টা করছিস।"

"সত্যি বলছি। যার হাতে খেয়ে বেশ একটি সুমধুর পরিতৃপ্তি হবে, যে আমাকে অন্নের সঙ্গে অমৃত পরিবেশন করবে, সে নিশ্চয়ই মেসের বামুন নয়। উঃ, সে কী দুর্ভোগ!"

"তবু," বৃন্দাবন বললে, "যাঃ।"

আমি বললুম, "যাই বল, একটি সুন্দরী স্তনবীনা পাচিকা পেলে আমি বোখারা ও সমরকন্দ দিয়ে দিতে রাজি আছি। চাইকি একশো টাকা মাইনে।"

"এ-ক-শো টাকা! মাইরি?"

"কেন এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

"না! কিছুমাত্র নেই! যখন আমার নিজের মাইনে হচ্ছে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।"

আমি লজ্জিত হলুম। কিন্তু থার্ড ক্লাস অবধি যার দৌড় তার উপর মা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ আছে বলতে হবে।

বৃন্দাবন বললে, "শুধু পাচিকা হলে চলবে না, সুন্দরী ও স্ত—স্ত—"

"স্তনবীনা।"

"স্তনবীনা হওয়া চাই?"

"তা নইলে খাওয়ার মতো একটা মামুলি ব্যাপার এস্‌থেটিক্ আনন্দে ভরপুর হবে কেন?"

"বুঝেছি।"

আমি ভাবলুম বৃন্দাবন এস্‌থেটিক্ কথাটার মানে বুঝেছে। তা নয়।

"বুঝেছি তোর অভিসন্ধি।" বৃন্দাবন রহস্যের হাসি হাসল।

যাক্, কষ্ট করে বোঝাতে হলো না। বললুম, "আছে অমন কোনো মেয়ে তোর জানাশুনা?"

"নেই আবার!" বৃন্দাবন বললে, আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে।

"তবে," আমি ভারি অধৈর্য হয়ে বললুম, "তুই কলকাতা গিয়েই ওকে পাঠিয়ে দিস এখানে। খাওয়াদাওয়ার অকথ্য অসুবিধে হচ্ছে।"

"বুঝেছি।" সে দুষ্টু হাসি হাসল। বললে, "ভেবেছিলুম বিলেতের কমার্স পাস্ যখন তখন লোকটা সচ্চরিত্র।"

"কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লোকটা সুবিধাবাদী।"

আমরা একটা বাঁধা বটতলায় বিশ্রাম করলুম।

বৃন্দাবন আরম্ভ করলে, "একটি মেয়েকে জানি, নাম তার স্বর্ণ। যেমন নাম তেমনি রূপ। দেবী প্রতিমার মতো দ্যুতি। চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়।"

"কুমারী না বিধবা?"

"সধবা।"

আমি সত্যি সত্যি নিরাশ হলুম। বললুম, "তা হলে থাক।"

"শোন আগে সবটা। সধবা বটে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংসর্গ নেই। ঐ যাঃ, তোকে আবার ভয় পাইয়ে দিতে হচ্ছে। স্বামীর কুৎসিত রোগ।"

আমি বিবর্ণ মুখ বিকৃত করলুম। বৃন্দাবন ফূর্তি করে বললে, "সে বড় মজার। গেছল সে ঢাকায় না চাটগাঁয়। নিয়ে এলো হাতে পায়ে ফোস্কা। বললে, স্টীমারের বয়লারের ছোঁয়া লেগে অমন হয়েছে। সুবর্ণ বিশ্বাস করলে। তখন তার বয়স কতই বা—বোধ হয় বারো কি তেরো। এমন সেবা করল যে সেবা যাকে বলে। কিন্তু এত সেবা সত্ত্বেও বয়লারের ফোস্কা সারে না। ক্রমে ক্রমে সারা শরীর ফোস্কায় ছেয়ে যায়। হরিপদ কলকাতা শহরের ষোলোখানা বাড়ীর মালিক। চিকিৎসাটা যা করালে তা আমার মতো কণ্ট্রাক্টরের সাধ্যের বাইরে। কেউ ওকে ভুজঙ্গেশ্বরের পরামর্শ দেয়নি, তাই স্ত্রীকে ও সযত্নে দূরে রেখেছে। স্পর্শ করেনি। এমন মূর্খ।"

আমি মনে মনে বললুম, "ধন্য।"

"স্ত্রীর যখন ভোগের বয়স পূর্ণ হলো স্বামীকে অক্ষম দেখে তার ক্রমশ ঘেন্না ধরে গেল। সেবা তো বড় কম করেনি। এত সেবার পুরস্কার কী হলো? কতগুলো নাটক নভেল পড়ে এই হলো তার প্রশ্ন। সে একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হারিয়ে গেল।"

আমি বললুম, "নাটক নভেল পড়ার পরিণাম!"

"তা নয় তো কী!" বৃন্দাবন উত্তেজনার সহিত বললে, "ঘরে ঘরে মেয়েরা তবে বকছে কেন? আমি তো স্ত্রীর হাতে দেবার মতো বই একখানাও দেখলুম না। এমন কি স্ত্রীলোকের লেখা বইও না।"

"তুই এক কাজ কর।" আমি প্রস্তাব করলুম, "স্ত্রী নয় পুরুষ নয় এমন কোনো লোকের বই কিনে দে। ঘরের বৌ ঘরে থাকবে।"

বৃন্দাবন পরিহাসের মর্ম না বুঝে বললে, "সেই বেশ। তোর কাছ থেকে একটা লিস্টি লিখে নেব, ললিত। দেখিস তোর বৌদির প্রতি তোর একটা দায়িত্ব আছে।"

আমি মনে মনে একটা তালিকা বানিয়ে ফেললুম।

বললুম, "তারপর সুবর্ণর কী হলো বল।"

"কী আর হবে, কাশী থেকে ধরা হয়ে এল। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে

কত বোঝালেন, কত মিষ্টি কথা শোনালেন। তার সেই এক উত্তর। 'আমি ব্রহ্মচারিণী হতে পারব না। আপনারা কে কে ব্রহ্মচারী, শুনি?' তখন আমরা সবাই লজ্জায় যে যার বাড়িতে সরে পড়লুম।"

"আর সুবর্ণ?"

"সুবর্ণকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার মামাবাড়ী। তার বাপ নেই। মা থাকেন ঐখানে। কিন্তু নাটক নভেল কি সোজা জিনিস! মামাতো ভাই-বোনে প্রেম যদি না হলো তবে আর প্রগতি কী হলো! টের পেয়ে মাসীমা সুবর্ণকে তার স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হরিপদর জীবনে ধিক্কার এসেছে। আমি তাকে ভুজঙ্গেশ্বরের ঠিকানা দিয়েছি। স্বপ্নও সে দেখে এসেছে অবিকল আমারই মতো। এদিকে সুবর্ণ সিনেমা দেখে ক্ষেপেছে। স্বামীর ভালো কথা তার মন্দ লাগে। সে বলে, 'না। ভোগ চাই বলে রোগ চাইনে।' শুনলি তো?"

আমি একটু আগে স্বামীকে ধন্য বলেছিলুম। এখন স্ত্রীকে বললুম— "ধন্য।"

"ধন্য? ধন্য বলবি তুই ওই অবাধ্য অসতী স্ত্রীকে?"

"যাক, তুই তো এখন ওর গল্পটা শেষ কর।"

"শেষ?" বৃন্দাবন উৎফুল্ল হয়ে বললে, "হরিপদর আমরা হৈ হৈ করে আরেকটা বিয়ে দিলুম। এই তো সেদিন। এখনো ঢেকুর উঠছে সেদিনকার সেই ভুরি ভোজনের। খাওয়াতে জানে বটে হরিপদরা।"

"কিন্তু সুবর্ণর কী হলো?"

বৃন্দাবন বিরক্তির সুরে বললে, "কী হতে পারে শুনি? হিন্দুর মেয়ের স্বামী ছাড়া গতি আছে? দু'দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।"

আমি ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "সব ঠিক হয়ে যায়নি তাহলে?"

"না। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে অনর্থ বাধায়। 'বৃন্দাবনবাবু, আপনি আমার একটা উপায় করুন। নইলে বেশ্যা হয়ে যাব'।"

"বেশ তো। তুই একটা উপায় করিসনে কেন?"

বৃন্দাবন দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, "একে ব্রাহ্মণ, তায় পরস্ত্রী।"

ফেরবার পথে আমি বললুম, "বৃন্দাবন, আমাকে সত্য করে বল দেখি সুবর্ণর ও রোগ নেই?"

"যত দূর জানি, নেই।"

"কিন্তু আমি চাই ঠিক জানতে।"

"ঠিক জানিনে।"

"তা হলে ওকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। পারবি এ ভার নিতে?"

"কে? আমি?" বৃন্দাবনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

"হ্যাঁ রে, তুই। আমি তো কলকাতা যাচ্ছিনে। যাচ্ছিস তুই।"

"বা রে।"

"বা রে নয়। পারবি কি না বল।"

"রোস, ভেবে দেখি।

"ভাববার কিছু নেই। সুবর্ণর স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে কি দেয়নি?"

"ছেড়ে দেবারই সামিল।"

"কত ওর বয়স? সাবালিকা?"

"উনিশ কুড়ি।"

"তবে আর কী? ওকে বলিস আবার হারিয়ে যেতে।"

বৃন্দাবন বললে, "সত্যি বলতে কি, হরিপদও তাই চায়। কেলেঙ্কারির আর বাকী আছে কী? বেশ্যা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। কলকাতা শহরে হরিপদ বেচারার মুখ দেখানোর জো থাকবে না। ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কেউ কেউ যাতায়াত করবে।"

"প্রতিবেশীদের মধ্যেও?"

"প্রতিবেশীদের মধ্যেও।"

"বলিস কি? ঐ সব ব্রহ্মচর্যওয়ালাদের মধ্যেও?"

"কেন নয়? পুরুষের আবার সতীত্ব!"

আমি প্রায় ক্ষেপে গেছলুম। বললুম, "সবাই তা হলে শকুনের মতো চেয়ে বসে আছে কবে ও মেয়ে মরবে?"

বৃন্দাবন শিউরে উঠে বললে, "ষাট, ষাট! এত রূপ, এমন যৌবন,— মরবে!"

"বেশ্যা হয়ে যাওয়াকে আমি মনুষ্যত্বের মরণ বলি।"

"ও সব," বৃন্দাবন প্রত্যয়ের সহিত বললে, "ভগবানের হাত। বেশ্যা না থাকলে পাপী থাকত না। আর পাপী না থাকলে ভগবান কাকে তরাতেন?"

এই যার যুক্তি তার সঙ্গে তর্ক বৃথা। আমি চুপ করে ভাবতে থাকলুম সুবর্ণর সমস্যা। ও যদি বেশ্যা হয়ে যায় তবে ঠিক যে রোগটাকে এড়াতে চায় সেই রোগে মরবে। অথচ পূর্ণ বয়সে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাও যে প্রকারান্তরে নপুংসকত্ব, ক্লীবত্ব। সেও বেশ্যাবৃত্তির মতো অবমানুষিক।

কী যে সেন্টিমেন্টাল বোধ করলুম। মনে হলো, পুরুষ হয়ে জন্মেছি কেন? যদি না নারীকে রক্ষা করতে পারলুম। সমাজে যাকে নীতি বলে তার উপরেও একটি নীতি আছে। সে নীতি বীরের। সে নীতি যারা মানে তারাই একদিন হয় সমাজের নমস্য।

পরিহাসের পরিণাম এই দাঁড়াল যে বৃন্দাবনকে আমি একটু চাপ দিয়ে বললুম, "তুই ওকে এইখানে পাঠিয়ে দে, আমিই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেব।"

বৃন্দাবন চলতে চলতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, "যে জন্যে তোর কাছে আসা সেটা এবার খুলে বলি। আমার বড় সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে আমাকে সুপারিশ করতে হবে। দেড়শো টাকার একটা vacancy হয়েছে বলেই দেড়শো মাইল ছুটে আসা।"

"কিন্তু," আমি আপত্তি করলুম, "তোর বড় সাহেবকে আমি চিনিনে। তিনি কি আমাকে চেনেন?"

"হয়েছে, হয়েছে," বৃন্দাবন আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "তোকে চিনতে না পারুক তোর ব্যাঙ্কের চাকরিকে চিনবে। আজকেই—বুঝলি? দুপুরের গাড়িতেই ফিরব।"

বৃন্দাবনের চলে যাওয়ার মাসখানেক পরের কথা। ভুলেই গেছলুম কী তাকে বলেছিলুম। সামাদের হাতে দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, সুখে আছি। বাবা এসে বিয়ের জন্যে সাধাসাধি করে গেছেন। রাজি হইনি। আমি ইকনমিকসের ছাত্র, আমি কি এই আয়ে বিবাহ করি? বিবাহ মানে যদি বার্থ কণ্ট্রোল হতো তবে সে ছিল উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের শ্রীমতীরা যে মাতৃত্ব থেকে আলাদা করে পত্নীত্ব পছন্দ করেন না।

এমন সময় একদিন রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে বসবার ঘরে ঢুকতে যাবার মুখে থ' হয়ে দাঁড়ালুম।

কে ঐ নারী!

ব্যাচলারের বাড়িতে নারী যেন বিধবার হাঁড়িতে মাছ। লোকে কী বলবে! আমি যে একজন রেসপেকটেবল জেন্টলম্যান। ক্লাবের মেম্বার!

মা ধরণী দ্বিধা হলেন না। আমার গা দিয়ে ঘাম যেতে লাগল। আমি দাঁড়াব কি পালাব এই বিষয়ে পদদ্বয়ের ভিতর মতদ্বৈধ লক্ষিত হলো। ওদিকে আমার চোখ গেল আটকে।

কী রূপ! পেট্রোমাক্স বাতির আলোয় সে একটি টিপায়ের উপর ঝুঁকে একখানি বিলিতী কাগজের ছবি দেখছে—নিবিষ্টভাবে। কঠিন সংযম তার তনুকে বেঁধে রেখেছে। নইলে তা হয়তো দিকে দিকে ছড়িয়ে যেত, মিলিয়ে যেত। যেন একটি পূর্ণ প্রস্ফুট স্বর্ণগোলাপ।

কিন্তু কে সে। কেন আমার ঘরে?

আমি যে দাঁড়িয়ে রয়েছি এ সে অনুভবের দ্বারা বুঝল। আসন থেকে উঠে আমার দিকে চাইল। কিছু বললে না, কিন্তু আমাকে যেন ইশারায় জানালে, আসতে পারেন।

আমি আকৃষ্টের মতো ভিতরে গিয়ে একটু দূরে বসলুম। সেও বসল বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই করলে। আমাকে তার পছন্দ হলো কি না জানতে পারলুম না, জানতে ইচ্ছা করছিল। যেন আমি একটি বিবাহযোগ্যা বালিকা, আর সেই বিবাহোদ্যত পুরুষ।

আমার ভারি অস্বস্তি বোধ হলো। কিছু একটা বলা তো উচিত। কিন্তু স্বপ্নে কথা কইতে পারা যেমন যায় না এও তেমনি। বচন প্রবৃত্তি দুর্বার হলে স্বপ্নটি যাবে ভেঙে। আর এমন স্বপ্ন ভাঙুক এরূপ আগ্রহ আমার ছিল না।

আমি তার পরীক্ষমাণ দৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে নজরবন্দী হলুম আমার আপন গৃহে। বোধ হয় এমনি করে রাত কেটে যেত। কিন্তু আমার প্রভুভক্ত বেয়ারা তা হতে দেবে কেন? সে এসে প্রশ্ন করলে, "কোনো পানীয় এনে দিতে হবে?"

আমি চমকে উঠলুম। যেন ধরা পড়ে গেছি। বললুম, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমার জন্যে ছোটা পেগ্। আর···আপনি অবশ্য চা খাবেন?"

সে কঠিন ভাবে বললে, "চা করে খাওয়াতেই আমার আসা, চা খেতে নয়।"

আমার হঠাৎ খেয়াল হলো, এ কি সেই—?

মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলুম।

সে সপ্রতিভ ভাবে বললে, "আমিই স্বর্ণ।"

তখন আমি সে যে কী লজ্জায় পড়লুম তা কেউ অনুমান করতে পারবে না। সুবর্ণ নিশ্চয় জানে কী জন্যে আমি তাকে চাই। একটি পূর্ণ বয়স্কা ভদ্র নারী আমার সম্বন্ধে কী না জানি ভাবলে। তা জেনেও সে যে এসেছে—ছি ছি কেমন নির্লজ্জ সে!

আমি তার চোখে চোখ রাখতে শিউরে উঠছিলুম। ভদ্রতা করে বললুম, "না, না, তা কি হয়! আপনি কেন চা করবেন?"

তার ঘন পক্ষ্মের পর্দা সরিয়ে তার উজ্জ্বল তীব্র চাউনি আমার চোখের উপর টর্চের আলোর মতো পড়ল। সে বললে, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনো রোগ নেই।"

আমি বিষম অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, "আ-আ-মি তা-তা mean করিনি। কিছু ম-ম-নে করবেন না।" এই বলে এক হেঁচকি।

সে তখন বললে, "অনুমতি দেন তো আমিই চা করে আনি।"

আমি বললুম, "না, না, সুবর্ণ দেবী। আমার লোকজন থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন।"

সে ক্ষুণ্ণ হলো। বললে, "তবে আমি কোন অধিকারে এখানে থাকব?"

আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে কেমন করে লোকে অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করে। আমার পাপ মন বলে, ওটা ভণ্ডামি। অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির জন্যে প্রত্যেকের মনে যে ধিক্কার আছে সেই ধিক্কারটাকে মন্ত্র পড়ে শোধন করে নিলে নিজেকে ও অপরকে বঞ্চনা করতে আর বাধে না, তখন সে তো কামপ্রবৃত্তি নয়, সে ধর্মসাধন, বংশরক্ষা, কঠোর কর্তব্য ইত্যাদি। তখন অপরিচিতা মেয়ের গায়ে হাত দিতে অনুমতির দরকার হয় না, মন্ত্রটাই তো অনুমতি।

তবু একে যদি বিয়ে করবার উপায় থাকত আমি বিয়ে করতুম। ভণ্ডামি না করে, মনকে চোখ না ঠেরে এই দেবীপ্রতিমার মত নারীকে শয্যার অংশ দিতে আমার যে লজ্জা, যে পুলক, যে দুঃসাহস তা আমার মতো বাজে লোকের সাজে না, তা অর্জুনের মতো বীরের পক্ষেই শোভন।

না, আমি বীর নই, বৃন্দাবনের কাছে বীরপনা জাহির না করলে ভালো করতুম।

আমাকে নির্বাক দেখে সে বললে, "তা হলে এখানে আমার স্থান হবে না?"

এর উত্তর কী দেবার আছে? "না" বললেই ফুরিয়ে যায়। অথচ সে চলে যাক এ কি আমি মুখ ফুটে বলতে পারি? বিলেত থেকে এসে অবধি আমি স্ত্রী-জাতির সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলবার সুযোগ পাইনি, মামুলি আদব কায়দা বাঁচাতে বাঁচাতে জান খতম। আর এমনি এদেশে নারীদুর্ভিক্ষ যে বুড়ি মেম ও ভুঁড়িবিশিষ্ট ইঙ্গ-বঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে মিশতে পাইনে। এই মেয়েটি যখন দেড়শো মাইল দূর থেকে এসেছে তখন এর সঙ্গে দেড় ঘণ্টা আলাপ করব না?

"দেখুন," আমি আরম্ভ করলুম। কিন্তু অগ্রসর হতে পারলুম না।

সে অতিষ্ঠ বোধ করছিল বলে বোধ হলো। "দেখুন, আপনাকে বৃন্দাবন কী জানিয়েছে—"

"বৃন্দাবনবাবু এই জানিয়েছেন যে আপনার একটি পাচিকা চাই। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, মনে হয় মন্দ রাঁধিনে। তবে বিলিতী রান্নার কথা আলাদা।"

এইবার আমি একটা ছুতো পেলুম। বললুম, "ঐটেই তো আমার পক্ষে আসল। আমি—বুঝলেন কি না—একেবারে বিশুদ্ধ বিলেতফেরৎ। গোরু ছাড়া বড় কিছু খাইনে।"

সে অবিচলিত স্বরে বললে, "যদি কেউ শিখিয়ে দেয় তাই রেঁধে খাওয়াব।"

আমি ভড়কে গেলুম। বললুম, "তারপর—এই দেখুন—খানাই সব নয়, পিনাও আছে। ওসব বিষয়ে—বুঝলেন কিনা—আমি একেবারে সেকেলে বিলেতফেরৎ।"

সে বললে, "দেখিয়ে দিলে তাও পারব।"

এর উপর আমি আর কী বলতে পারি? তবু যত রকম ভয় দেখাতে পারি দেখালুম। বললুম, "ভীষণ বদরাগী মানুষ আমি। চাবুক নিয়ে যাকে কাছে পাই তাকে মারি। তা নইলে আমার আবার ঘুম হয় না।"

সে এতক্ষণ পরে একটু মুচ্‌কি হাসল। বললে, "বেশ। না হয় দু' দশ ঘা মারবেন।"

তখন আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললুম, "মাইনে—মাইনে কিন্তু আমি দিতে পারব না। পাচিকা চাই বলে পাচকটিকে যে ছাড়িয়ে দেব এমন কথা তো বলিনি। ওকে ওর মাইনে না দিলে ও কি আপনাকে বিলিতী রান্না শেখাবে? উপরন্তু আপনাকে যে মাইনে দেব—বুঝলেন

কি না—আমার মাইনে থেকে উদ্বৃত্ত থাকলে তো দেব? খানাপিনাতেই সব ফুঁকে দিই।"

"আচ্ছা, আমি বিনা বেতনেই চাকরি কবুল করছি।"

আমার ইচ্ছা করল বলি, স্বর্ণ, তোমাকে আমি মাথায় করে রাখব। আমার সর্বস্ব তোমার। কিন্তু আমার এমন লজ্জা করতে লাগল তার সঙ্গে থাকার কথা ভাবতে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে সর্বনাশ ঘটাইনি।

আমি চুপ করে থাকলুম অনেকক্ষণ।

সে উঠে এসে আমার পায়ে পড়ে বললে, "বিশ্বাস করুন। আমার ও রোগ নেই।" তার চোখ সজল। তাকে যে কী রমণীয় দেখাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করছিলুম, পা সরিয়ে নিতে ভুলে গেলুম। তাকে হাত ধরে তুলতেও আমার সাহস হচ্ছিল না।

হৃদয়কে শক্ত করে বললুম, "কিন্তু আপনি যে পরস্ত্রী।"

সে মাথা দুলিয়ে বললে, "না। আমি আপনারই স্ত্রী।" তার অশ্রু বাধা মানল না। বোধ হয় সারাদিন অনাহারে কেটেছে—ট্রেনে। সে আমার পদচুম্বন করলে।

এত কঠিনতার মধ্যেও এত কোমলতা ছিল। কিন্তু এ কী রোমান্স! আমি তো আর্টিস্ট্ নই, সঙ্গীতকলানিধি নই, আমি কাজের লোক, ব্যাঙ্কের চাকুরে। তাও বৃন্দাবন যত বড় মনে করেছিল তত বড়—অর্থাৎ এজেণ্ট—নই। আমি কি রোমান্সের যোগ্য?

সামাদ যখন চা নিয়ে এল সে তখন তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে আঁচল খসখসিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। সামাদটা যে কী মনে করলে! অতিরিক্ত গম্ভীর ভাবে চা রেখে দিয়ে দু' জনকেই সেলাম করলে। যেতে যেতে হাসাহাসি করলে বোধ হয় শুকদেওরাম বেয়ারার সঙ্গে—আড়চোখে। বেয়ারাও সজোরে জুতো পালিশ করছিল বারান্দায়।

আমি বললুম, "স্বর্ণ, তুমি বড় দুঃখিনী। কিন্তু তোমার দুঃখ দূর করা আমার অসাধ্য। দু' দিন পরে তুমি চাইবে মা হতে। আমি কেমন করে তার সমর্থন করি?"

সে বললে, "সে অনেক পরের কথা। আমি ও কথা ভাবিনি।"

আমি হেসে বললুম, "তুমি না ভাবলেও প্রকৃতি ভাববেন। তাঁর নিয়ম অমোঘ।"

সে তবু বললে, "যা হবার তা হবে। এতে ভাববার কী আছে? সংসারে কেউ কি মা হচ্ছে না?"

"কিন্তু সমাজ যে তোমার সন্তানকে অসম্মান করবে?"

"আপনি থাকতে?"

"আমিই বা এমন কী! আমার চেয়ে যাঁরা সব বিষয়ে বড় তাঁরাও অমন সন্তানের জনক হবার ভয়ে উর্ধ্বশ্বাস।"

সে বোধ হয় বিশ্বাস করলে না। এমন একটা সহজ বিষয়ে এত ভয় পাবার কী আছে? অন্য মনে কী চিন্তা করলে। চা খেলে না।

"চা খাও, চা খাও," আমি একটু পীড়াপীড়ির স্বরে বললুম। "তারপর আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"

সে জ্বলে উঠে বললে, "চা খেতে আমি আসিনি।" উঠে বললে, "আর ট্রেনে ওঠানামা করতেও আমি জানি।"

তার দু' বছর পরে আবার বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা। দু' চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলুম, "ভালো কথা, স্বর্ণর খবর কী?"

সে আশ্চর্য হয়ে বললে, "স্বর্ণ!" তারপর হেসে বললে, "ওঃ! তোর সেই পাচিকা স্বর্ণ?"

আমি অনুতাপের সঙ্গে লজ্জা মিশিয়ে বললুম, "হ্যাঁ।—আমার সেই উপযাচিকা স্বর্ণ।"

"ওর নাম তো এখন স্বর্ণ নয়। ওর নাম ফরজন্দ্ উন্নেসা। ওর স্বামী এক পেশাওয়ারী ফলওয়ালা, আব্দেল কাদের। ওর একটি ছেলে হয়েছে, জুলফিকার। বিবি এখন ঘোর পর্দানশীন।....ছি, ছি, শেষকালে মুসলমান হয়ে গেল!"

(১৯৩৩)

স্ত্রীর দিদি

নির্মলের স্ত্রী শেফালী রূপে গুণে লক্ষ্মী। শুকতারার মতো স্থিরোজ্জ্বল তার চক্ষু, শারদ প্রভাতের মতো স্বচ্ছ সুধৌত তার মুখ, তার দেহচ্ছন্দ শরতের নদীর মতো শান্ত।

এমন মেয়েকে দেখে কার না পছন্দ হয়? নির্মল তাকে এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে ফেললে। বিয়ের রাত্রে প্রথম দেখলে তার স্ত্রীর দিদি সোহিনীকে।

শেফালী যেমন শরৎঋতুর প্রতিমূর্তি, সোহিনী তেমনি বর্ষাঋতুর। আর চোখ দিয়ে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে। বিদ্যুৎ তার স্মিত হাস্যে। বিদ্যুৎ তার পরিহাসে, রসোক্তিতে। শ্যামা মেয়ে। সতেজ স্বাস্থ্য তাকে সুদর্শনা করেছে, নইলে রূপ তার বাস্তবিক নেই। চাঁপা খসখসে তার কণ্ঠস্বর, তবু কী যেন সম্মোহন আছে তাতে। বোধ হয় খোট্টার দেশে বিয়ে করার দরুণ স্নিগ্ধতা খুইয়েছে, কিন্তু কেমন শক্ত গাঁথুনি। গড়নে বজ্র, ধরনে বিদ্যুৎ। তার একটা না একটা অঙ্গ সমস্তক্ষণ কথা কইছে। যেন তাকে গড়বার সময় বিধাতা পারদের খাদ মিশিয়েছিলেন।

সোহিনী নির্মলের সঙ্গে আলাপ করে, অন্যদিকে হাসিমুখ ফিরিয়ে থেকে থেকে নির্মলের দিকে চেয়ে চাউনিতে কৌতুক বিচ্ছুরিত করে। যেন নির্মলের মনের ভিতরটা দেখতে পায়, যেন ওখানটাতে তামাশার কিছু আছে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা কইতে থাকে নির্মলেরই সঙ্গে, অন্যান্যদেরকে একেবারে বঞ্চিত না করে।

কালো মেয়ের ভালো বর জোটেনি। মধ্যবয়সী দোজবর, এলাহাবাদের নেটিব ডাক্তার। আর শেফালীর স্বামীভাগ্য তার গায়ের রঙের মতো ফরসা। নির্মল ঢাকার তরুণ লেকচারার। দেশের কাছে দশের কাছে তার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। তবু সোহিনী নির্মলকে গণনার মধ্যে আনে না। তার ছোট বোনের বর—সম্বন্ধে ছোট। মানুষটিও শিষ্ট সুশীল—ছাত্র সমাজের আদর্শ যদি না হলো তবে আর অধ্যাপক কিসের?

নির্মল গম্ভীরভাবে দন্ত বিকাশ করে। যেন উপস্থিত ভদ্রতনয়ারা তার ছাত্রী ও এই বাসর ঘর তার ক্লাস রুম। দুটি কানের উপর রকমারি অত্যাচার যেন একটা মায়া।

সোহিনী ওদের নিষেধ করে একটা হাত তুলে, মাথাটাকে ঈষৎ দুলিয়ে। বলে, "তোরা তো বেশ। মাস্টারের কাছে কোথায় কানগুলি গছিয়ে দিবি, না মাস্টারের কানদুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি। এবার জন্মাষ্টমীর মিছিলে তোদের সং বেরবে দেখিস।"

নির্মল ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখেছেন?"

সোহিনী অন্যদিকে চেয়ে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লে ও তার ঠিক পরে নির্মলের দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইলে যে নির্মলের দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি তড়িৎ ছুটে গেল।

স্ত্রীকে একা পেয়ে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার দিদি কতদূর পড়েছেন?"

"ফোর্থ ক্লাস অবধি"—শেফালী বললে কোনো মতে মুখ ফুটে। নব বধূত্বের শরমে সে অন্ধ হয়েছিল, কিন্তু মূক হয়নি, তা বোঝা গেল।

"ফোর্থ ক্লাস, মোটে ফোর্থ ক্লাস!"—প্রোফেসার বিস্ময়াবিষ্ট হলো।

স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শুয়ে সে ধ্যান করলে স্ত্রীর দিদিকে। ফোর্থ ক্লাস, তবু কী দীপ্তি, কী স্ফূর্তি, কী সপ্রতিভতা! শেফালী তো ম্যাট্রিক পাস। কিন্তু সোহিনীর কাছে লাগে না। শেফালী না হয়ে সোহিনী যদি আমার স্ত্রী হতো—নির্মল ভাবলে—তা হলে বিধাতার এমন কী ভুল হতো! বছর তিনেক আগে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে থাকলে শ্বশুর মশাই কি আমাকে না দিয়ে নগেন্দ্রবাবুকে ও মেয়ে দিতেন? তবে তিন বছর আগে আমার চাকরি হয়নি। আমি রিসার্চ স্কলার। বিবাহের প্রস্তাবে বদন বিকৃত করেছি। স্বামী না হয়ে স্বামীজী হবার দিকে ছিল আমার ঝোঁক। স্ত্রী জাতি না বলে মাতৃজাতি বলতুম। আনন্দ দাদাদের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতুম না। ওঁরাও আমাকে নিজেদের একজন বলে ধরে নিয়েছিলেন। In anticipation ডাকতেন নির্মলানন্দ বলে। হায়—নির্মল ভাবলে—সেই মোহে হারালুম ঐ দীপ্তি, ঐ স্ফূর্তি, ঐ সপ্রতিভতা। সেই তো বিয়ে করলুম, সংসারী হলুম, মাতৃজাতিকে সন্তান জোগানোর দায়িত্ব নিলুম, চাকরিটি পেয়েই ব্যস্ বদলে গেল মতটা, মায়ের অনুরোধের কাছে জারিজুরি খাটল না। তিন বছর আগে করলে স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ অন্যরকম হতো, এই মেয়ে আমার কান ধরে টান দিত, এত লজ্জা কোথায় থাকত!

স্ত্রীর সঙ্গে সে রাত্রে যত কথা হলো তার বারো আনা দিদি সংক্রান্ত। অবোধ শেফালী সন্দেহ করলে না—অদ্বৈতবাদী নির্মল অন্যায়টা কিছু দেখলে না।

বৌ নিয়ে নির্মল ঢাকায় ফিরল। মা যার পর নাই আহ্লাদিত হলেন। বোনেরা বৌদিকে ঘিরে রইল। বন্ধুরা বৌভাত খেয়ে শেফালীর স্বামীকে অভিনন্দন করে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাশি রাশি উপহার দিলেন।

নির্মল কিন্তু সোহিনীকে ভুলতে পারলে না।

শেফালীকে দেখলে সোহিনীর কথা মনে পড়ে। শেফালীতে সোহিনীর দীপ্তি কই? স্ফূর্তি কই? সপ্রতিভতা কই? শুধু সৌন্দর্য, শুধু শরম, শুধু স্নিগ্ধতা। এ সব তো জগতে দুর্লভ নয়, নির্মলের বাড়িতেই কিছু কিছু আছে। এর জন্যে অমন জমকালো স্বামীজীত্ব বিসর্জন দিয়ে একটা সুলভ স্বামী হবার সার্থকতা কোথায়?

স্ত্রীর দিকে চেয়ে নির্মল ভাবে, এ তো মাতৃজাতি। একে স্ত্রী বলে কল্পনা করতে সঙ্কোচ আসে।

নির্মল পড়ার ঘরে বিছানা পাতল। পাড়ার লোকে ওকথা শুনে বললে, "অমন স্ত্রীর স্বামী হয়ে এমন জিতেন্দ্রিয়! পুরুষ তো নয়, মহাপুরুষ!"

আনন্দ দাদারা বললেন, "কত গৃহী পরমহংসদেবের আরাধনা করে। তাঁর অনুসরণ করে ক'জন!"

মা'র মনে কাঁটা ফুটল। তিনি বৌমাকে নিয়ে ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে নাতির বিনিময়ে পাঁঠা মানত করে এলেন।

ওদিকে জিতেন্দ্রিয় ধ্যান করে—স্ফটিক স্বচ্ছ নয়নে পতঙ্গ চপল চাউনি, চোখে কপালে অধরে উচ্ছল নিঃশব্দ স্মিতহাস, দীঘল সবল গড়ন, ইস্পাতের মতো রং, চাপা খস্‌খসে কণ্ঠস্বর।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, "দিদি চিঠি লেখেননি?"

শেফালী বলে "তাকে দশখানা না লিখলে কি সে একখানা লিখবে?"

নির্মল ক্ষুণ্ণ হয়। জানে না যে চিঠিতে সোহিনীর অন্য মূর্তি। হিজিবিজি কী যে লেখে, নিজেই পড়তে পারে না। হয়তো লেখে—বহুদিন যাবৎ তোমাদের কুশল সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিত আছি। কুশলের বানান মুষলের মতো! সংবাদেও তালব্য শ।

অবোধ শেফালী সুবোধ হবার জন্যে আই-এর পড়া করছে। দেবর বিমল তার সহপাঠী। তার দিদিকে তার স্বামী কেন এতবার স্মরণ করেন তা যদি সে বুঝত তবে অত পড়াশুনার দরকার থাকত না।

নির্মল স্থির করে ফেললে—পূজার ছুটীতে এলাহাবাদ যেতেই হবে।

মা'কে বললে, "তুমি পুরী দেখতে চাও, বিমলের সঙ্গে যাও। শেফালীকে তার পিত্রালয়ে দিয়ে আমি একলা যাই পশ্চিমে। আমার সেই 'Military Strategy of the Mughals' বইখানা লিখতে হলে আগ্রা দিল্লী গোয়ালিয়র এলাহাবাদের দুর্গগুলো চাক্ষুষ করতে হয়।"

ডক্টর না হয়ে যে নির্মলের নিষ্কৃতি নেই, শুধু পি-আর-এস্ যে তার পক্ষে অশোভন, কে এ কথা না জানে? মা বললেন, "তাই হোক্।"

এলাহাবাদের নগেন্দ্রবাবু পৈত্রিক অট্টালিকা ভাড়া দিয়ে নেটিব ডাক্তারের উপযুক্ত পাড়ায় ছোটখাট বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যা দেখে রুগী ভরসা করে ভিড়বে। বাপ বড় ডাক্তার ছিলেন, বাপের নামডাকের প্রতিধ্বনিতেই তাঁর পসার। প্রথম পক্ষের তিনটি ছেলেমেয়ে, তিনি ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ এই কয়জনের সংসার। ভাড়ার টাকা ও রোগী দেখার টাকায় এক রকম চলে যায়। তবে সাবেক কালের চাল আর নেই, এই যা দুঃখ।

"বেশ, বেশ, তুমি এলে, দেখা হলো, খুশি হলুম," নগেন্দ্রবাবু বললেন। "আমাদের কি কোথাও যাবার যো আছে, ভায়া। ঐ ছাথ না, রাত না পোহাতেই পাঁচ পাঁচটা রুগী এসে ধন্না দিয়ে পড়েছে। নগিন্ ডাক্তার—নগিন্ ডাক্তার না ছাড়ালে ওদের বিমার ছাড়বে না। ক্যা ভইল্ রে রামখেলাওন, ক্যা ভইল্ রে বুধন্‌কী নানী?"

ভায়রা ভাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি ওদের একজনের বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে দিলেন, এক জনের মুখে হাত পুরে দাঁতগুলো নাড়লেন।

একটা চাকর এসে খবর দিলে, "মাইজী বোলাতেঁ হেঁ।"

নির্মল তার পিছু পিছু গেল। নমস্কার করতেই সোহিনী ফিস্ ফিস্ করে সুধালো, "ক'দিন থাকা হবে?" তার দু' হাত জোড়া। সে নির্মলের জন্যেই লুচি ভাজছিল।

"সেটা," নির্মল সুগম্ভীর স্বরে বললে, "এখানকার ফোর্ট-এর দ্রষ্টব্যতার উপর নির্ভর করছে।"

"কি-কিসের উপর ?" সোহিনী নির্মলের চোখের উপর কৌতুক দৃষ্টি স্থাপন করলে।

নির্মল দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, "এখানকার ফোর্ট এ দেখবার জিনিস বেশী থাকলে বেশী দিন, কম থাকলে কম দিন।"

"তবু," সোহিনী পুনরায় প্রশ্ন করলে, "কম করে হলেও ক'দিন জানতে পাই ?"

"নিশ্চয়।" নির্মল বিব্রত হয়ে বললে, "ধরুন তিন দিন।"

"উহুঁ," সোহিনী বিদ্যুদ্বর্ষণ করে বললে, "অত কম কিছুতেই হতে পারে না।"

নির্মল তো তাই চায়। গম্ভীর ভাবে মুচকি হাসল। তার পরে চুপ করে সোহিনীর সুগঠিত হাত দুটির নিপুণ ব্যস্ততা, তার চুড়ির নিরন্তর ওঠা নামা সপ্রশংসভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকল। যেন সামান্য লুচি ভাজা নয়, নুরজাহানের মতো সাম্রাজ্য পরিচালনা চলেছে ঐ দু'খানি সুবলিত করে। পারে এমন লীলার সহিত কাজ করতে শেফালী ? হুঁ, হুঁ! খালি পড়া আর পড়া!

"ওকে আনলে না কেন ?"

"কাকে ?"

"ছবিকে—শেফালীকে।"

"ওঃ! ওর মা বাবা আসতে দিলেন না।"

"বিরহ সইতে পারছ ?" সোহিনী লুচিগুলি দুটি থালায় সাজাতে সাজাতে অপাঙ্গে চাইল।

নির্মল ভয়ে ভয়ে বললে, "ঐতিহাসিককে আরো কত কী সইতে হয়।"

"ঐতি—ঐতিহাসিক কী ?"

"যে ইতিহাস লেখে।"

সোহিনী মাথা দুলিয়ে বললে, "তাই বলো। আকবরের ছেলে বাবর না বাবরের ছেলে আকবর এই তোমরা খুঁজে বের করো। না ?"

নির্মল হাসি চেপে বললে, "রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী—"

"আচ্ছা, আমাদেরও তো ইতিহাস লেখা হবে হাজার বছর পরে ? হবে না!"

"হবে বই কি।"

"এই ভিটে খুঁড়ে আজকের থালা বাটির খোঁজ এক দিন পাওয়া যাবে। না ?"

"যাবে বই কি।"

"তখনকার দিনের ঐতিহাসিকের জন্তে খানকয়েক লুচি তুলে রাখতে হয়। না, মাস্টার মশাই ?"

নির্মল ভাবলে প্রোফেসার ও মাস্টারের মধ্যে তফাৎ এ জানে না, সিবিল সার্জন ও নেটিব ডাক্তার দু-ই এর কাছে ডাক্তার। বললে, "আমি মাস্টার নই, প্রোফেসার।"

সোহিনী ভ্রূভঙ্গি করলে। "প্রোফেসার তা হলে মাস্টার নয় ? পড়ায় না ছেলেদের ?"

নির্মল ভাবলে, যাক্ গে। জ্ঞানের চেয়ে ঐ ভঙ্গিটুকু মহার্ঘ।

লুচি চিবোতে চিবোতে নগেন্দ্রভূষণ বললেন, "গোরাকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্ছি, ভায়া। গোয়ালিয়রের গাইকবাড়, ইন্দোরের সিন্ধিয়া এঁদের কীর্তি-কলাপের আমি কী জানি ?"

নির্মল মুখ টিপে বললে, "সে হবে এখন। আমি ওকে ইতিহাসে পাকা না করে দিয়ে নড়ছিনে।"

গোরা, কালা ও টুনী এই তিন ছাত্রছাত্রীকে পাকা করে তোলবার ভার নিয়ে নির্মল স্থায়িত্ব লাভ করলে। দুপুরের দিকে একবার দুর্গে যায়, খাতার পাতায় নক্শা এঁকে আনে। মহাগ্রন্থের খসড়া তৈরি করে। আর খুব লুচি হালুয়া ধ্বংস করে।

উপরন্তু চা।

"মাস্টার—না, না, প্রোফেসার মশাই," সোহিনী চা দিয়ে যাবার সময় বলে, "এই নাও তোমার চা।"

"নগেনদা খেয়েছেন ?"

"উনি তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন।"

চায়ে চুমুক দিয়ে নির্মল বলে, "ও: !"

"চা খুব ভালবাসো, না ?"

"খু-উ-ব। যদি তেমন হাতের হয়।" নির্মল ক্রমে সাহসী হয়েছিল। মেয়েদের কাছে মুখচোরা বলে আর দুর্নাম দেওয়া চলে না।

সোহিনী তার দিকে অবাক হয়ে তাকালে। তার সব সময় স্থির চপলার হাসি। বললে, "কেমন হাতের ?"

নির্মল খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বললে, "এমন হাতের।"

সোহিনীরই গায়ে জোর বেশী। সে হাতটা ছাড়িয়ে না নিয়ে সেই হাতে নির্মলের গালে একটি ছোট ঠোনা মেরে বললে, "এ খাদ্য কেমন লাগল?"

"খু-উ-ব ভালো।"

আর একটি ঠোনা আর একটু জোরে।—"এবার কেমন লাগল?"

"আরো ভালো।"

আর একটি ঠোনা আর একটু জোরে।—"এবার কেমন লাগল?"

"আরো ভালো।"

ক্ষিপ্রতার সহিত প্রোফেসারের কানটাতে পাক দিয়ে সোহিনী শুধালো, "এটা কেমন?"

"উপাদেয়।"

দিন দুই পরে।

সোহিনী বললে, "এখানকার দুর্গ দেখা শেষ হয়ে গেছে বুঝি?"

নির্মল বললে, "না।"

"তবে যে আর যাও না দেখতে?"

"যতটা দেখেছি ততটার বিবরণ গুছিয়ে লিখি আগে। তারপর যাব আবার।"

"কই, লিখতেও তো তোমার তাড়া নেই।"

নির্মল বুঝলে এর তাৎপর্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোহিনীর ঠোনা ও কানমলা খাওয়া। নগেন্দ্র একটা দবাখানা খুলেছেন, সেইখানে সারা দুপুর আড্ডা দেন, সেইখান থেকে কল্‌-এ যান। ছেলে দুটো স্কুলে, মেয়েটি পাড়ার বড় বাড়িতে।

"হ্যাঁ, এইবার লিখব। অনেক চিন্তা করতে হয়, তোমরা তো বোঝো না।"

"চিন্তা করার ঢং বুঝি এই?"

"আহা, মস্তিষ্ক যে সর্বক্ষণ ক্রিয়া করছে, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ, সোহিনী?"

"দিদি বললে না যে?" সোহিনী কটাক্ষপাত করলে।

"কেন দিদি বলব?" নির্মল নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে, "সত্যিকারের দিদি তো নও, সম্পর্কে দিদি।"

"সম্পর্ক বুঝি কিছুই নয় ?"

"সম্পর্কটা অন্ত রকম হতে পারত।"

এ কথায় সোহিনী আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলে।

নির্মল ঠাওরাল সে চোখের জল চাপা দিচ্ছে। আহা, কী অসুখী এই মেয়েটি! দোজবরে পড়েছে। ও ছাড়া আর কী হতে পারে!

নির্মল উঠে দাঁড়াল। সোহিনীর কাঁধে একটি হাত রেখে আর একটি হাতে ওর চোখ থেকে আঁচল সরালে। ও হরি! কই তার চোখে জল ?

সোহিনী চুপি চুপি হাসছিল, খিল খিল করে হেসে উঠল। হতভম্ব নির্মলকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। বললে, "আমাকে একজনদের বাড়ি যেতে হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না, প্রোফেসার। বাসা পাহারা দিও।"

নির্মল পরদিন ফোর্টে গেল। মন দিয়ে লিখলেও কিছু। স্ত্রীকে কুশল সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছিল, তার উত্তর পেয়ে প্রত্যুত্তরে লিখলে খুব খাটতে হচ্ছে। একটা নক্শা পাঠিয়ে দিলে নমুনা হিসাবে।

তারপর যথাপূর্বং।

বললে, "কাল রাত্রে নগেনদা তোমাকে এত বকছিলেন কী নিয়ে ?"

"তুমি জানলে কী করে ?"

"বা, আমার বুঝি কান নেই ?"

"কিন্তু তখন তো তুমি ঘুমিয়ে!"

"আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শুনতে পাই।"

সোহিনী গ্রীবাটি বেঁকিয়ে বললে, "তুমি অবাক করলে। যারা ম্যাজিক করে তারাও তো প্রোফেসার। তুমি বুঝি তাদের একজন ?"

সোহিনী স্বীকার করলে না যে তার স্বামী তাকে বকছিলেন। "ও কিছু না। ওঁর মিষ্টি কথার ছাঁদই ঐ। বকুনির মতো শোনায়।"

নির্মল হেসে উড়িয়ে দিলে।

"হাসছ কী, মশাই। স্বামী কি স্ত্রীকে বকতে পারেন ?"

নির্মল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর সোহিনীর হাত ধরে উঠে বসল। সহসা সোহিনীকে টান দিয়ে নিজের পাশে বসাল। বললে, "সত্যি বলো। ওঁকে তুমি ভালবাসো ?"

এই প্রথম সোহিনীকে গম্ভীর হতে দেখা গেল।

"বলো, বলো, সোহিনী। ওঁকে তুমি ভালবাসো ?"

সোহিনী ঝাঁঝের সহিত বললে, "কেন, ওঁর অপরাধ কী ? উনি প্রোফেসার নন। এই ?"

"দূর! তা কেন হবে ? উনি তোমার যোগ্য ?"

"আমিই কি ওঁর যোগ্য ?"

নির্মল আবেগের সঙ্গে বললে, "সোহিনী, তুমি কি জানো তুমি বিদুষী রূপসী কল্যাণীদের চেয়ে শ্রেয় ? সোহিনী, আমার একমাত্র দুঃখ কেন আমি তিন বছর আগে তোমাকে দেখিনি। দেখলেই বিয়ে করতুম নিশ্চিত।"

সোহিনী আবার স্বাভাবিক হেসে ভ্রূ-বাণ হেনে বললে, "কিন্তু আমি যদি ও বিয়েতে অমত করতুম ?"

"কেন অমত করতে ?"

"কেন করতুম না ? প্রোফেসার বুঝি পুরুষ ?"

"কী ?"

"যাও, বলব না।"

"প্রোফেসার বুঝি কী ?"

"জিরাফ।"

নির্মল মিনতি করলে। তখন সোহিনী পুনরুক্তি করলে, "প্রোফেসার বুঝি পুরুষ ?"

এ কথা শুনে নির্মল সোহিনীকে একেবারে বুকের কাছে টেনে আনলে। সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। শুধু ফিস ফিসিয়ে বললে, "ছাড়ো, ছাড়ো! ছি, ছি!"

নির্মল বললে, "আর বলবে ও রকম কথা ?"

"কী রকম কথা ?"

"ঐ যে—প্রোফেসার নয় পুরুষ ?"

"পুরুষ নাকি ?"

নির্মল এর যা উত্তর দিলে তা ভয়ানক।

আরো দিন চার পরে সোহিনী বললে, "লক্ষ্মীটি, এই বেলা যাও।"

নির্মল বললে, "যাব, কিন্তু তোমাকেও আসতে হবে।"

সোহিনী ঘাড় নাড়ল, "বোনের বাড়িতে তুমি বোনের, আমার নও।"

"পাগল ? আমি কি আর ওর পুরুষ হতে পারি ?"

"না, না। ওকে অসুখী করতেও যে পারবে না তুমি ?"

"কিন্তু তোমাকে অসুখী করতেও যে পারব না, রানি।"

"একজনকে অসুখী করতেই হবে।"

"তা যদি হয় তবে তোমাকে নয়।"

সোহিনীর স্বভাব যেন বদলে গেছল। স্বতঃস্ফূর্ত স্মিত হাসির স্থান নিয়েছিল করুণ গভীর আভা। সে বললে, "আমাকে অসুখী করলে ও অসুখী হবে না, কিন্তু ওকে অসুখী করলে আমিও অসুখী হব।"

"না, সোহিনী, তোমাকে অসুখী করব না।" নির্মল বার বার এই কথা বললে। আর ছেলেমানুষের মতো সোহিনীর বুকে মুখ গুঁজল। শিশুর মতো আধো আধো স্বরে বললে, "না-আ, ছোহিনী, তোমাকে অছুখী করব না-আ।"

সোহিনী খিল খিল করে হেসে উঠল—"যাও! খোকা প্রাফেসার!"

এর উত্তরে সেই ভয়ানক কাণ্ড।

এমন সময় এসে পড়ল নগেন্দ্রভূষণের কন্যা টুনী। বয়স ছয় সাত বছর হবে। তাকে দেখে সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলে। তখনো তার মুখে কৌতুকের হাসি। সে কি কাউকে ডরায় ?

নির্মল তো মুখটাকে অসম্ভব লম্বা করে টুনীর ভয়ে টুনীর পুতুলের মতো ঠায় বসে রইল।

"মেসোমশাই," টুনী জিজ্ঞাসা করলে, "মাকে কামড়াচ্ছিলে কেন ? তুমি কি কুকুর ?"

মেসোমশায়ের মুখ কতকটা কুকুরেরই মতো লম্বা দেখাচ্ছিল বটে। তিনি কী যেন জবাব দিতে চেষ্টা করলেন। একটা অস্ফুট ধ্বনি তাঁর কণ্ঠমূলে আটকে গেল।

"বল না মেসোমশাই," টুনী আব্দার ধরলে, "কেন কামড়াচ্ছিলে মা'কে ?"

মা ওঘর থেকে ডাকলেন, "টুনী।" টুনী ছুটে গেল। মা তাকে একটা পয়সা ঘুষ দিলেন। "যা কুল কিনে খা।"

তখনকার মতো টুনীর মুখ বন্ধ হলো, কিন্তু রাত্রে বাবার সামনে খুলল। "জানো বাবা—"

সোহিনী তাকে চোখের ইশারায় নিষেধ করলে।

"জানো বাবা, মেসো মশাই—"

সোহিনী চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণ করলে। নির্মলের তো তখন যায়-যায় অবস্থা। তার মুখ মরার মতো শাদা হয়ে আসছিল।

নানা কারণে সেদিন নগেন্দ্রবাবু খিট্‌খিট্ করছিলেন। তিনি ভেঙিয়ে বললেন, "জানো বাবা! কী জানো বাবা!"

টুনীর অমনি অভিমান হলো। আর দাদারা হো হো করে হেসে উঠল। "জানো বাবা! কী জানো বাবা!" "এই টুনী!"

"যাও, বলব না।" এই বলে টুনী হন্ হন্ করে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে থাকল।

পরদিন টুনী ঠিক সেই সময়টিতে পাড়া বেড়িয়ে ফিরল। উঁকি মেরে দেখলে, ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। ঘরে ঢুকতেই নির্মল "আঃ উঃ" করে উঠল। ভারি মাথা ধরেছে তার।

টুনী ডাকলে, "মেসোমশাই।"

মেসোমশাই সাড়া দিলেন, "আঃ! উঃ! টুনু রে। মারা গেলুম রে!"

টুনী বললে, "বাবাকে খবর দিই? ওষুধ নিয়ে আসি?"

নির্মল কাতরাতে থাকল, "অঃ! আঃ! ইঃ! ঈঃ! উঃ! উঃ!"

সোহিনী সকৌতুকে নির্মলের মাথা টিপে দিতে দিতে বললে, "ওষুধ আমার কাছে আছে। তোকে যেতে হবে না।"

টুনীও মেসোর পা টিপতে বসল। কিছুতেই ও ঘর থেকে সরল না। অগত্যা নির্মলের অসুখ সারল।

রাত্রে বাবাকে টুনী বললে, "মেসোমশাই আজ খুব কষ্ট পেলে। এমন মাথাব্যথা। হবে না? মানুষকে কামড়ালে মাথাব্যথা করবে না?"

মানুষকে কামড়ানোর সঙ্গে মাথাব্যথার সম্বন্ধ শুনে নগেন্দ্রভূষণের ডাক্তারী কৌতূহল উজ্জীবিত হলো। অমন একটা কার্যকারণ জেনে রাখা ডাক্তার মাত্রেরই কর্তব্য। এবার যখন কোন রুগী এসে বলবে, "মাথা ব্যথা করছে," তিনি গম্ভীরভাবে সুধাবেন, "মানুষকে কামড়েছ বুঝি?"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে কাকে কামড়াল?"

নগেন্দ্র একবার তাকালেন নির্মলের দিকে, একবার সোহিনীর দিকে। ইন্দ্র আর অহল্যা। ইন্দ্রটি কম্পমান। অহল্যা বেপরোয়া।

ঋষি না হোন, ঋষির বংশধর। ধ্যানে সমস্ত জানলেন। প্রথমত কিছু

বললেন না। পেট ভরে খেলেন চেঁছে পুঁছে। আঁচিয়ে তোয়ালেতে হাত মুছে ঢেকুর তুললেন বার কয়। পান মুখে দিয়ে কয়েকবার মুখবিকৃতি করে নির্মলের ঘরে ঢুকে খানাতল্লাস করলেন। দেখা যাক্ তার গবেষণা সত্য না ধাপ্পা।

নোটবুক নয়, কবিতার খাতা। নির্মলও কবিতা লেখে—অন্তত সবে লিখতে শুরু করেছে!

"তোমার আমার মিলন হবে বলে
আসছি কবে থেকে
(প্রেমের) পসরাটি মাথায় করে হায়
চলছি হেঁকে হেঁকে।"

নগেন্দ্রভূষণ উল্‌টিয়ে দেখলেন এই চোদ্দ দিনে সাতাশটি কবিতা জাল হয়েছে।

"তুমি ছলকিয়া চল জলকে
আমি থমকিয়া থাকি পলকে
মম অন্তরে গাহে বল কে
সখি জাগো সখি জাগো।"

অতঃপর—

"মম চুম্বন স্বাদি' লো সজনি
ঝঙ্ক' উঠিলি বীণার মত
বক্ষ তুহার 'চ্ছ্বসিয়া 'চ্ছ্বসিয়া
ক্লান্তিতে হলো মূর্চ্ছাহত।
দ্বাবিংশবার দ্রুত চুম্বনি'
অধর তুহার দিলাম প্লাবনি'
এই ভুজনীড়ে তখন আপনি
পুলকে হইলি কূজনরত।"

খাতাখানার ভিতরে গোটা চারপাঁচ লম্বা লম্বা চুল আবিষ্কার করে নগেন্দ্রভূষণ সশব্দে গলা পরিষ্কার করলেন। ডাকলেন, "ভায়া হে, এদিকে এসো।"

নির্মল প্রাণের মায়া চৌকাঠের ওধারে রেখে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে এল।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দূর এগিয়েছ, ঠিক বলো তো?"

নির্মল বললে, "আ-আ-জ্ঞে।"

"ন্যাকা সাজছ কেন হে? আমি কি তোমার মাথা কাটছি? তবে আমার মাথাটা তুমি কত দূর কেটে রেখেছ জানতে ইচ্ছা করে। চুম্বন আলিঙ্গনের পরিখা পারে থেমেছ, না দুর্গজয় করেছ?"

"আ-আ-আ-আ-জ্ঞে।"

"তুমি তো ব্যাড্ড ভালো মানুষ হে।"

নির্মল কাঁদো কাঁদো স্বরে কী বললে শোনা গেল না। বাইরে সোহিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিল।

নগেন্দ্র আশ্বাস দিয়ে বললেন, "শ্বশুর মশাই সেই শ্বশুর মশাই থাকবেন, জামাই অদল বদল হলেও। অতএব এতে ভয় পাবার কী আছে!"

নির্মল দু' হাতে চোখ ঢাকল। সোহিনীও উঁকি মেরে তার দশা দেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

নগেন্দ্র গর্জে উঠলেন, "যাও, এটিকে নিয়ে যাও। গিয়ে ওটিকে দাও পাঠিয়ে।"

ওদিকে সোহিনীর হাসি গেল দপ্‌ করে নিবে। এ দিকে নির্মল ফণা তুলল।

(১৯৩৩)

নবনীমোহন সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে সে দশ বছর বয়স অবধি মাতৃস্তন্য সেবন করেছিল। এর মধ্যে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এটা অমূলক নয়। কারণ মায়ের একমাত্র সন্তানরা একটু কিম্ভূত হয়ে থাকে। আর বড়লোকের একমাত্র পুত্রের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আমি আমার উক্তির স্বপক্ষে অসংখ্য নজীর ও দৃষ্টান্ত দিতে পারতুম, কিন্তু তা হলে নবনীমোহনের গল্প না হয়ে কুমার উৎপলেন্দু রায় ও রায় বাহাদুর তারকব্রহ্ম পাল চৌধুরীর জীবন-চরিত হয়ে যেত।

মোট কথা, দশ বছর ধরে নবনীমোহন স্তন্যপান না করুক স্তন্যপানের অভ্যাস রক্ষা করেছিল, এই ব্যাখ্যা বোধ হয় নিতান্ত অবিশ্বাস্য হবে না।

সেই নবনীমোহন যখন যুবক হলো তখনো সে কতক বিষয়ে তেমনি শিশুপ্রকৃতি থেকে গেল। নারী দেখলেই সে মাতৃভাবে বিগলিত হয়ে পড়ত, কথা বলত আধো আধো সুরে। সে নারী যিনিই হন, যত বয়সেরই হন নবনীমোহন তাঁর নিকটবর্তী হয়ে নানা ছলে একবার হাতখানা ধরে ফেলবেই, চুড়িগুলো নেড়ে টুং টাং করবেই, প্রশ্রয় পেলে ব্রোচটা খুলে পরিয়ে দেবে, নেক্‌লেস্‌টার সোনা খাঁটি কি না তাও একমনে যাচাই করবে, এবং—আলগোছে একটি বার স্তন স্পর্শ করবে।

তার এই দুর্বলতা পুরুষদের চোখে পড়ত না। তাঁরা তাকে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ অবনীমোহনের পুত্র বলে এতই স্নেহ করতেন যে তাকে সন্দেহ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না। (অবশ্য স্বপ্নে কেউ কিছু ভাবে না।) তার পর সত্যই সে সচ্চরিত্র এবং পড়াশুনাতেও সে ভালো। (কলেজের অর্ধেক প্রোফেসার যার প্রাইভেট টিউটার সে কি পড়াশুনায় ভালো না হয়ে পারে?)

মেয়েদের মধ্যে যাঁরা মাতৃবয়সী তাঁরা কোলের ছেলেকে সন্দেহ করবেন কী? তাতে যে তাঁদেরই মোহিনীভাব সপ্রমাণ হয়। তাঁরা ভাবতেন ওটা নবনীমোহনের ইচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক।

আর যাঁরা বৌদিদি বয়সী—বন্ধুর স্ত্রী বা দিদির সখী—তাঁদের মনে একটু খট্‌কা বাধলেও তাঁরা আপত্তি করবার মতো স্পষ্ট কিছু পেতেন না। ছেলেটির

চালচলন এমন আহ্লাদী-আহ্লাদী যে তাঁরা তার হাঁটবার কায়দা, বসবার ধরন, আলাপের প্রণালী ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে ধরে তার আচরণকে ভারি একটা কৌতুকের বিষয় মনে করতেন। না, ওর মনে পাপ নেই, ও যে কী করতে গিয়ে কী করে ফেলেছে তা ও জানে না। হি হি হি হি। বৌদিদিরা তার পিছনে হাসাহাসি করেন। আনাড়ি, একেবারেই আনাড়ি!

কোনোদিন কোনো পুরুষের কাছে তিরস্কার বা কোনো নারীর কাছে অপমান না পেয়ে নবনীর আশৈশব অভ্যাস তো কাটল না। ওদিকে সে ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চের উপর উঠে আশ্চর্য কসরৎ দেখালে। সিঙ্গল্ নয়, ডবল নয়, ট্রিপল্ এম্ এ। ম্যাগাজিনের এডিটার, ইন্স্টিটিউটের সেক্রেটারী ইত্যাদি পদে বহুদিন ধরে কায়েমী হয়ে সে মানুষ চিনলে কত! আর কত মানুষই না তাকে চিনলে! একজন লায়েক ব্যক্তি বলে সে এমনি খাতির পেলে যে তার সাহায্য না নিলে কর্পোরেশনের নির্বাচন হয় না, ছেলেরা যে তার হাতে। নবনীমোহনের স্টেটমেণ্ট ও ছবি কাগজে কাগজে বেরিয়ে তার সেই নন্দদুলালী চেহারাকে কুমারী মেয়েদের মধ্যে রেষারেষির বিষয় করে তুলল।

বড়লোকের এক ছেলে, টাকার ভাবনা নেই, তাই কিছু না করার যে আর্ট সেই আর্টের আর্টিস্ট হলো সে। সহজে কাউকে ধরা দিলে না। নারীর কাছে যায় নারী মাতৃজাতি বলে। নারীকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারে না। তবে কেউ বিয়ে করছে শুনলে সর্বাগ্রে বরযাত্রী হবেন নবনী বাবু। উপহার সে শুধু সর্বাদৌ দেয় তাই নয়, সব চেয়ে দামী ও সৌখীন উপহার যদি পেতে চাও তবে তোমার বিয়েতে খবর দাও নবনীকে। কষ্ট করে নিমন্ত্রণও করতে হবে না, নবনী ওসব ফর্মালিটি মানে না। তোমার সঙ্গে তার কতদিনের বন্ধুত্ব—কিংবা বন্ধুত্বই আছে কি না—নবনীর পক্ষে এসব ধর্তব্য নয়।

তবে নবনীর ঐ সর্বনেশে স্বভাব, সে মাতৃবৎ পরদারেষু শ্লোকটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। চাণক্য পণ্ডিতের অমন মাছিমারা শিষ্য আড়াই হাজার বছরে এই একটি দেখা গেল।

বর ভ্রূক্ষেপ করে না। কে এই নিয়ে মাথা খাটায় বলো? সন্দেহ করাটাও যে ছোট লোকের কাজ। তারপর সে দিনও আর নেই যে স্ত্রীর সঙ্গে অতিথিকে বা বন্ধুকে ইনট্রোডিউস্ করে দেবে না। বন্ধুও কি সোজা

ছেলে। নিজেই অন্দরে গিয়ে হাজিরা দেয়। সুপ্রসিদ্ধ অবনীমোহনের ছেলে, নিজেও নামকরা বাল-নেতা, কী রকম উপহারটা দিয়েছে মনে আছে তো?

"এই যে বৌদি," নবনী এমন নবনীর মতো করে বলে। এমন চিনির মতো হাসি হাসে। "বেশ মানিয়েছে এই শাড়খানা। যেমন সুন্দর আপনি তেমনি সুন্দর আপনার এই ব্যাঙ্গালোর শাড়ি। ব্যাঙ্গালোর নয়? আমাদেরই মুর্শিদাবাদী? বাস্তবিক আমাদের শুধু স্বদেশী হলে চলবে না, হতে হবে স্বপ্রদেশী। ব্যাঙ্গালোর নয়, বাঙ্গালা—এই হোক আমাদের slogan."

তারপর কখন এক সময়—

কে এত লক্ষ করছে বলো। নববধূ একাই হয়তো অনুভব করলেন। তাঁর কপোল আরক্ত হলো। তিনি কোনোমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। এদিকে বালগোপাল আশ্রয় করলেন পিসিমা কি মাসিমা ভাকে আপ্যায়িতা অন্যতরাকে।

নবনীমোহনের শিক্ষা ভারতবর্ষে সমাপ্ত হয়নি। কিছু বাকী ছিল। সেইটে কী ভাবে সমাপ্ত হলো তাই নিয়ে আমাদের এই গল্প।

আজ হোক্ কাল হোক্ শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্যে বাঙালীকে একদিন বিলেত যেতে হবেই। কতলোক আইবুড়ো বয়সে না পেরে বুড়ো বয়সে বিলেত গিয়ে ব্যাচলার হচ্ছে, মাস্টার হচ্ছে, ডক্টর হচ্ছে, কিছু না হোক শুধু ডিনার খেয়ে বা ডিপ্লোমা নিয়ে আসছে, তাদের তালিকা দিতে গেলে নবনী-মোহনের এই গল্প শ্যামাদাস দত্ত বা শম্ভুনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী হয়ে উঠবে।

অতএব যুবনেতা নবনীও মা'কে না জানিয়ে সোজা কলকাতা থেকে জাহাজ নিলেন। সে জাহাজ কলম্বোতে ধরল না। কাজেই অবনীমোহনও পথ থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার সুযোগ পেলেন না।

স্বকীয় গবেষণার দ্বারা নবনী জেনেছিল যে অভিজ্ঞতাকে এক দেশে আবদ্ধ করাটা একদেশদর্শিতা। ওতে মানুষকে সঙ্কীর্ণমনা করে। দ্বিতীয়ত বিলেতেও মাতৃজাতি আছে। মাতৃজাতির মধ্যে জাতিভেদ ভালো নয়। 'ইনি আপন, উনি পর'—এ হলো লঘুচেতাদের গণনা। যাঁরা উদারচরিত তাঁরা বসুধার প্রতি নারীকে তাঁদের আপন জননী ভেবে শিশুর পক্ষে যা স্বাভাবিক দাবি সেই দাবি করেন।

নবনী প্রচুর টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। বাপও আরো পাঠিয়ে দিলেন। এই

টাকায় সে বিলেতেও কিছু না করার আর্ট আয়ত্ত করলে। দেশের কাগজ-ওয়ালাদের দিয়ে ছাপালে ওখানে সে বিলক্ষণ ক্লেশ স্বীকার করে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে লোকমত গঠন করছে।

মুশকিল হলো এই যে বিদেশিনীদের গলায় হারও নেই, কাঁধে ব্রোচও নেই, তাঁরা হাতে চুড়িও পরেন না। আর তাঁদের ফ্রকের গুণগ্রাহিগণ তাতে হাতও দিতে পারেন না—সে জিনিস এতই আঁটসাট, এতই খাটো।

নবনী ছিল বাস্তবিকই সচ্চরিত্র—অবশ্য প্রচলিত অর্থে। সে অন্য অনেকের মতো মেয়ে মানুষ নিয়ে যা তা করলে না। তার যে বিশিষ্ট গবেষণা সেই গবেষণাই তার স্বধর্ম। পরধর্ম ভয়াবহ বলেই হোক্ বা চরিত্রের দৃঢ়তা বশতই হোক্ নবনী অন্যান্যদের দলে ভিড়ল না।

বিলেতে ভারতীয় যুবকদের এই স্ত্রীতত্ত্ববিদ্ দলটি—এটিতে নাম না লেখালে তোমার অদৃষ্ট মন্দ। এরা তোমার চরিত্রের উপর কড়া পাহারা বসাবে। যদি নিতান্ত শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে থাকো তবে তুমি তরে গেলে। আর যদি তোমার প্রাণে একটু রসবোধ থাকে, যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু হেসে একটি কথা কইলে অমনি চর মহলে সাড়া পড়ে গেল। চরাচর জানল যে তুমি সেই মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছ। লেখ, লেখ তার বাবাকে, মামাকে, শ্বশুরকে, মুরুব্বিকে। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খায়।

বেচারা নবনীর করুণ উদ্যমকে—যে উদ্যম এতই মৌলিক যে নবনীর পথে আর পথিক নেই—এই চর সম্প্রদায় ভুল বুঝলে। সে একে তাকে লম্বাচওড়া উপহার কিনে দেয়—কেন? থিয়েটারে বায়োস্কোপে নিয়ে দামী আসনে বসায়—কেন? বড় বড় রেস্তোরাঁতে এবেলা ওবেলা খাওয়ায়—কেন? এত খরচ যে জন্যে তা কি শুধু একটুখানি স্তনস্পর্শ? বিশ্বাস করবে কেউ এ কথা?

চরবৃন্দ অবনীমোহনকে বেনামী লিখে সতর্ক করে দিলেন। অবনীমোহন পুত্রকে পত্র লিখলেন, "বাপু হে, স্ত্রীলোক অতি ভীষণ প্রাণী, শৃঙ্গীণাং শত-হস্তেন, কিন্তু স্ত্রীণাং সহস্র ক্রোশেণ। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবা।"

নবনী অবশ্য চলে এল না। কিন্তু তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করল যে ইংলণ্ডে তার হিতৈষী আছে। তখন তার ধারণা হলো যে ইংলণ্ডের ডক্টরেট্ যে-সে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ লিখছে "বাংলা নাটক" সম্বন্ধে—যার অস্তিত্ব নেই, কেউ লিখছে "ভারতীয় ধনুর্বিদ্যা"র উপর—যার বর্ণনা মহাভারতে আছে। ওর চেয়ে দুষ্প্রাপ্য প্যারিসের দক্তর উপাধি।

ভিতরে ভিতরে সে ইংরেজ রমণীকুলের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তারা যেন মাতৃজাতিই নয়। তাদের ওভারকোট পরিয়ে দেবার ছলে নবনীর হাত একটু চুলবুল করেছে কি, অমনি তারা সে হাত রূঢ়ভাবে ঠেলে দিয়েছে। নবনী বুঝতে পারে না, যারা তার বুকে বুক ঠেকিয়ে নাচতে পেলে সুখী হয়ে যায় তার চেয়ে নির্দোষ বিষয়ে কেন তাদের এত আপত্তি। নবনী সাব্যস্ত করলে ইংরেজ জাতটাই লজিক্ জানে না।

নবনী তো গেল প্যারিসে। দেশের কাগজে ছাপা হলো ফ্রান্সে নবনী-মোহন ভারতমিত্র মণ্ডলী স্থাপন করতে যাচ্ছেন।

কিন্তু প্যারিস বড় দুরন্ত জায়গা। সেখানে নবনীমোহন যে ঘোল পান করলেন তাতে তাঁর স্তন্যপিপাসা জন্মের মতো মিটে গেল।

নবনীর সাধ গেল, সে cabaret-তে নাচবে। না জানি কার পরামর্শে এমন এক কাবারেতে গিয়ে উপস্থিত হলো যেখানে আলিবাবার মতো সুড়ঙ্গ দিয়ে সুড়্ সুড়্ করে নেমে যেতে হয়। আলিবাবার মন্ত্র মনে রাখলে আবার উঠে আসাও যায়। কিন্তু যে হতভাগ্য মন্ত্র ভুলল তার হয় আলিবাবার শত্রুর মতো নিঃসহায় মৃত্যু—অন্তত তার উপর দিয়ে হয়ে যায় নিষ্ঠুর দস্যুতা।

দাদা তো নেমে গেলেন একা। সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কোনো ভারতীয়কে, পাছে সে চরবৃত্তি করে। প্রথমেই করলেন যথারীতি একটি বোতল খরিদ এবং একটি সঙ্গিনী নির্বাচন। এতগুলি কলপ-মাখা-চুল, সুরমা-আঁকা-চোখের-পাতা, ক্ষুর-দিয়ে-কামিয়ে-পেন্‌সিল-দিয়ে-লেখা-ভুরু, রুজ্-রঞ্জিত-ওষ্ঠাধর জাল তরুণী থেকে একটি নির্বাচন করতে কেবল নয়নের নয় মস্তিষ্কেরও পরীক্ষা হয়ে যায়। বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিদ্যা শেখায় না।

নবনী ঐ নির্বাচন কার্যে শিশুত্ব দেখালে। যে "তরুণী"টিকে নির্বাচন করলে সে তো উল্লাসে কলধ্বনি করতে থাকল। কিন্তু তার ভাষার যদি নবনী এক ছটাক বুঝত। তবে রক্ষা এই যে প্রমোদের সময় স্ত্রী-পুরুষে ভাষার অভাব হয় না, স্বয়ং প্রকৃতি হন তাদের দোভাষী।

এক চোট নাচ হয়ে যাবার পর সঙ্গিনী জানালে, চলো, নিরালায় কিছু পানভোজন করা যাক। নবনী জানালে, নিশ্চয়! তবে পান আমি নিজে করব না।

নিরালায় নবনীর গবেষণা শুরু হলো। সে দেখলে "যুবতী"টির বক্ষে এক ছড়া পাথরের মালা। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী পাথর?"

"যুবতী" ইংরেজী বুঝল না, ইঙ্গিত বুঝল। ফড় ফড় করে বুকের কাপড় খুলে কপট লজ্জায় দুই চোখ ঢোকল।

নবনী কোনোদিন অনাবৃত স্তন দেখেনি। দেখে প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কী! চেঁচিয়ে উঠল, "Obscene! Obscene!"

এই স্থলে বলে রাখতে হয় নবনী হচ্ছে সেই জাতের মরালিস্ট যাঁরা দুই তিন পক্ষ বিয়ে করেন, এক আধ ডজন পুত্রকন্যার জনক হন, তবু কেউ যদি কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ করলে অমনি চেঁচিয়ে ওঠেন, "Obscene! Obscene!"

দাদা তো চেঁচিয়ে উঠলেন, "Obscene! Obscene!" সুন্দরী বুঝলেন, "চমৎকার! চমৎকার!" তখন বিনা আড়ম্বরে একে একে প্রতি অঙ্গ উন্মোচন করলেন।

নবনী এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তার সংজ্ঞা লোপ হলো।

যখন তার সংজ্ঞা ফিরল তখন সে দেখলে এক বিকটাকার পুরুষ তাকে চক্ষু দিয়ে গ্রাস করছে। এই রাহুর ফরাসী আখ্যা apache অর্থাৎ গুণ্ডা।

রাহুটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললে, "তুই আমার বালিকা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করে তার সতীত্বনাশ করতে যাচ্ছিলি। অরে দুরাচার, তোর এত বড় স্পর্ধা। আজ তোর প্রাণ নেব।"

এই কথা শুনে নবনীর যেটুকু সংজ্ঞা ফিরেছিল সেটুকু বুঝি যায়।

"বালিকা স্ত্রী"টি জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। "স্বামী"কে তার "প্রণয়ী"র প্রাণ নিতে উদ্যত দেখে তার চোখে জল এল। সে হাঁটুগেড়ে করযোড়ে "প্রণয়ী"র প্রাণভিক্ষা করলে।

"স্বামী" বললেন, "এ লোকটা বিদেশী। বিদেশী-মাত্রেই ফ্রান্সের অতিথি। একে মার্জনা করলুম। কিন্তু আমার মতো মানী লোকের মানটি যে গেল তার খেসারৎ দিতে হবে একে।"

নবনী এতক্ষণ একমনে ভগবানকে ডাকছিল। বললে, "দোহাই ধর্মাবতার। আমার প্রাণটি ছেড়ে আপনি অন্য যা কিছু নিতে চান সমস্ত নিন"—এই বলে সে তার টাকার থলিটি কম্পিত হস্তে গুণ্ডার চরণে নিবেদন করলে। যেন গুণ্ডাই ভগবান।

গুণে গুণে দেখলে কিছু কম পক্ষে এক হাজার ফ্রাঁ। উৎফুল্ল হয়ে বললে, "Merci bien ! এখন তোমাকে বাসায় যেতে হবে তো। রাখো দশ ফ্রাঁ সঙ্গে। ওরে কুলটা, যা তোর নাগরকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আয়।"

নবনী বাবাকে তার করলে, "আপনার আদেশ শিরোধার্য। দেশে রওনা হচ্ছি। জাহাজের নাম নলডেরা।"

(১৯৩৩)

বিড়ম্বিত

সেনের স্ত্রী একালের মেয়ে। সভাটা সমিতিটা নিয়ে অবসর কাটান। সেনের তাতে আপত্তি নেই, তবে খুব বেশী আস্থাও নেই। তার দুঃখ এই যে সমাজের যেখানে যত অনাথা মেয়ে ছিল তারা সমিতির সূত্র ধরে তার স্ত্রীর পোষ্য হয়েছে।

এই পোষ্যদের একতমার নাম শৈল। আবাল্য বিধবা, মধ্যবয়সিনী; ন্যাড়া মাথা, মুখে বসন্তের দাগ, দাঁতগুলি গজহস্তীর মতো। সেন তার স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে বলে, "এই পোষ্যটি তো ভারি নিরাপদ। এর সঙ্গে কথা কইতে পারা যায় দেখছি।"

স্ত্রীর ইচ্ছা শৈলকে যাবজ্জীবন অন্ন সংস্থানের জন্যে কোনো একটা বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। বেচারি কতদিন পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করবে। সেন বলে, "স্ত্রী স্বাধীনতার পরিণাম তো এই। সমিতি করে স্বামীর গলগ্রহ সংখ্যা বাড়ানো।"

যতদিন তারা মফঃস্বলে ছিল শৈলর জন্যে কিছু করে উঠতে পারেনি। এতদিন পরে কলকাতায় বদলি হয়ে স্বামীস্ত্রীতে এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হলো। চিঠি লিখে শৈলকেও আনিয়ে নিলে।

এখন শৈল হচ্ছে পড়াশুনায় এত কাঁচা যে তাকে কোনো 'সদন' বা 'ভবন' ভর্তি করে নিতে চায় না। অথচ স্কুলে যাবার বয়সও তার নয়। নানা স্থানে চিঠি লিখে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। বন্ধু বান্ধবকে দিয়ে সন্ধান করিয়েও শৈলর কোনো সুরাহা হলো না। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই চাইলে ফী কিংবা চাঁদা।

এদিকে শৈল যে বাড়িতে দু' পাতা পড়বে তার লক্ষণ দেখালে না। তার প্রধান কাজ সারাদিন ফ্যান খুলে দিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবা, আর রাত্রে ফ্যান খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়া। এও একরকম পড়া। সেন তার স্ত্রীকে বললে, "শৈল যে রকম পড়ছে শুয়ে শুয়েই ডিগ্রী পাবে।"

স্ত্রী ওকে দু'তিনবার কথা প্রসঙ্গে বললেন যে ফ্যান লাইটে বিস্তর খরচ। আর সব সময় দরকারও হয় না। সেনরা নিজেরাই হিশাব করে ব্যবহার করে। কিন্তু শৈল ঐ ইঙ্গিত বুঝল না। ভোরে যখন হাওয়া দিচ্ছে তখনও

জানলা দরজা বন্ধ রেখে শৈল ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। সেই ফ্যানের ভন্ ভন্ শুনে সেনের মাথা বন্ বন্ করে। সেন বলে, "এক শৈলর ফ্যানের জন্মে দশ বারো টাকা বিল্ করবে দেখো।"

স্ত্রী বলেন, "তা হোক্। এই নিয়ে অত মাথা ঘামালে মনটা ছোট হয়ে যাবে।"

বেচারা সেন বিল ও দিল দুইয়ের মধ্যে মিল রাখতে না পেরে কোনো আশ্রমে চাঁদা দিয়েও শৈলকে পাঠাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রী শৈলর উপর অতিরিক্ত সদয় হয়ে উঠেছিলেন, সেনের প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

শৈল নাকি খোকনকে ভারি ভালোবাসে। খোকনও তার কাছে থাকতে পেলে মাকে ভুলে থাকে। শৈলই তাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, তার সঙ্গে খেলা করে। সেন এ খবর পেয়ে ভাবলে, বিধবা মানুষ, নিঃসন্তানা, এই তার জীবনে এক সানন্দ সার্থকতা। আহা, খোকনকে নিয়েই থাকুক সে। সেনের ভাব আন্দাজ করে স্ত্রী বললেন, "খোকার নতুন মা তোমাকেও দেখবে শুনবে। আমি এবার নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারি।"

সেন বললে, "তুমিও শেষকালে সন্দেহী হলে। তোমার কি বিশ্বাস পদ্মে যার রুচি শৈবালে তার রুচি হবে?"

এখন সেনের স্ত্রীর নাম কমলা। সে প্রীত হয়ে বললে, "যাও।"

শৈল সেনদের বাড়িতে অতিথি হিশাবে থেকে গেল। সেনের স্ত্রী আয়া রাখেননি। আয়ারা যে দুশ্চরিত্রা হয়ে থাকে (কতকটা) সে কারণেও, আবার তারা নাকি শিশুকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়ায় (প্রধানত) সে কারণেও। এতদিন তিনি নিজেই আয়ার কাজ করতেন, বেয়ারার সাহায্যে। এখন শৈলকে পেয়ে তাঁর ভাবনা গেল।

শৈলও যেন বর্তে গেল। প্রায় ছুটে এসে বলে, "কমল, খোকা—করেছে। আমি তুলে ফেলে দিই?"

সেনরা লক্ষ করল শৈলর তাতে মহা উৎসাহ। খোকন কিছু একটা করলে সেও শিশুর মতো দৌড়াদৌড়ি করে। তার সোরগোল শুনে বাইরের লোক ভাবে বাড়িতে কিসের উৎসব। আর খোকন যদি কিছু না করে তবে শৈলর তাই নিয়ে অতি দুশ্চিন্তা। পঞ্চাশবার জানিয়ে যায়, খোকনের তো এখনো কিছু হলো না।

সেন স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে বলে, "ও জাতে কী? ধাঙড় নয় তো?"

স্ত্রী বলেন, "এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের দিনে এ সব মামুলি পরিহাস ভালো নয়।"

তবে তিনিও চুপি চুপি হাসেন। শিশুর আবর্জনা সম্বন্ধে মা'র মনে বিকার নেই, কিন্তু কোন মা তার জন্যে গর্বে স্ফীত হন?—"খোকন আজ যা করেছে তা এমন চমৎকার হয়েছে! একটা দেখবার মতো জিনিস হয়েছে, কমল।"

একটা মানুষ বাড়িতে এক মাস থাকলে সে যদি মেয়েমানুষ হয়ে থাকে তবে বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে ঘোমটা-খোলা কথাবার্তা না কয়ে পারে না। আর শৈলকেও যতটা অবগুণ্ঠিতার মতো দেখায় ততটা সে নয়।

তার অন্তহীন কৌতূহল সেনদের স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধটাকে ঘিরে।

কথায় কথায় সে ঐ একটি প্রসঙ্গই পাড়ে, আর সেনের স্ত্রীকে পরামর্শ দেয়, উপদেশ দেয়। স্ত্রীর নাকি স্বামীর উপর দস্তর মতো নজর রাখা উচিত। তিনি নাকি স্বামীর যথেষ্ট তত্ত্ব নিচ্ছেন না। প্রত্যেক রাত্রে যে তাঁরা একত্র শোন না সেটাতে স্ত্রীর বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বামীস্ত্রীতে খুব ভালোবাসা আছে বলে দৃশ্যমান হয় বটে, কিন্তু স্বামীকে প্রত্যহ সন্তুষ্ট না করলে সে ভালোবাসা তলে তলে ক্ষয়ে যায়।

এমনি সব উপদেশ ও পরামর্শচ্ছলে শৈল প্রশ্নও করে বড় কম না। প্রশ্নগুলো যেমন অন্তরঙ্গ তেমনি অদ্ভুত। তার থেকে বোঝা যায় তার নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষীণাতিক্ষীণ। আবার এও বোঝা যায় যে সে পরের অভিজ্ঞতার সংবাদ রাখতে অভ্যস্ত!

সেনের স্ত্রী দু' একবার রাগ করবার চেষ্টা করে দেখলেন শৈল দমবার পাত্রী নয়। তার যা বক্তব্য তা সে বলবেই। তখন তিনি কৌতুক বোধ করতে লাগলেন। লেখাপড়ায় যে 'অজ, 'আম' অবধি উন্নতি করেছে, আর পারেনি, পারতে চায়ও না, সেই মানুষ অন্য বিষয়ে একজন অথরিটি!

স্বামীকে বললেন, "ওর একটা বিয়ে দিতে হচ্ছে।"

সেন বললে, "আজকালকার দিনে বিধবা বিবাহ করতে যদিও অনেকের সাহস হবে তবু কার এত মনের জোর যে অমন সুরূপা ও সুনবীনাকে গ্রহণ করবে?"

বস্তুত ওর দ্বারা ঐ আয়ার চাকরি ছাড়া আর কী যে হতে পারে তা সেনরা খুঁজে পায় না। কিন্তু অমন প্রস্তাবে ও রাজি হবে না। ও যে ভদ্র-ঘরের মেয়ে! বিনা প্রস্তাবে বিনা নিযুক্তিতে সে আয়ার কাজই করতে থাকল।

খোকনকে সঙ্গে নিয়ে বা একা রেখে যেতে পারতেন না বলে সেনের স্ত্রীর রাত্রে কোথাও বড় একটা যাওয়া হতো না। কিন্তু শৈল খোকনের ভার নেওয়ায় তিনি রোজ টকিতে চললেন। বলা বাহুল্য তাঁর না হওয়ায় সেনেরও টকিতে যাওয়া হতো না, এর জন্য সেন কতবার আয়া রাখতে বলেছে ও স্ত্রীকে নারাজ দেখে মনে মনে ধরে নিয়েছে যে স্ত্রী বোধ করি আয়া সম্বন্ধে স্বামীর আগ্রহটাকে সন্দেহ করেন।

টকিতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লেশমাত্র মনোমালিন্য রইল না। তারা ভারি হালকা বোধ করলে। এবং এর জন্যে সাধুবাদ দিলে শৈলকে।

বাড়ি ফিরে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, "খোকন কাঁদেনি তো?"

শৈল বলে, "না। শুধু একবার—করেছিল।"

খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মাও ফিরেছেন, আর শৈলর এ ঘরে কাজ কী? সে যায় নিজের ঘরে। তবে কুণ্ঠার সহিত। যাবার আগে সেনদের বিছানাটার উপর পড়ে তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি। আহা, এই এক বিছানা আর ওই এক বিছানা!

খোকনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

শৈলর বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। সকলে বলেন ওকে আগে কিছু লেখাপড়া শেখাতে হবে। ওটুকু লেখাপড়া শিখতেই তার লাগবে তিন চার বছর। তারপর আরো দুই তিন বছর ধরে বৃত্তিশিক্ষা। তবেই হবে সে স্বাবলম্বী। ততদিন তার শিক্ষার খরচ দিতে সেনের আন্তরিক আপত্তি। সেন বলে, "আমাদের আত্মীয় আত্মীয়ার মধ্যে সাহায্যপ্রার্থী রয়েছে কত। তাদের দাবি আগে। আর স্বাবলম্বনের জন্যে শিক্ষারই বা আবশ্যক কী? এই তো বেশ আয়ার কাজ চালাচ্ছে। আমি ওর ফ্যান খরচা কেটে রেখে কিছু মাইনেও দিতে প্রস্তুত আছি।"

স্ত্রী বলেন, "না, না। আমরা ওকে হাতে পেয়ে ওর স্নেহপ্রবণতার সুবিধা নিচ্ছি। ও চায় সারা জীবনের একটা সংস্থান। আয়া হয়ে ভদ্রঘরের মেয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে, এ কী অনাসৃষ্টি কথা।"

স্ত্রী বলেন বটে, কিন্তু গা করেন না। শৈল থেকে তাঁর হাতে সময়

এসেছে। রাশি রাশি টাকার চেয়ে যৌবনকালে একটুখানি সময়ের দাম কম নয়।

আর শৈলও আছে ভালো। এই গরমে ওর দেশে ওর সম্বল ছিল হাত পাখা। এখনো সেই হাত পাখা ওর সঙ্গে আছে। তাতে নাম লেখা—"শৈলবালা দেবী।" সেটা দিয়ে বাতাস করতে যে কসরৎটা হতো তা বেঁচেছে, সেটার উত্তাপহারিণী শক্তির উল্লেখ নাই করলুম। মামার সংসারের খাটুনি ও বকুনি থেকে রেহাই পেয়ে শৈল এ সংসারে দিব্যি আরামে আছে। তার শরীরের পুষ্টি—এমন কি তার মুখশ্রীতে লাবণ্যসঞ্চার—ঘোষণা করছে তার ইদানীন্তন স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাধীনতাও তার অননুভূতপূর্ব। সেনের স্ত্রী তার ছোট বোন। ছোট বোনকে সে ভয়ই বা করবে কেন, আর ছোট বোনের অনুমতিই বা কেন নেবে? তার যখন যা খেতে মন যায় তা ঠাকুরকে দিয়ে রাঁধিয়ে নিয়ে খায়। তবে সে কাশীতে গয়াতে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়ে অনেক মুখরোচক খাদ্য ত্যাগ করে এসেছে। সেন বলে, "তাতে তার দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়। নতুবা এ বেলা মালপোয়া ও বেলা রাবড়ি খেতে খেতে ওর এমনি অভ্যাস হয়ে যেত যে ওর স্বাবলম্বনের আয়ে কুলোত না। কিন্তু ও যে ক্রমেই কঠিন কাজের অযোগ্য হয়ে উঠছে, স্বাবলম্বী হবে কী করে?"

স্ত্রী বলেন, "ও যা করছে তাই বড় সহজ নয়। একটা শিশুর স্বাস্থ্য ওর হেপাজতে। এমন সচ্চরিত্রা আয়াই বা পাব কোথায়?"

তারপর সেন নিজের চরকায় তেল দিতে অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিল। শৈলর কী হলো না হলো খোঁজ নেবার অবসর পায়নি। কদাচিৎ স্ত্রী ওর প্রসঙ্গ তুললে সেন বলত, "ওসব মেয়েলি ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনে।"

এক হিশাবে দেখতে গেলে শৈল তার স্ত্রীর সত্যিকার দিদিও তো হতে পারত, খোকনের সত্যিকার মাসিমা। শৈল যে খুশি হয়ে আমার কাজ করছে এর নিশ্চয়ই একটা moral effect আছে খোকনের উপর। বিধবা পিসিমা মাসিমারাও তো আশ্রিতা হলে তাই করতেন। আমাদের বিধবারা দেবী। তাঁদের ঐ দেবীত্ব আমাদের পক্ষে ভারি সুবিধের। তাতে ঘরের টাকা বাইরে যায় না। অধিকন্তু ছেলেমেয়েগুলোর উপর moral effect যা হয় তাতে তারা মানুষ হয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন স্ত্রী এসে বললেন, "শৈল কি তোমার বাড়ি ঝি-গিরি করতে এসেছে ?"

সেন বললে, "না। তিনি তোমার বিধবা দিদি। তিনি দেবী।"

"ওর শিক্ষার জন্যে তুমি কী করলে ?

"আমি এক সঙ্গে ক'টা দিক দেখব ? তুমি আপিসে যাও তো আমি 'সদনে' 'ভবনে' 'সভা'য় 'সমিতি'তে যাই।"

তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে জেদ ধরে বললেন, "না, না, একটা কিছু করা উচিত। ওকে আর আমি এখানে থাকতে দেব না।"

সেন ভাবলে, কোনো ঈর্ষার কারণ দিয়েছে নাকি সে। ভয়ে ভয়ে বললে, "কী হয়েছে ?"

তিনি উগ্রমূর্তি ধরে বললেন, "এই সবের জন্য আমি আয়া রাখতে চাইনি।"

সেন মনে মনে রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তবু পরিহাসের ছলে জিজ্ঞাসা করলে, "কমলবনের মধুপ আজি কী অপরাধে অপরাধী ?"

তিনি হেসে ফেললেন। "না, তা নয়। কিন্তু এ যে আরো ভয়ানক।"

স্বামীর সহিত আচরণের চেয়ে নারীর পক্ষে আরো ভয়ানক কী হতে পারে সেন তা আন্দাজ করতে পারলে না। বসে পড়ে বললে, "আরো ভয়ানক! গয়না চুরি করেছে ?"

তিনিও হাসতে হাসতে বসে পড়লেন। "তোমরা আমাকে পাগল করে তুলবে দেখছি। একজন দিলে ভয় পাইয়ে, আরেক জন দিচ্ছেন হাসি পাইয়ে।"

তিনি যে বিবরণ দিলেন তা শুনে সেনেরও আতঙ্কে রোমকম্প হলো। উদ্বেগে মাথার চুল উঠে যাবার দাখিল। দুই হাতে মাথা ধরে সেন বললে, "ও আপদকে আসতে লিখেছিল কে ? আমি তো এই আশঙ্কায় নিঃসন্তানা বিধবাদের প্রতি বিরূপ। দাও ওটাকে বিধবাবিবাহ সহায়ক সভায় পাঠিয়ে।"

স্ত্রী (নিজের) দুই কান মলে বললেন, "আমিও কান মলছি। আর কখনো খোকনকে যারা মা হয়নি তাদের কাছে ছেড়ে দেব না। তুমি টকিতে যেতে চাও তো আরেকটি বিয়ে করো।"—তিনি কেঁদে ফেললেন।

(১৯৩৩-৩৪)

চুপি চুপি

বনোয়ারীলাল তার স্ত্রী ইন্দুকে চুপি চুপি বললে, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

ইন্দু সাশ্চর্যে বললে, "আমার সঙ্গে?" সকৌতুলে বললে, "কী কথা?"

"ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব?"—বনোয়ারীর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। যেন সে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

"না, আমার শুনে কাজ নেই।" ইন্দু খিল খিল করে হেসে বললে, "তুমি যা বলবে তা আমি জানি।"

"তাই নাকি?" বনোয়ারী সকৌতুকে বললে, "বলো দেখি আমি কী বলব?"

"কী বলবে?" ইন্দু মাথা দুলিয়ে বললে, "বলবে—এই—একটা কিছু তামাশার কথা। কোথায় কারুর কাছে শুনে এসেছ।"

"না, না।" বনোয়ারী পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেল। "না, না, তামাশা নয়। সত্যি। আমি ভারি ভাবিত হয়ে পড়েছি।"

ইন্দুও ভাবিত হলো। তবু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ! তুমি ভাববে। হাসি ছাড়া তোমার মুখে অন্য কিছু কি কেউ কোনদিন দেখেছে! মা গো, বিদূষক যদি কেউ থাকে এ যুগে তবে সে তুমি।"

বনোয়ারী সখেদে বললে, "আমি ভাবব না তো কে ভাববে, ইন্দু। বেকার বসে আছি শ্বশুরবাড়িতে। দেখতে দেখতে গোটা দুই ছেলেমেয়ে হয়ে গেল। আরো হবে যদি না—"

"যদি না?"—ইন্দু ভ্রূকুঞ্চন করলে।

বনোয়ারী ইন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যে বললে তা আমরা আড়ি পেতে শুনিনি।

ইন্দু ক্রোধে লজ্জায় উত্তেজনায় ও ঘৃণায় অপরূপ হয়ে বললে, "ভদ্রলোকের ছেলে না তুমি? ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন কথা বলতে তোমার সাহস হয়?"

"চুপ, চুপ, ইন্দু! চুপ, চুপ!"

"চুপ, চুপ ? চুপ করব কেন ? বলব গিয়ে মাকে, বলব বাবাকে, বলব সবাইকে।"

"লক্ষ্মীটি—"

"ছাড়ো, হাত ছাড়ো। ভিজে বেড়াল। আমি ভাবলুম কী নতুন তামাশার কথাই শোনাবেন। না, জন্মসংযম—"

"তোমার পায়ে পড়ি, ইন্দু!"

"ও কী! ছি, ছি ? তোমার আজ হয়েছে কী ?"

এর দু' বছর পরে বনোয়ারীর চাকরি হলো। চাকরিই যখন হলো তখন আরো একটি ছেলে হয়েছে বলে চিন্তা করা অশোভন। বনোয়ারী বরঞ্চ খুশি হয়ে প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে ঘটা করে আপিসের লোকজনকে খাওয়ালে। বললে, "এ আমার তৃতীয় সন্তানের কল্যাণে।" ছেলেটি পয়মন্ত।

চতুর্থ সন্তানটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে—সে আরো বছর দেড়েক পরের কথা—তখন যমে মানুষে টানাটানি। যাকে বলে tug of war. একবার যম বলে, "হেঁইও।" একবার মানুষ বলে "হেঁইও।" অবশেষে যমই হলো কাবু। প্রায় আঠারো মাসের সঞ্চয় ডাক্তারকে সঁপে দিয়ে বনোয়ারী শুনলে ডাক্তারের এই প্রশ্ন, "আপনি কি মানুষ, না মেষ ?" ডাক্তার এমন গালাগালি দিলে যে বনোয়ারীর বিশ্বাস হলো সে বাপ হয়ে গুরুতর অপরাধ করেছে।

শ্বশুর এসে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তাঁর মুখভাব সেই ডাক্তারের মুখের মতো। শাশুড়ী বললেন, "আমার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে। তার এই দশা। আহা, বাছা রে! কেন তোকে আগে আনাইনি ?"

বনোয়ারী কাজের মধ্যে ডুব মেরে বাঁচল। স্ত্রীকে সে ভালোবাসত। বিরহে যে দিন দিন মোটা হলো তা নয়। তবু এক রকম শান্তিতে বাস করায় তার ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা দিল। বিরহের সঙ্গে বেশ বনিবনা করে এনেছে এমন সময় স্ত্রী এসে সশরীরে উপস্থিত। বাপের বাড়িতে তার আর কিসের অধিকার, ভাইদের সংসার হয়েছে, তারাই যা করবে তাই হবে। ইত্যাদি।

বনোয়ারী চার সন্তানের সহিত তাদের মা'কে দেখে চতুর্গুণ খুশি হলো। তা হোক। কিন্তু আসল কথাটি ভুলল না। এখন তার চাকরি হয়েছে। শ্বশুরের গলগ্রহ নয়। অম্লান মুখে বললে, "দীক্ষা নিয়েছি। অসিধার ব্রত করতে হবে।"

ইন্দু তো ফেললে হেসে। ভুরু দিয়ে শাসিয়ে বললে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

ত্রেতাযুগে একমাত্র লক্ষ্মণ ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পেরেছিলেন। কোনো যুগে অন্য কেউ তা পেরেছে বলে পুরাণে উল্লেখ নেই। কাজেই বছর না ঘুরতেই পঞ্চম সন্তানের আগমনের বার্তা এল। বনোয়ারী এত লজ্জিত হয়ে পড়ল যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারলে না। দিলে তাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে।

পঞ্চম সন্তানটি ইন্দুকে বাঁচতে দিয়ে নিজেই যমের রথে উঠল। যাতনায় ও শোকে ইন্দুর চেহারা হলো ইন্দুরের মতো। তার সে লাবণ্য নেই, তার স্বাস্থ্যও গেছে চিরকালের মতো ভেঙে। শ্বশুর রুখে বললেন, "অমন জামাই-এর জেল হওয়া উচিত।" শাশুড়ী কপালে কাঁকন হেনে বললেন, "আমার নাতি রে!" বুড়োরা ফোকলা মুখে হাসলেন, "এ কালের ছেলেরা সংযম কাকে বলে জানে না।" বুড়িরা তুড়ি দিয়ে বলাবলি করলেন, "নাতির মুখ দেখতে পাওয়া কলিযুগে ক্রমেই দুর্ঘট হয়ে উঠছে।"

বনোয়ারী স্ত্রীকে দেখতে এসে লজ্জার মাথা খেয়ে বললে, "তুমি বছর-খানেক মার সঙ্গে কোথাও গিয়ে শরীর সারাও।"

ইন্দু যদিও ইন্দুর হয়েছে, তবু তারও তো একটা অভিমান আছে। সে বললে, "তুমি আরেকটি বিয়ে করো। আমার এ শরীর আর সারবে না।"

বনোয়ারী তাকে প্রবোধ দিয়ে বললে, "যখন তোমাকে চুপি চুপি একটি কথা বলেছিলুম তখন শুনলে তো এমন দুর্দশা হতো না।"

ইন্দু ফোঁস করে উঠল।—"আবার সেই বেয়াদবি। মনে রেখো আমি তোমার স্ত্রী। রক্ষিতা নই।"

বনোয়ারী যেন হোঁচট খেয়ে পড়ল।

কয়েক মাস রাঁচিতে কাটিয়ে গায়ে স্বাস্থ্যের জলুস নিয়ে ইন্দু একদিন বনোয়ারীর কর্মস্থলে এল। বললে, "তোমার কথাই শুনব। শ্রীরামবাবুর স্ত্রীর কাছে বিস্তর সদুপদেশ পেয়েছি। হাজার হোক পতি পরম গুরু।"

বনোয়ারী কতটা উৎফুল্ল হলো তা ব্রতচারীমাত্রেই অনুমান করতে পারবেন। বগল বাজিয়ে লাফ দিয়ে বড় বড় কবিদের ভালো ভালো কবিতা ভুল আওড়ালে। বললে, "এত দিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলেম ধন্য রে ধন্য।"

বনোয়ারী যা মনে করেছিল তা নয়। শ্রীরামবাবুর স্ত্রী কোন এক কাগজে মাদুলী ও সন্ন্যাসীদত্ত ওষুধের নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন। একদিন ভি-পি'তে সেই সব আপদ এসে হাজির। বনোয়ারী তর্ক করে বললে,"ওসব মনকে চোখ ঠারার সরঞ্জাম। মন ভুললেও দেহ ভুলবে না। বৈজ্ঞানিক সাজ আনাতে হবে।"

ইন্দু বললে, "ও যে কৃত্রিম।"

বনোয়ারী বললে, "ওষুধ বুঝি কৃত্রিম নয়।"

ইন্দু বললে, "ওষুধ হলো গাছ-গাছড়ার থেকে তৈরি।"

বনোয়ারী বললে, "রবারও গাছের রস থেকে প্রস্তুত।"

ইন্দু মাথায় হাত দিয়ে বললে, "ছি, ছি, যে মানুষ বুঝেও বুঝবে না, তাকে বুঝিয়ে বলা কী ঝকমারী!"

বনোয়ারীও ঠিক সেই মন্তব্যই করলে।

স্বামী-স্ত্রীতে মতবিরোধ হলে স্ত্রীর মতই বহাল থাকে। এই হচ্ছে সনাতন বিধি।

যথাকালে ইন্দুর মাথায় উঠল ওষুধের বিষ। সে যে একদিন পাগল হয়ে যাবে এর আভাসও দিলে।

বনোয়ারী তাকে এড়াতেই চায়। ইন্দু বলে, "রুগ্ণ বৌ মনে ধরবে কেন? আরেকটি বিয়ে করো।"

বনোয়ারী তার মুখে হাত দিয়ে বলে, "পাগল! কী যে বলো"—

ইন্দু হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন সুরে বলে, "পাগল বই কি। বলবেই তো পাগল। পুরোনো বৌকে পাগল অপবাদ না দিলে তো নতুন বৌ আনতে পারছ না।"

বনোয়ারী ভাবলে, এ কী সংকট। হে ভগবান, হে আল্লা, হে গড, তোমরা সকলে মিলে এ হতভাগ্যের একটা গতি করো।

গতি যা হলো তা মামুলি! ষষ্ঠ সন্তান আসছেন নোটিস পাওয়া গেল।

বনোয়ারী বললে,"ঔষধ বিফল বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিলে হাজার টাকা পুরস্কার দিব। তবু ভালো যে হাজারটা টাকা 'পুরস্কার' পাওয়া যাবে।"

ইন্দু বললে, "কী? আমি যাব সকলের সাক্ষাতে প্রমাণ করতে! ছিছি স্বামী হয়ে এমন ইঙ্গিত করলে!"

বনোয়ারী বেচারার ইতিমধ্যে ভুঁড়িটি অন্তর্হিত হয়ে মাথায় টাক পড়েছিল। যেন একটি চর ডুবল, আরেকটি চর উঠল। সে দিশাহারা হয়ে বললে, "বেশ, বেশ।

ইন্দু তথাপি ভ্রম স্বীকার করলে না। বললে, "দেশের জন্যে আমার এই স্বার্থত্যাগ। দেশকে বলবান করতে হলে তার জনবল বাড়াতে হবে।"

বনোয়ারী বললে, "ঠিক বলেছ। ইংরেজের চেয়ে সংখ্যায় সাতগুণ হয়েও তাদের সমকক্ষ হতে পারা যাচ্ছে না, আটগুণ হয়ে দেখা যাক কী হয়।"

"দেখবে, এইবার স্বরাজ হবে।"

"হ্যাঁ, আরো দলাদলি বাড়বে। পরস্পরের মাথায় বাড়ি দেবার লোক আরো দরকার হবে।"

বনোয়ারীও প্রায় সৌনিক হয়ে উঠেছিল।

বৌকে তার বাপের বাড়িতে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে বনোয়ারী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার শ্বশুর কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার স্ত্রী তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল।"

বনোয়ারী ভাবলে, পুরো পাগল হয়েছে তা হলে।—আরো দু'শো মাইল দৌড় দিলে।

শ্বশুর বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার চাকরি এখনো আছে। তোমার স্ত্রীর দুঃখ চোখে দেখা যায় না।"

বনোয়ারী ভাবলে, মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। দুঃখ মিথ্যা। চাকরি মায়া। —আরো তিনশো মাইল পাড়ি দিলে।

শ্বশুর বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার ষষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রসূতী ও সন্তান দু'জনেই নিরাপদ।"

বনোয়ারী তখন পণ্ডিচেরীতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (sixth sense-এর) তপস্যায় মগ্ন। ষষ্ঠ সন্তানের সংবাদ তার চক্ষুরিন্দ্রিয় গোচর হলো না।

(১৯৩৩-৩৪)

নিমন্ত্রণ

প্রিয় নির্মল,

নিমন্ত্রণের জন্যে বহু ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। একা আসতে হবে, না সস্ত্রীক? ওটা কি পুরুষদের পার্টি, না mixed? ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

তুমি জানতে চাও স্বস্ত্রীক আসবে, না পরস্ত্রীক। এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তবে এটা পুরুষদেরই পার্টি, কাপুরুষদের নয়। ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

রসিকতা রাখো। কাজের কথা হোক। যদি পুরুষদের পার্টি হয় তবে আমার স্ত্রী কী করে শুনলেন যে অন্য কোনো কোনো মহিলা যাচ্ছেন। ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

তোমার স্ত্রী ঠিকই শুনেছেন। মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র জায়গা হচ্ছে। তোমার স্ত্রীকেও নিমন্ত্রণ করা হবে। ইতি। তোমার

নির্মল

২

প্রিয় ঝরণা, শুক্রবার

তোমার নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় বসে থাকলে দেখছি প্রস্তুত হবার সময় পাব না। এক লাইন লিখে জানিয়ো তোমার মনে কী আছে। ইতি। তোমার

হৈমন্তী

প্রিয় হৈমন্তী,

তুমি আমার নিমন্ত্রণ-লিপি পাওনি শুনে অবাক। তবে কি আমি নিমন্ত্রণ করিনি? তুমি কিন্তু এসো নিশ্চয়। তুমি না এলে এত খাবার খাবে কে! ইতি। তোমার

ঝরণা

প্রিয় ঝরণা,

আমি বুঝি কত খাবার খাই! অমন ধারা চিঠি লিখলে আমি যাব না। ইতি। তোমার

হৈমন্তী

প্রিয় হৈমন্তী,

রাগ করলে তো? আমি জানতুম তুমি রাগী মানুষ। কিন্তু যাই হও, এতটা ছোটলোক হবে না যে নিমন্ত্রণ পেয়ে উপেক্ষা করবে। ইতি। তোমার

ঝরণা

প্রিয় ঝরণা,

ছোট লোক কারা? যারা স্বামীকে ডাকলে স্ত্রীকে ডাকতে ভুলে যায়, ডাকলে বলে এত খাবে। আমরা কেয়ার করিনে। বুঝলে? ইতি। তোমার

হৈমন্তী

প্রিয় সোমনাথ,

নিমন্ত্রণ ক্যানসেল করতে বাধ্য হচ্ছি। কিছু মনে কোরো না। ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

আমার স্ত্রীর কাছে লেখা তোমার স্ত্রীর চিঠি পড়তে দিচ্ছি। পড়ে ফেরৎ দিয়ো। দোষটা এ পক্ষের নয়। ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

আমার তো দশটি নয়, পাঁচটি নয়, একটিমাত্র স্ত্রী। দোষ যদি করেই থাকে তবু My wife—right or wrong! ইতি। তোমার

নির্মল

৩

প্রিয় নরেশ,

শনিবার

এই চিঠিগুলি পড়ে ফেরৎ দিতে ভুলো না। দেখলে তো কী রকম অযাচিত অপমান। তোমরা যদি ও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাও তবে বুঝব তোমরা আমাদের বন্ধু নও। ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

ব্যাপারটা সত্যি শোচনীয়। কিন্তু আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে ওরা ঠাওরাবে তোমরাই আমাদের উস্কে দিয়েছ। তার চেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা গিয়ে নির্মল ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মিটমাটের চেষ্টা করি। ইতি। তোমার

নরেশ

প্রিয় নরেশ,

তোমরা গিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করলে ওরা ঠাওরাবে আমরাই তোমাদের পাঠিয়েছি। আমরা তো দোষ করিনি, আমরা কেন দূত পাঠাব? তবে কি তোমার মতে আমরাই দোষী? ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

আরে না, না! দোষী কেউ নয়। ওটা একটা misunderstanding. অমন কত হয়। আমরা চললুম বোঝাপড়া করতে। ইতি। তোমার

নরেশ

পুনশ্চ। দুঃখের বিষয় বোঝাপড়া হলো না। ওদের ধারণা ওদের ছোটলোক বলে অপমান করা হয়েছে। ওরা ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাশা করে। চিঠিগুলি ফেরৎ পাঠাচ্ছি। নরেশ

প্রিয় ডাক্তার সেন,

এই চিঠিগুলি দয়া করে পড়ে দেখবেন। আপনি যদি আমাদের সহায় না হন তবে আমরা এখানকার সমাজে সুবিচার পাব না। অগত্যা আপনার ক্লাব থেকে ইস্তফা দিতে হবে। কেমন আছেন? নমস্কার। ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল

প্রিয় মিঃ বটব্যাল,

চিঠিগুলি পড়ে দেখলুম। আমি তো এসব মানসিক অসুখের treatment জানিনে। কলকাতা গেলে ডাক্তার গিরীন বোসের সঙ্গে কন্‌সাল্ট করে আসব। আপনি এই ক'টা দিন সবুর করুন। নমস্কার। আশা করি শারীরিক কুশল। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডাঃ সেন,

আমার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করলুম। অনুগ্রহ করে ক্লাবের ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করবেন। কাল নির্মলের ওখানে পার্টি। সেখানে ক্লাবের অন্য সকল সদস্য থাকবেন, থাকব না শুধু আমি, এ দৃশ্য অসহ্য। নমস্কার। ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল

প্রিয় মিঃ বটব্যাল,
রবিবার

কী দুর্ভাগ্য! পার্টি তো ক্লাবে নয়। একজন সদস্যের বাড়িতে। আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসবেন, আপনার গৃহিণী আমার গৃহিণীর সঙ্গে। আপনাদের জন্যে এক জোড়া নিমন্ত্রণপত্র ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছি! বিকেলে তৈরি থাকবেন। আমরা তুলে নিয়ে যাব। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডাঃ সেন,

অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা প্রস্তুত থাকব। ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল

৪

প্রিয় সোমনাথ,
সোমবার

কাল যখন পার্টির মাঝখানে ডাক্তার সেনের call এল তখন তিনি উঠে যেতে বাধ্য হলেন। তখন তুমি কেন উঠে গেলে? অন্দরে তোমার স্ত্রীও উঠলেন কেন? ওটা কোন দেশী ভদ্রতা? ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

কাল আমি তোমার বন্ধু হিশাবে যাইনি, গেছলুম ডাক্তার সেনের বন্ধু হিশাবে। তিনি যখন উঠলেন আমাকেও উঠতে হলো। অন্দরে আমার স্ত্রীকেও। আর কোনো কারণ না থাকলেও এটা তো বোঝ যে আমরা ডাক্তারের গাড়িতে গেছলুম, তাঁর গাড়ি না পেলে কার গাড়িতে ফিরতুম? ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

তোমার ও যুক্তি খোঁড়া। ডাক্তারের গৃহিণী যে ভাবে ফিরলেন তোমরাও সেই ভাবে ফিরতে। অর্থাৎ আমার গাড়িতে। তোমাদের ব্যবহার দেখে সবাই হেসেছে। খেতে বসে খাবার ফেলে ডাক্তারের সঙ্গে চোঁচা দৌড়! যেন তোমাদেরই বাড়িতে কোনো য়্যাকসিডেণ্ট! ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

তুমি তো আমার বেশ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। ম্যাকসিডেণ্ট কামনা করছ। যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে তবে তোমারই কুচিন্তায়। ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় ডাক্তার সেন, মঙ্গলবার

এই চিঠিগুলি পড়ে দেখবেন। আপনি যদি এর বিহিত না করেন তবে আমি কোনো উকীলের পরামর্শ নেব। অপমানের উপর অপমান। ইতি। আপনার

নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মিঃ কাঞ্জিলাল,

আপনি কিছুদিন সবুর করলে আমি কলকাতা গিয়ে ডাক্তার গিরীন বোসের সঙ্গে কন্‌সাণ্ট করে আসতে পারি। "স্বস্ত্রীক" "পরস্ত্রীক", "দশটি নয়, পাঁচটি নয়, একটিমাত্র স্ত্রী"—এসব যদি আদালতে যায় তবে খবরের কাগজের খোরাক জুটবে। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডাঃ সেন,

এ সব আপনি কোথায় পেলেন? তবে কি সোমনাথ আপনাকে আমার চিঠিগুলি দেখিয়েছে? তা যদি করে থাকে তবে দেখছি সমস্ত প্রকাশ করতে হবে। বিয়ের আগে সে যে সব কেলেঙ্কারি করেছে সে সব যদি শোনেন তবে লোকটাকে ক্লাবে ঢুকতে দিয়েছেন বলে অনুতাপ করবেন। ইতি। আপনার

নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মিঃ কাঞ্জিলাল,

আসুন আমার বাড়িতে চা খেতে আপনারা চার জনে। আমি মিটিয়ে ফেলি এই অরুচিকর ব্যাপার। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডাঃ সেন,

সোমনাথের জন্মেই আমাকে দু' দুটো আলাদা পার্টি করতে হয়। ওকে মহিলাদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমার স্ত্রী তো ওর ভয়ে ক্লাবে পর্যন্ত যান না। ইতি। আপনার

নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মিঃ কাঞ্জিলাল,

তা হলে আমার কিছু করবার নেই, আপনি উকীলের পরামর্শ নিন। কিন্তু তার আগে দু'বার ভেবে দেখবেন। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডাঃ সেন,

আমার ইস্তফাপত্র প্রেরণ করছি। ক্লাবের সদস্য থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ইতি। আপনার

নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মিঃ কাঞ্জিলাল,

আপনারা সবাই সমান ছেলেমানুষ। ক্লাবের কী অপরাধ! আপনার ইস্তফাপত্র নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হবে তখন আমি সমস্ত খুলে বলতে বাধ্য হব। তার চেয়ে আসুন আজ বিকেলে আমার সঙ্গে চা খেতে। মিঃ বটব্যালকেও আসতে লিখছি। মহিলাদের না আনলেও চলবে। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

৫

প্রিয় নির্মল, বুধবার

কাল ডাক্তারের ওখানে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। তুমি এলে না। শুনলুম আমার চরিত্র সম্বন্ধে এখনো তোমার মনে অবিশ্বাস আছে। কী করলে অবিশ্বাস দূর হবে বলতে পার? ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

ঠিকই শুনেছ। অবিশ্বাস দূর হবে কী করলে, বলব? যদি তুমি বিদ্যাসাগরী ধরনে মাথার চুল ছেঁটে চার্লি চ্যাপলিনের মতো তিন ভাগ গোঁফ কামাতে পার, যদি তুমি মাদ্রাসীদের মতো ধুতি কিংবা লুঙ্গী পরে টাই কলার আঁটতে পার, তা হলেই বিশ্বাস করে তোমাকে ঘরে ডাকব। ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

এই চিঠির সঙ্গে আলাদা একটি মোড়কে কামানো গোঁফ ও ছাঁটা চুল পাঠালুম। বিশ্বাস না হয় সশরীরে হাজির হতে রাজি। ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

য়্যাঁ! এসো, এসো, আজকেই বিকেলে। ইতি। তোমার

নির্মল

৬

প্রিয় সোমনাথদা, বৃহস্পতিবার

কাল তোমাকে দেখে এত খারাপ লাগল। কেন তুমি অমন করে সঙ সাজতে গেলে? এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলো। ইতি। তোমার নয়

ঝরণা

ঝরণা, ঝরণা, সুন্দরী ঝরণা,

কেন, তা কি তুমি বুঝতে পারনি? পাঁচ বছর তোমাকে চোখে দেখিনি, এক বছর এক শহরে থেকেও না। দেখে সুখী হয়েছি। তেমনি ঝরণাই আছো। থেকো। এ চিঠি রেখো না। ইতি। শুভানুধ্যায়ী

সোমনাথদা

সোমনাথদা,

তুমি এখন বিবাহিত। হৈম'র প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে। তার মনে না জানি কত কষ্টই হচ্ছে তোমার ঐ বিদ্ঘুটে চেহারা দেখে। তুমি আর এসো না। চিঠি ছিঁড়ে ফেলো। ইতি। হিতৈষিণী

ঝরণা

ঝুনু,

হৈম সমস্ত জানে। আমার চেহারা দেখে তোমার খুব খারাপ লাগবে, এই আনন্দেই সে আমাকে বাঁদর সাজিয়েছিল। বলেছে, আবার যদি আমি তোমাকে দেখতে যাই তা হলে আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেবে। সুতরাং আর যাব না। ইতি। তোমার কল্যাণার্থী

সোমনাথদা

৭

প্রিয় সোমনাথ, শনিবার

কাল আমার এখানে আবার পার্টি। এবার Mixed. এবার আমি আপনি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব আমার মোটরে। বিকেলে তৈরি থেকো। ইতি। তোমার

নির্মল

মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না

কফি খাওয়া আমার জীবনে সেই প্রথম। একটা হালকা কাঠের ছবি-আঁকা টিপয়ের উপর এক পেয়ালা কফি আর এক প্লেট বিলিতী মিষ্টি। কফিটা পেয়ালা থেকে পিরিচে ঢেলে বেশ একটু আওয়াজ করেই খেয়েছিলুম। তখন তো আমার ইনি ছিলেন না যে আদবকায়দায় ভুল ধরতেন।

মা শুনে বললেন, "গেল জাত! গেল ধর্ম!" তাঁর শুচিবাতিক মাত্রাতিরিক্ত। "কিরস্তান বাড়িতে কাফি খেয়ে এসেছিস। এর পরে শুনব ব্রাণ্ডি।" তিনি কানেই তুললেন না যে কফিটা চায়েরই মতো নেশাহীন পানীয়। "চায়ের মতো হলে হিন্দুরা খেত। কই, কেউ খায়, কখনো শুনেছিস?"

আমার দশ এগারো বছর বয়সে বাস্তবিক কখনো শুনিনি। তা বলে নোটনদিরা সত্যি ক্রিশ্চান ছিলেন না। ওঁরা আমাদেরই মতো হিন্দু। দোষের মধ্যে ওঁরা কফি খান, আর ওঁদের বাড়িতে ছোট জাতের লোক রাঁধে, আর ওঁদের মেয়ের অর্থাৎ নোটনদির বয়স যদিও উনিশ কুড়ি তবু বিয়ের নামগন্ধ নেই। তখনকার দিনে ওটা কল্পনাতীত।

বাবা বলতেন, "বিয়ের সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল কী একটা স্বদেশী মামলায়। নোটনও আর কাউকে বিয়ে করবে না।"

মা বলতেন, "হিন্দুর ঘরে এমন হয় বলে শুনিনি। ওরা কিরস্তান।"

তিনি ভুলেও ওঁদের বাড়ি যেতেন না, আমাদেরও যেতে দিতেন না। কে জানে আমরা কী মনে করে কী খেয়ে আসব, কোন মাংস ভেবে কোন মাংস! এই যে আমি নিষেধ না মেনে কফি খেয়ে এলুম কে বলবে ওটা কফি না ব্রাণ্ডি না মাংসের স্যুপ।

অথচ বাড়িটা খুব কাছেই। একটা মাঠ পেরিয়ে একটু ঘুরে যেতে হয়। বাংলো বাড়ি, চার দিকে নানা জাতের গাছ বিলিতী লতাপাতা ও ঝোপ। খুব কাছে হলেও আমার মতো বালকের চোখে কেমন যেন অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন, রহস্যময়। ও বাড়িতে কারো আসা যাওয়া না থাকায় ওখানে যে কী হতো তা নিয়ে খুব জল্পনা কল্পনা চলত।

নোটনদিকে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোতে দেখতুম না। কারো বাড়ি যাওয়া দূরে থাক নিজেদের বাগানে কি বারান্দায় তাঁর পা পড়ত না। বাইরের বাগানের ও বারান্দার কথা বলছি, ভিতরের নয়। যত দূর মনে পড়ে সেই কফি খাওয়ার দিন তাঁকে প্রথম দেখি।

আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুধু বললেন, "আরো ?"

আমি ঘাড় নাড়লুম। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তা জানতুম না। তিনি বোধ হয় উল্টো বুঝলেন, গম্ভীরভাবে আরো কয়েক রকম লজেঞ্জ দিয়ে গেলেন। কোনোটা রঙীন মার্বেলের মতো, কোনোটা স্বচ্ছ আমলকীর মতো। মুড়কির মতো এক রকম ছিল, তার কিছু আমি লুকিয়ে পকেটস্থ করলুম, সব যদি পেটস্থ করি তো সমবয়সীরা বিশ্বাস করবে না যে আমার কপালে ওসব জুটেছিল।

"কেমন দেখলি নোটনকে ?" মা সুধালেন।

"ভালো।" ও ছাড়া ও বয়সে আর কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করতে শিখিনি মেয়েদের বেলায়।

বাবার সঙ্গেই সেদিন ওঁদের বাড়ি যাওয়া। বাবা আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আমার এই ছেলেটির নাম খোকা। বইয়ের পোকা। আপনার এখানে তো মস্ত লাইব্রেরী। ও যদি মাঝে মাঝে আসে বই পড়তে—"

জ্যোতিবাবু মৃদু হেসে বললেন, "পোকা শুনে ভয় করে। যদি কাটে।" তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত দূর পড়েছি।

আমি লজ্জায় নিরুত্তর। বাবা বললেন, "বঙ্কিম বাকী নেই। গিরিশ শেষ করেছে। রবি ঠাকুরের বই চায়। সেই যিনি নভেল লিখে প্রাইজ পেয়েছেন।"

"নোবেল প্রাইজ", আমি সংশোধন করলুম।

তা শুনে জ্যোতিবাবু চমৎকৃত হলেন। "তাও জানো ? আচ্ছা, তুমি রোজ এসে রবিবাবুর বই পড়তে পারো। কেটো না কিন্তু।" তিনি শাসালেন।

সেদিন খান কতক ইংরেজী বাংলা পত্রিকা ধার দিয়ে ও কফি খাইয়ে তিনি আমার ভয় ভেঙে দিলেন। লোকটি যে আদৌ ভয়ঙ্কর নন সেটা আমি আর একটু বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলুম। তখন কিন্তু সব ছেলের মতো আমিও তাঁকে জুজুর মতো ডরাতুম।

ক্রমে ক্রমে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হলো। আমার মা কেন তাঁর বাড়ি যান না তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না। তাঁকেও বলতে পারলুম না যে, আমাদের বাড়ি আসবেন। জানতুম, মা যেমন ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন তাতে তাঁকে হয়তো অপদস্থ হতে হবে।

বইয়ের ভিড়ে হারিয়ে গেলুম। একটা ঘর যেন বই দিয়ে ঠাসা। আমার সাড়াশব্দ কেউ পায় না, বাড়ি ফিরেছি না চুপ করে পড়ছি খোঁজ করতে এসে নোটনদি সুধান, "খোকন, এখনো পড়ছ? কী বই ওটা! 'সোনার তরী!' বুঝতে পারো?"

আমি লজ্জায় নীরব থাকি। তিনি বলেন, "আমি তো পারিনে।"

তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে ফলমূল খাই। দেখি, তিনি যে কেবল বইটই পড়েন তা নয়, ব্যায়ামও করেন। এক জোড়া স্প্রিং ডাম্বেল ছিল তাঁর টেবলে, একটা চার্ট ঝুলছিল দেয়ালে। তিনি কাছা দিয়ে কাপড় পরতেন, মরাঠী ধরনে। বীরাঙ্গনা বলে মনে হতো। কেমন একটা শুষ্কতা ছিল তাঁর চুলে ও চোখে। তাঁর ঘরের এক কোণে পুজোর সরঞ্জাম। পুজোর পাত্রটি কোনো দেবদেবী না, একটি যুবক। যুবকটি বেশ তেজীয়ান। হয়তো একটু নিষ্ঠুর।

নোটনদি এক বেলা আহার করতেন, মাছমাংস খেতেন না, ব্রহ্মচারিণীর মতো থাকতেন। তবু লোকে বলত কিরস্তান। তাঁর বাবা জ্যোতিবাবু ছিলেন পরম শাক্ত। তাঁর খাওয়ার সময় আমাকে দেখলে ধরে নিয়ে গিয়ে মুরগী চাখতে দিতেন, বলতেন, "তোরা তো বৈষ্ণব। এটিও রামচন্দ্রের বাহন।"

মা শুনে বলতেন, "আমার এ ছেলেটা মেলেচ্ছ হবে।" মাতৃবাক্য ব্যর্থ হবার নয়। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

* * *

তার পরে কেমন করে কী হলো ভালো মনে পড়ে না। জীবনের সব পর্যায়ের স্মৃতি সমান তীক্ষ্ণ নয়। নোটনদিরা চলে যান আগে, জ্যোতিবাবু তার কয়েক মাস পরে। ইস্তফা দিলেন না অবসর নিলেন, ঠিক জানিনে। লাইব্রেরীর পড়া শেষ করে আমি তাঁদের বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধ করে এনেছিলুম। তাঁদের প্রস্থান আমাকে তেমন স্পর্শ করেনি।

ম্যাট্রিক দেবার আগে অসহযোগ করেছিলুম, কিন্তু পরীক্ষাটা পাঁচজনের

অনুরোধে দিয়েই ফেললুম। দিয়েই চললুম ভাগ্যপরীক্ষা করতে কলকাতা। বাবা একখানা চিঠি লিখে দিলেন জ্যোতিবাবুর নামে। জ্যোতিবাবুর চাকরি নেই। পদমর্যাদার মিথ্যে মুখোস খসে পড়েছে। দেখলুম তিনি চমৎকার লোক। যেমন হাসিখুশি, তেমনি স্নেহপ্রবণ। আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন সম্পাদক মহলে। শুরু হলো শিক্ষানবীশী।

খবর নিয়ে জানতে পেলুম নোটনদির বিয়ে হয়েছে সেই যুবকটির সঙ্গে। ভারত সম্রাটের মার্জনা পেয়ে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে তিনিও আন্দামান থেকে ফিরেছেন। ফিরে কিছু দিন বসে থেকে সম্প্রতি অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন। প্রায়ই মফঃস্বলে সফর করে বেড়ান। কলকাতায় থাকেন কম সময়। নোটনদি কিন্তু শাশুড়ী শ্বশুর ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতায়।

ঠিকানা জোগাড় করে গেলুম একদিন দিদিকে দেখতে। গড়পার না বেলেঘাটা ঠিক স্মরণ নেই। বাড়িটা পুরোনো ও ভাঙা, বাড়ির মেয়েদের পরনের কাপড় ময়লা ও মোটা। নোটনদি চরকা ঘটর ঘটর করছিলেন, আমাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের পরিবারের হালচাল, কেন কলকাতা এসেছি, কোথায় উঠেছি, এমনি কত কথা। না খাইয়ে ছাড়বেন না, কী করি! মেসের খাওয়া খেয়ে আমারও ন্যাড়ার মতো ভাব। খেতে বললে আঁচাবার প্রশ্ন তুলি। আর বস্তুত তখন আমি ন্যাড়াই ছিলুম। কারণ তার কিছু দিন পূর্বে আমার মাতৃবিয়োগ হয়।

খুব দুঃখ করলেন আমার মা নেই শুনে। বললেন, "আমার সাধ্য থাকলে তোমাকে আমি মেসে থাকতে দিতুম না, খোকন। কিন্তু—"

আমি বুঝতে পেরেছিলুম কিন্তু-র পরে কী। কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, "না, না, আমার অসুবিধে কিসের? মেসে কি কেউ থাকে না?"

নোটনদির সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না হলেও তাঁর মানসিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হলো। প্রিয়প্রাপ্তির আনন্দে সেই তাপসী অপর্ণা যেন ভিখারী শিবের অন্নপূর্ণা। মনের আনন্দ শরীরেও সঞ্চারিত হয়েছে। ভরন্ত গড়ন। শ্রীমন্ত আকৃতি। আমি প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

কথা ছিল কলকাতায় যতদিন থাকি মধ্যে মধ্যে দেখা করব ও খেতে পাব। কিন্তু মেসের খাওয়া তবু সহ্য হয়, চোদ্দ পয়সার হোটেলের খাওয়া একেবারে অরুচিকর। তার পরে ডাল রুটির দোকানে, চিঁড়ে মুড়ির দোকানে, মুখ বদল করতে করতে ক্রমে ক্রমে করতে হলো সজল উপবাস। ঘুরে ঘুরে শেষে

একটি কুঁচকি নিয়ে শয্যাশায়ী—মেসে নয়, অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একটি কুঠরিতে। কাজেই কলকাতা ছাড়তে বাধ্য।

কাকার কাকুতি মিনতি শুনে অসহযোগে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর কাছে থেকে কলেজে ভর্তি হই। মফঃস্বলের কলেজে। ভাগ্যপরীক্ষার সেইখানেই ইতি।

নোটনদির কথা অচিরেই ভুলে গেলুম। মনে রাখবার মতো তেমন কোনো কারণও ছিল না। তার পরে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমরা জন কয়েক সতীর্থ মিলে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয়ের নেতৃত্বে দিল্লী আগ্রা বেনারস বেড়াতে যাই। সারনাথে সাক্ষাৎ হলো জ্যোতিবাবুর সঙ্গে। তিনি কিছুদিন থেকে কাশীবাস করছিলেন, তাঁর সঙ্গে নোটনদিও। বললেন, "নোটন যদি শোনে তুমি কাশী এসেছিলে, ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে, তা হলে খুব দুঃখিত হবে।"

অগত্যা অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে জ্যোতিবাবুর টাঙ্গাতেই তাঁর কাশীর বাড়িতে গেলুম। দিদি আমাকে প্রত্যাশা করেননি, প্রথমটা চিনতে ইতস্তত করলেন। পরিচয় পেয়ে বললেন, "ওঃ! তুমি! খোকন!"

দেখলুম তাঁর কোলে একটি নতুন মানুষ এসেছে। মানুষটির নাম চামেলী। মা হয়ে নোটনদির চেহারা বদলে গেছে। হৃদয়ের স্নিগ্ধ মাধুর্য যেন শত ধারে ঝরে পড়ছে—চাউনিতে, কথায়, চলনে। খদ্দর টদ্দর নয়, সাধারণ গৃহস্থঘরে যা পরে তাই পরেছেন।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলুম, "কবে কলকাতা ফিরছেন?"

"ফিরব না বলেই এসেছি।" তিনি উদাস সুরে বললেন।

"কেন জানতে পারি?"

"গোপন করবার কিছু নেই।" তার পরে ভেঙে বললেন, "ওঁর সঙ্গে এক পথে চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অহিংসার ভেক পরে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে হিংসাবাদীর দল গঠন করা আমি পছন্দ করিনে। আমিও হিংসাবাদী, কিন্তু আমার মন মুখ এক।"

ঔৎসুক্য লক্ষ করে তিনি বললেন, "ওঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে ইংরেজের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ তখন যুদ্ধে সব কিছু ন্যায়সঙ্গত। শিবাজী যেমন আফজল খাঁর বিশ্বাস অর্জন করে তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করলেন তেমনি অহিংসার দ্বারা ইংরেজের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের ধ্বংস করতে হবে।"

আমি শিউরে উঠলুম। তিনি বলতে লাগলেন, "এই মতবাদ আমার বিবেকবিরুদ্ধ। যতদিন পেরেছি সহ্য করেছি, কিন্তু ঘাতকের চেয়ে অশ্রদ্ধা করি বিশ্বাসঘাতককে। কী করে সে অশ্রদ্ধা চেপে রাখি? এই নিয়ে শেষ কালে রাগারাগি হয়ে গেল। না হলেই ভালো হতো।"

তিনি হঠাৎ উঠে গেলেন। মনে হলো ওঘরে গিয়ে কাঁদলেন।

জ্যোতিবাবুর সেই টাঙ্গাওয়ালা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হোটেলে সাথীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাশী থেকে যাত্রা করলুম পাটলীপুত্র। নোটনদির স্মৃতি আবার ছায়া হয়ে গেল।

আরো তিন বছর পরে এলাহাবাদে গেছি নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় লক্ষ্যভেদ করতে। পথে বেনারসে নামতে হলো একজন বন্ধুর আগ্রহে। মনে পড়ে গেল নোটনদিকে, জ্যোতিবাবুকে। ভাবলুম, এখনো কি তাঁরা সেখানে আছেন? কে জানে! একবার দেখাই যাক না।

দেখা হলো নোটনদির সঙ্গে। কিন্তু এ কোন নোটনদি! এ তাঁর রুদ্রাণী রূপ। ভিতরে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলছে শাড়ির পাড়, সিঁথির সিঁদুর, হাতের রুলি। আমাকে বসতে না বলে চলে যেতে বললেন!

"খোকন, বড় অসময়ে এসেছ। এখনি এ বাড়ি খানাতল্লাস হবে। মাকে আর চামেলীকে নিয়ে বাবা কলকাতা রওনা হয়ে গেছেন। পুলিশ যদি দয়া করে আমিও রওনা হব জেল হাজতে।"

আমি তো তাজ্জব বনলুম। কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ার ধরে বসে পড়লুম। তখন তিনিও বসলেন। বললেন, "সময় থাকলে শোনাতুম সব কথা। আবার কবে দেখা হবে জানিনে। হয়তো এ জীবনে এই শেষ।"

আমার চোখ ছল ছল করছিল। তিনি কোমল স্বরে বললেন, "এতে মন খারাপ করবার কী আছে! যারা এ পথে পা দেয় তাদের পায়ে কাঁটা ফুটবেই তো। আমি তো এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই জীবন আরম্ভ করেছি।"

"কিন্তু আপনি না ও পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন, নোটনদি?"

"কে বললে! না, আমি আমার পথে ঠিকই আছি। ছেড়ে দিয়েছি আমার স্বামীর পথ। তুমি ভুল বুঝেছিলে।"

তিনি আমাকে এক রকম জোর করে তাড়ালেন। বাড়িটাতে আরো কয়েক জনের পায়ের শব্দ পাচ্ছিলুম। তারা ছিল নেপথ্যে।

তাড়াতাড়ি একখানা খামের উপর ঠিকানা লিখে তাতে এক টুকরো কাগজ

ভরে তিনি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "সামনে যে ডাক বাক্স দেখবে তাতে ফেলে দিয়ো, কাছে রেখো না।" এই বলে আমাকে এক ঠেলা দিলেন।

এর পরে আমি বিলেত যাই। নোটনদির যে কী হলো সে খবর জানতে পাইনে। জ্যোতিবাবুর কলকাতার বাড়ির নম্বরও ভুলে গেছলুম।

বিলেত থেকে ফিরে পুরো দস্তুর সংসারী হলুম, সমস্ত সংসারটা সংকীর্ণ হয়ে আপিস ও বাংলো এই দুই বিন্দুতে ঠেকল। দিন যায় আপিসের কাজে, রাত কাটে বাংলোয়, ছুটি ক্বচিৎ মেলে। এমন কি পূজোর ছুটিতেও আমি আটক, বড় দিনেও আমি বাঁধা।

নোটনদির নাম একবার যেন কাগজে পড়েছিলুম। শক্ত অসুখে ভুগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন কোন এক গ্রামে—সেখানেও অন্তরীণ। দিদিকে একখানা সহানুভূতি ভরা পত্র লিখি এমন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন যে দিনকাল, টেররিস্টের প্রতি সহানুভূতিকে কেউ হয়তো ভুল বুঝত টেররিজমের প্রতি সহানুভূতি বলে। মনের ইচ্ছা মনেই বিলীন হলো।

কয়েক বছর পরে কলকাতা গেছি এক দিনের ছুটিতে। এক বন্ধুর বাড়ি কী একটা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণটা দুপুরে। দেখি নোটনদি ও তাঁর স্বামী। দিদি যে আমার সাহেবী পোশাক সত্ত্বেও আমাকে চিনতে পারলেন এতে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। বলতে গেলে এটা আমার সাহেবিয়ানায় পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। সাহেবের মতো সাহেব হলে কি কেউ আমাকে বাঙালী বলে চিনতে পারত!

নোটনদি যখন শুনলেন যে আমি পরের দিন কলকাতা ছাড়ব তখন আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে একবার হাজিরা দিতে বললেন। আমার অন্য এনগেজমেণ্ট ছিল, গ্রাহ্য করলেন না।

অগত্যা যেতে হলো তাঁদের সেই শ্যামবাজারের বাড়িতে। সেটা জ্যোতিবাবুর বাড়ি। তিনি ইতিমধ্যে মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী বেঁচে। নোটনদি মার কাছেই থাকেন। তাঁর স্বামী করপোরেশনে চাকরি করে সাত বছরে তিনখানা বাড়ি করেছেন, কিন্তু স্বামীকে সহ্য হলেও স্বামীর উপদলটিকে দিদির সহ্য হয় না। কাজেই দুজনে আপোসে আলাদা হয়েছেন। চামেলী থাকে মার কাছে এক মাস তো ঠাকুমার কাছে এক মাস। দিদিও মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ি যান, কিন্তু থাকেন না। কানাঘুষা শোনা যায়, দিদির নাকি সতীন জুটেছে। অসামাজিক সতীন।

সন্ধ্যাবেলা বাঙালী সেজে দিদির ওখানে গিয়ে দেখি, আরে রাম রাম, সবাই সাহেব, হাফ সাহেব। আমি যেন হংসো মধ্যে বকঃ। ওটা অবশ্য ককটেল পার্টি নয়, কিন্তু যা চলছিল তা বিশুদ্ধ পানীয় জল নয়। অভ্যাগতরা চুরুট কিংবা সিগারেট টানতে টানতে এক এক বার গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলেন। খুব রাজা উজির মারছিলেন। পরে শুনেছিলুম এই মহাপুরুষরা নাকি লেফ্‌টিস্ট।

ব্যাপার দেখে দিদিকে বললুম, "আমি কিন্তু বেশীক্ষণ বসব না। আমার আর একটা এনগেজমেণ্ট আছে।"

তিনি তখন তাঁর দলবলকে বোঝালেন যে আমি তাঁর নিরুদ্দিষ্ট সোদর, প্রায় দশ বছর পরে আবির্ভূত হয়েছি, তাও এক রজনীর তরে। ভদ্র-লোকেরা বিদায় হলেন। আমিও দিদির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ পেলুম।

তিনি কোনো কালে এতটা শৌখীন ছিলেন না। পায়ের চপ্পল থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত সব ফ্যাশনেবল। চেহারাও আগের চেয়ে ঢের চলনসই। ফিগার আগের মতোই স্লিম।

আমার এনগেজমেণ্টের কথা তুলতেই তিনি কাকে যেন একটা হাঁক দিলেন, বললেন আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে আমার বিছানা বাক্‌স আনিয়ে নিতে। তার পর চিঠির কাগজ আনিয়ে বললেন, "লিখে দাও, অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার সেই এনগেজমেণ্ট ক্যানসেল করিতে বাধ্য হইলাম।" ধমক দিয়ে বললেন, "তোমার জন্যে আমার কমরেডদের সঙ্গে দুটো কাজের কথা কওয়া হলো না, আর তুমি কিনা যেতে চাও আড্ডা দিতে। আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, রাত বারোটা বাজবে, সেইজন্যে তোমার বিছানা আনতে পাঠালুম। কী জানি যদি এ বাড়ির বিছানা তোমার মতো সাহেব লোকের নামঞ্জুর হয়।"

সত্যি সেদিন রাত বারোটা বাজল। নোটনদি আমাকে সেই কাশ্মীর আখ্যান ব্যাখ্যা করে শোনালেন। আর বলে চললেন কারা কাহিনী অন্তরীণ প্রসঙ্গ। শেষে তাঁর বর্তমান মতবাদ, মনোভাব ও কাউকে যা বলেননি এমন একটি রহস্য।

"তুমি সাহিত্যিক বলেই তোমাকে বিশ্বাস করে বলা।" তিনি কৈফিয়ৎ দিলেন।

দিদি আমার লেখা পড়েননি। শুধু সাহিত্যিক খ্যাতির খবর পেয়েছিলেন। তাতে আমার সাহিত্যিক অভিমানে আঘাত লাগলেও সাহিত্যিক কৌতূহল উজ্জীবিত হয়েছিল।

*　　*　　*

যে স্বামীকে তিনি দেবতার মতো পুজো করতেন তাঁর কাছ থেকে কাশী চলে গিয়ে তিনি যা চেয়েছিলেন তা শান্তি। তাঁর কোনো প্রোগ্রাম ছিল না সে সময়। কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁকে ঘিরে একটি দল গড়ে উঠল। দলটি আন্তঃপ্রাদেশিক।

সে দলে যারা ছিল তাদের মধ্যে মাথুর বলে একটি যুবককে তিনি সকলের চেয়ে পছন্দ করতেন। মাথুর যখন বাংলা বলত তখন তাকে বাঙালী বলে ভ্রম হত, যখন মরাঠী বলত তখন মরাঠা বলে। ভারতবর্ষের সাত আটটা ভাষায় তার সমান দক্ষতা। তার রংটিও ছিল যথেষ্ট ফরসা। সাহেবী পোশাক পরলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে লোকে সেলাম করত।

তা ছাড়া মাথুর ছিল যেমন সাহসী তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতি। তার দোষের মধ্যে সে বলিষ্ঠ নয়। কিন্তু বাহুবলের কাছে সে হার মানত না। বার বার সে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছল।

এমন যে মাথুর, যার কাছে নোটনদির কিছুই লুকোনো ছিল না, সেই কিনা অবশেষে স্বীকারোক্তি করে দলশুদ্ধ লোককে ধরিয়ে দিল। কী কারণে সে অমন কাজ করল—মারের চোটে না মদের নেশায় না ধনের লোভে না রূপের কুহকে—তা এখনো অজ্ঞাত। মাথুর অবশ্য নেই, স্বীকারোক্তির প্রতিশোধ কাশীর গুণ্ডারা নিয়েছে। মাথুরের শব গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু স্বীকারোক্তির দ্বারা সে যে ক্ষতি করে গেছে তার জের এখনো চলছে। নোটনদির সহকর্মীরা এখনো জেল খাটছে।

স্বীকারোক্তির দ্বারা সব চেয়ে ক্ষতি করলে নোটনদির। কেননা এর পরে তিনি মানুষ মাত্রকেই অবিশ্বাস করতে শুরু করলেন। কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই, এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ঘোরতর সীনিক হয়ে উঠলেন। তাঁর মনের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের স্বাস্থ্যও গেল। বেঁচে থাকতে তাঁর রুচি ছিল না। চামেলীর জন্যেও না। তিনি মরতেই চেয়েছিলেন, আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিলেনও। এমন সময় তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে অন্তরীণ করা হয়। তাতেও কি তিনি বাঁচতেন! কিন্তু কেমন

করে তাঁর প্রত্যয় জন্মাল বুর্জোয়ারাই বিশ্বাসঘাতী, কিষাণ শ্রমিকরা নয়। বুর্জোয়াদের বিশ্বাস করে তিনি ভুল করেছেন, সে ভুল অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি আরোপ করা আরো ভুল।

কিষাণ শ্রমিকদের বিশ্বাস করতে শিখে তাঁর মনের অসুখ সারল। শরীরের ব্যাধিও ক্রমে আরোগ্য হলো। কমিউনিজম সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করে তাঁর সন্ত্রাসবাদে এলো সম্পূর্ণ অনাস্থা। যেদিন চাষী মজুর এক হয়ে বিপ্লব বাধাবে সেদিন সব আপনা আপনি হবে। সেই সুদিনের জন্যে নিজেকে ও নিজের দেশকে প্রস্তুত করা ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো কর্মপন্থা নেই। যাঁদের আছে তাঁদের তিনি অশ্রদ্ধা করেন। নিজের স্বামীকেও।

"উনি একজন ক্যাপচারওয়ালা। কংগ্রেস ক্যাপচার করব, করপোরেশন ক্যাপচার করব, কাউনসিল ক্যাপচার করব, এই তাঁর প্রোগ্রাম। কার জন্যে ক্যাপচার করব? একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপদলের জন্যে। কিসের জন্যে ক্যাপচার করব? মধু লুটবার জন্যে। এই গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতাকে আদর্শবাদ বলে চালিয়ে বাবুরা নিজেরাই চালমাৎ হয়েছেন। কম্যুন্যাল এওয়ার্ডের আর কোন মানে নেই, ভাই।"

"কিন্তু আপনার কমরেডদেরকে দেখে তো একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে মালুম হয় না, দিদি। ওঁরাও হয়তো একটা উপদল। কংগ্রেসে করপোরেশনে কাউনসিলে কর্তৃত্ব করবার একটা নতুন ছল খুঁজে পেয়েছেন। বিপ্লবের অভিপ্রায় নেই।"

"বাঃ! আমি কি ওদের সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি নাকি? ওরা হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া। ঐ মাথুরের মতোই একদিন ভেঙে পড়বে মারের চোটে কি মদের নেশায় কি ধনের লোভে কি রূপের কুহকে। আমার আশা ভরসা ওরা নয়, চাষী মজুর।"

"তা হলে চাষী মজুরদের সঙ্গে খুব মিশছেন, বলুন।"

তিনি মাথা নাড়লেন। "না, খুব না। মিশতে তো চাই, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়! যত দিন অন্তরীণ ছিলুম বেশ মিশেছি।"

এর পরে কখন এক সময় তাঁর রিকশাওয়ালার কথা উঠল। সভা সমিতিতে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে তিনি একটি রিকশা করিয়েছেন।

"আমার আশাভরসা ফাগুয়ার মতো মজদুর।" তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন। একদিন একটা মোটর লরীর সামনে পড়ে অক্কা পেয়েছিলুম আর

কী! ফাগুয়া তখন রিকশাটাকে এমন সুকৌশলে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল যে তেমন হাত সাফাই তোমার বুর্জোয়া ম্যাজিসিয়ানদেরও কর্ম নয়। ভারতের ভাগ্য ওরাই ঘোরাবে, তুমি দেখো। ওরাই ঘোরাবে ঠিক অমনি অবলীলাক্রমে। মনে হবে যেন একটা মিরাক্ল।"

ততক্ষণে আমার খাওয়া সারা হয়েছিল। আমি দিদির খাওয়া লক্ষ করছিলুম। একবেলা খাওয়ার অভ্যাস কবে ঘুচে গেছে, এখন তিনি রাত্রেও খান। যা খান তার সমস্ত নিরামিষ নয়, আমিষেই তাঁর সম্যক্ তৃপ্তি অনুমিত হলো। এ নিয়ে আমি একটু রসিকতা করতেই তিনি ফোঁস করে উঠলেন। "তোমরা পুরুষেরা সব খেতে পারো, আমরা মেয়েরা পারিনে। কেন, এ বৈষম্য কেন? আমি সাম্যবাদী, জীবনের আর দশটা ব্যাপারের মতো আহারেও।"

"কিন্তু আপনি তো এখনো সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি, নোটনদি। আমার সঙ্গে টেবলে খেলেন না, মেজের উপর আসন পেতে খেতে বসেছেন।"

"এটা এ বাড়ির দস্তুর। মা বেঁচে থাকতে দস্তুর বদলাবে না। তা বলে তো তাঁর মরণ কামনা করতে পারিনে!"

আহারাদির পর ফাগুয়ার গল্প আবার চলল। "সেদিন দেখি," তিনি বললেন, "ওদিক থেকে একটা রিকশা আসছে। তাতে চড়ে বসেছেন এক বিপুলকায় ভদ্রলোক, সঙ্গে এক বিরাট মোট। এসব লোকের জন্যে রিকশা নয়, মোষের গাড়ি রয়েছে। একটি মহিষাসুর বিশেষ।" দিদি হাসলেন।

"তার পর?"

"তার পর দেখলুম, বেচারা রিকশাওয়ালা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বার মতো ভঙ্গী করছে। নিশ্চয় মাইল চার পাঁচ টেনেছে। আমি ফাগুয়াকে বললুম, তোর জাত ভাই মরছে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস্! তোর শ্রেণীশত্রুর কী আসে যায়? একটা মরলে আরেকটাকে পশুর মতো হাঁকাবে।" যেই একথা বলা অমনি সে লাফ দিয়ে বাবুর ঘাড়ে হাত দিয়ে তাঁকে নামাল। বাবু তো রেগে টং। ছাতা উঁচিয়ে মারতে যান। যেমন মহিষাসুর তার শিং বেঁকিয়ে তেড়ে আসে। তখন ফাগুয়া তাঁর ছাতা কেড়ে নিয়ে তাঁরই পিঠে ভাঙল।"

আমি ফাগুয়ার য়্যাডভেঞ্চার কাহিনী শুনে বিশেষ পুলকিত হইনি। কাজটা বেআইনী। আর আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট।

"আঃ। সে একটা দৃশ্য! এমন তেজ আমি ভদ্রলোকের মধ্যে দেখিনি। সেইজন্যেই তো বিশ্বাস করি যে ভদ্রলোকেরা ওদের সঙ্গে পারবে না। শ্রেণী সংঘর্ষের দিন এক তরফা মার খেয়ে ভাগবে।" তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন।

শ্রেণী সংঘর্ষ বলতে কী বোঝায় ও কী বোঝায় না, এ বিষয়ে তাঁকে দু'চার কথা বলতে হয়েছিল। ওটা যদি একটা দেশব্যাপী দাঙ্গাই হতো তবে সব দেশেই সফল হতে পারত, কারণ সব দেশেই ফাগুয়ারা বলিষ্ঠ ও ভূয়িষ্ঠ। অথচ একমাত্র রাশিয়ায় সফল হয়েছে, তাও ফাগুয়াদের গুণে নয়, বহু জটিল যোগাযোগে।

নোটনদি শুনলেন না। তিনি তো বুঝতে চান না, তিনি চান না-বুঝেই বীর পূজা করতে। একদিন তাঁর বীর ছিলেন উৎপলাক্ষ, তাঁর স্বামী। আর একদিন তাঁর বীর হলো মাথুর, তাঁর সহকর্মী। এখন তাঁর বীর হয়েছে ফাগুয়া, তাঁর রিকশা চালক।

পরের দিন ফাগুয়া আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল, নোটনদি ট্যাক্সি করতে দিলেন না। লোকটা বাস্তবিক গুণী। গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে এমন জোর কদমে দৌড়য় যে প্রাচীন গ্রীকদের ম্যারাথন রেস মনে পড়ে যায়। গ্রীক স্ট্যাচুর মতো পরিপাটি গড়ন, তেমন সৌষ্ঠব একটা ঐশ্বর্য।

একটা টাকা বকশিষ দিতে গেলুম। হাত জোড় করে বলল, "মাইজীকা হুকুম নেহি।" কিছুতেই নিল না।

* * *

তার পরে তাঁর খোঁজ রাখিনি বহুকাল। নিজের ধান্দায় ব্যস্ত ছিলুম। মনে আছে একবার একখানা বিয়েব নিমন্ত্রণ পত্র এসেছিল, নিমন্ত্রণকর্তা উৎপলাক্ষ সেন। যার সঙ্গে চামেলীর বিয়ে তার নাম পড়ে মালুম হয়নি যে সে একটি কিষাণ বা মজদুর। ভাবছিলুম নোটনদিকে তামাশা করে লিখব, বুর্জোয়াকে জামাই করলেন কেন? কিন্তু কে জানে হয়তো এ বিয়ে দিদির অমতে। সেবার কিন্তু চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। একখানা শাড়ি কি বই, কী উপহার দিয়েছিলুম মনে নেই, সেও তিন চার বছর আগের ঘটনা।

সম্প্রতি মাস কয়েক আগে যখন কলকাতায় বোমার হুজুগ উঠল, গুজব শুনে মান্যবর মহোদয়রাও মধুপুর গিরিডিতে ধনজন সরালেন ও সপ্তাহান্তে সরে পড়তে লাগলেন, তখন নোটনদিও হঠাৎ আমাকে পত্রযোগে স্মরণ করলেন। লিখলেন, "ভাবছি আমরা দিনকতক তোমার ওখানে কাটিয়ে

সুবিধামতো একটা বাসা খুঁজে নেব তোমার শহরে। কোনো অসুবিধে হবে কি তোমার গৃহিণীর? তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ো। স্নেহাশীর্বাদ দিলে কি তিনি নেবেন?"

উত্তরে আমাদের দুজনের প্রণাম ও আমন্ত্রণ জানালুম। বাড়ির সন্ধানে লোক লাগিয়ে দিলুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখলুম নোটনদি এসেছেন বটে, কিন্তু বহুবচনের সার্থকতা নেই। জিজ্ঞাসা করলুম, "কই, আর কেউ আসেননি?"

"না, আর কে আসবে? মা নেই, তা বোধ হয় শোনোনি। চামেলীর বিয়ে হয়ে গেছে, তা বোধ হয় জানোনা, আর উনি—ওঁর চাকরি না ছাড়লে কলকাতা ছাড়তে পারেন না।"

"তা হলে," আমি জেরা করলুম, "কেন লিখেছিলেন, আমরা?"

"ওঃ!" তাঁর খেয়াল হলো। "আমরা মানে আমি আর আমার চাকর বাকর। তা কী করি, বলো। সব কটাই পালিয়েছে। ফাগুয়াটা শেষ পর্যন্ত ছিল। সেও যেই সাইরেন শুনেছে অমনি উধাও হয়েছে।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। লক্ষ করলুম তিনি আবার কিছু কাহিল হয়েছেন। তেমন জলুস নেই। তবে ফিগার ঠিক আছে।

কানে কানে বললুম, "নোটনদি, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

"নির্ভয়ে বলো।"

"বীরকে বিশ্বাস করতে পারলে কি?"

তিনি উত্তর করলেন না, আমার একখানা হাত ধরে হৃদয়ের চাঞ্চল্য নিঃশব্দে সঞ্চালিত করলেন।

তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, "বাউলরা গান গায়, 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না।' যা মিলবার নয় তা তোমার ভাগ্যে মিলবে কী করে?"

তিনি ভগ্ন কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলেন, "মিলবে কী করে।"

এ গল্পের এইখানে শেষ হলে নামকরণের মর্যাদা রক্ষা হয়। কিন্তু সত্যের মর্যাদা তার চেয়েও বড়। তাই নিচেরটুকু লিখছি।

নোটনদি থাকতে আমার বাড়িতে কয়েকজন মিলিটারি অফিসার call করতে এলেন। সকলেই ভারতীয়। কেউ ল্যাণ্ড ফোর্সের, কেউ এয়ার ফোর্সের, কেউ নেভীর। ঐ যাঃ, নেভীর উল্লেখ করতে হয় সর্বাগ্রে।

আমি ভুল করেছি। তাঁরা একটা স্পেশাল ট্রেনে ভারতময় রণকৌশল ও রণসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন।

নোটনদি তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। যেন কত কালের চেনা। তিনি তাঁর স্বহস্তে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করলেন, আমাদের কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। বিদায়ের সময় তাঁদের প্রত্যেকের কপালে চন্দনের টীকা দেওয়াও তাঁর নিজস্ব আইডিয়া। পরে যখন এই নিয়ে তাঁকে ক্ষেপালুম তিনি বললেন ভাবাকুল কণ্ঠে, "এরা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এরাই আমাদের রক্ষী। দেশ কাদের? যারা রাখতে পারে তাদের। এরাই এক দিন দেশকে জয় করে নেবে, স্বাধীন করে দেবে। এত দিনে আমার প্রত্যয় হলো যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হবে, হবে এই উপায়ে।"

তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু।

তখন তাঁকে বিরক্ত করলুম না। পরে এক সময় তাঁর কানে কানে বললুম, "নোটনদি, মিলেছে তা হলে কি তোমার মনের মানুষ?"

তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "মিলেছে।"

"কোন জন যদি জানতে চাই বেয়াদবি হবে?"

তিনি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "এয়ার ফোর্স।"

"তার মানে, পুরুষোত্তম লাল?"

তিনি সগৌরবে বললেন, "মেরে লাল।"

"তা যেন হলো" আমি জেরা করলুম, "কিন্তু মন কি মিলেছে?"

"তাও মিলেছে। শুনলে না কেমন ডাকছিল, এ বহিন! এ বহিন!"

আমি রঙ্গ করে বললুম, "আমিও তো কতবার ডেকেছি, ও দিদি! ও দিদি! আমার উপর তো তোমার কৃপাদৃষ্টি পড়েনি।"

তিনি serious ভাবে নিলেন। বললেন, "তুই কি পুরুষোত্তম?"

(১৯৪২)

দু'কানকাটা

১

সেই সব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল! মাঝে মাঝে ভাবি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। গৌরবর্ণ সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পিছনে যেমন রাহু তেমনি চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূলহস্তাবলেপে সুকুর গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাকয়েক মিলে একটা দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাতে এমন মোচড় দিয়েছিল যে আর একটু হলে হাতটা যেত। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

ক্বচিৎ তাকে একা পেতুম। পেলেই আমার বুকভরা মধু তার কানে ঢালতে ব্যগ্র হতুম, কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে আমার প্রকৃত পরিচয় জানল না, এ কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে অসময়ে তাই তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতুম। ভিতরে ঢুকতে ভরসা হতো না। কারণ সুকু একদিন আমাকে বলেছিল, "তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিসনে, খোকন।"

তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এই রূঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রূঢ়তা নয়। সুকুর বাবা মফঃস্বলে গেলে তার মা'র সঙ্গে তার ঠাকুরমা'র বচসা বাধত। খোঁপা আর এলোচুলের সেই বচসা শুনে পাড়ার লোক জুটত তামাশা দেখতে। এতে সুকুর মাথা কাটা যেত। তার বাবা যখন ফিরতেন, মা'র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুমা'র কাহিনী বিশ্বাস করতেন। মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুকুর ভাইবোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে লুকিয়ে কাঁদত। প্রতিবার মা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি

যাচ্ছেন, বাক্স বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতেন। রাজ্যের লোক জড় হতো তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকর এসে বলত, "মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।" তা শুনে ঝি বলত, "আর একটা দিন থেকে যাও, মা। কথা রাখো।" সেদিনকার মতো মা যাওয়া মুলতুবি রাখতেন। প্রতি মাসেই এই ব্যাপার। দুজনেই সমান মুখরা, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে গাড়ির অভাবে পেছপাও হলেন না, দুনিয়ার লোকের চোখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেড়িয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাইবোন লোকলজ্জায় তাঁর সাথী হলো না, কিন্তু সব চেয়ে লাজুক যে সুকু সেই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। কাজটা সুকুর মা ভালো করলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হলো। তিনি সেই হেঁট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মা'র কানে পড়ল তিনি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরবন্দী।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। শিবপুরহাটের তিন দিকে নদী। যে দিকে দু'চোখ যায় সে দিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। সুকু পা ছড়িয়ে বসে, গা ঢেলে দেয়। কত নৌকো স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনোটাতে চালের বস্তা, কোনোটাতে নতুন হাঁড়িকলসী, কোনোটাতে ঝুনো নারকেল। ছইয়ের চার কোণে মাকাল ফল দুলছে, ছইয়ের ভিতর ডাবা হুঁকো ঝুলছে। নৌকোর গায়ে কত রকম নক্সা। নক্সার কত রকম রং। নৌকোও কত রকম। জেলেদের ডিঙি, বারোমেসেদের নাও, গয়নার বোট, আরো কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকো, নৌকোর প্রাণ মাঝি, মাঝির প্রাণ গান। সুকু এক মনে গান শোনে, আর গুনগুন করে সুর সাধে। এতেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা লোক যাচ্ছিল মেলা দেখতে। রঘুনাথপুরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েৎ বৈষ্ণবরা নয়, নিমাইৎ বৈষ্ণবরাও আসে। নানা দিগ্‌দেশ থেকে জমায়েৎ হয় আউল বাউল দরবেশরাও।

এক দল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হলো না, সে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না। তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়ে-ছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসব শা-ও আছে, আবার মনু শা-ও আছে। সুকু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সম্বন্ধে দু'বার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে বাড়ে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "তোর হবে।" এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত, এতদিনে স্বাদ ফিরল! সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সায়র। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

"এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।"

মেলা ভাঙল। সুকুরও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনো সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুরহাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখু করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

২

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু থালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হলো সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ।

মামিমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেল সবিনয়ে বলে, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, জাত যাবে।" তার দশা দেখে তার মা দু'বেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, "মুসলমানের ভাত আরো কতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।"

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমা'র হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, "চল আমার সঙ্গে।" স্ত্রীকে বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।"

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরোনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিন রাত আসর জমালুম। এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার সুকু। ও বলে, আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভর্তি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস সুকু সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। কখন এক সময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘন বসতি, সুকুর তাতে অরুচি। সে যায় আউল দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরেফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল। তার খোঁজ নিতে এক এক জন এক এক দিকে বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামী ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। সুকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায় আমরা তো বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাঁহাবাজ চোরনী গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তার পরে একদিন নিশীথ রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

এক দল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হলো না, সে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না। তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়ে-ছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসব শা-ও আছে, আবার মন্নু শা-ও আছে। সুকু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সম্বন্ধে দু'বার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে বাড়ে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "তোর হবে।" এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত, এতদিনে স্বাদ ফিরল! সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সায়র। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

"এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।"

মেলা ভাঙল। সুকুরও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনো সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুরহাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখু করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

২

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু থালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হলো সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ।

মামিমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেল সবিনয়ে বলে, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, জাত যাবে।" তার দশা দেখে তার মা দু'বেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, "মুসলমানের ভাত আরো কতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।"

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমা'র হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, "চল আমার সঙ্গে।" স্ত্রীকে বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।"

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরোনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিন রাত আসর জমালুম। এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার সুকু। ও বলে, আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভর্তি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস সুকু সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। কখন এক সময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘন বসতি, সুকুর তাতে অরুচি। সে যায় আউল দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরেফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল। তার খোঁজ নিতে এক এক জন এক এক দিকে বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামী ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। সুকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায় আমরা তো বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাঁহাবাজ চোরনী গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তার পরে একদিন নিশীথ রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

সুকুকে আমরা সাবধান করে দিই যে কোন দিন চোর বলে সন্দেহ করে পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, "সন্দেহ মিটলে খুলেও দেবে।" আমরা বলি, "কিন্তু কলঙ্ক তো ঘুচবে না। মুখ দেখাবি কী করে?" সে বলে, "ওরা যেমন করে দেখায়।" ওরা মানে বাউল বোষ্টমরা।

সুকুর জন্যে আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। ওর সঙ্গে মিশতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হলো। প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এলো, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টার মশাই ছিলেন সুকুর বাবার বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোর্ডিংএ রাখতে। ওর বাবা একদিন ওকে বোর্ডিংএ রেখে এলেন। ওর তাতে আপত্তি নেই, বরং ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোর্ডিংএর পাশেই হেডমাস্টার মশায়ের কোয়ার্টার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যে সুকুর কাছে যাওয়া আসা করব সে সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেড মাস্টার মশাই একদিন স্বকর্ণে শুনলেন দুটি বালখিল্য বালক ফুর্তিসে গান করছে—

"যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব দড়ি।
দুঃখ রে যৌবন প্রাণের বৈরী।"

মশাই তো দুই হাতে দুজনের কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান ঐ দুটি প্রাণী অবিলম্বে কবুল করল যে সুকুই ওদের ও গান শিখিয়েছে। তখন তিনি সুকুকে তলব করলেন। সুকু বলল, "সব সত্যি। দোষ ওদের নয়, আমার।"

মশাই বললেন "গোল্লায় যদি যেতে হয় তবে সদলবলে কেন? তুমি একা যাও।" এই বলে একটা গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল আমরাও বাঁচলুম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। যাদের কাছে পাঠ নেয় তারা মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন, সেখানে তার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হলো। কিন্তু সে অঙ্কের খাতায় ইতিহাস ও ইতিহাসের খাতায় সংস্কৃত লিখে শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলল। এটা যে

তার ইচ্ছাকৃত তা নয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। আসলে তার মন ছিল না পাঠে।

সুকুর মা তার বাবাকে বললেন, "জানি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তারা এরকম স্থলে গিন্নীদের উপদেশ নিতেন।"

"শুনি তোমার উপদেশটা কী।"

"আমার ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সুকুর বয়স পনেরো হলেও ওর যেমন বাড়ন্ত গড়ন—"

সুকুর বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

৩

ম্যাট্রিকে সুকু ফেল করল। আমি পাশ। বাধ্য হয়ে আমাকে বড় শহরে যেতে হলো, ভর্তি হলুম কলেজে। চিঠি লিখে সুকুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হতো ছুটিতে।

দিন দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি "তুই", সুকু বলে "তুমি"। আমার কষ্ট হয়। ডাকলে আসে, না ডাকলে খোঁজ করে না। গেলে দেখা দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলে কথা কয় না। একদিন আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলেছিলুম, "সুকু, আমি কি তোর পর?" সে উত্তর দিয়েছিল, "তা নয়। আমি হলুম ফেল করা ছেলে। আর তুমি—"

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলুম, "তোর জন্যে আমার সব সময় দুঃখ হয়।"

"কিন্তু আমি তো মনে করি আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।"

বাউল ফকির দরবেশদের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দলে টানত। রতনে রতন চেনে। আমাদের চোখে সুকু একটা ফেল করা ছেলে, ওর পরকালটি ঝরঝরে। ওদের চোখে সুকু একজন ভক্ত। গুরুর কৃপা হলে একদিন পরমার্থ পাবে। আমাদের হিতৈষীপনার চেয়ে ওদের হিতৈষিতাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরোনো বন্ধু। বোধহয় তার চেয়েও বেশী। সুকু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকে তত নয়।

তাকে দিয়ে কথা বলানো একটা তপস্যা। গান করতে বললে দেরি করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশবার ঘোরায়।

সুকু নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী বলে দাবি করলেও আমার অগোচর ছিল না যে ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাক্ হচ্ছে। কাকে যে ভালোবেসেছে, কে যে সেই ভাগ্যবতী তা আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অনুমান করতুম কিন্তু পরে বুঝেছিলুম সে সব অনুমান ভুল।

নায়িকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। সুকু নিয়েছিল ওই সাধনা। প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাশক্তি সুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তি যখন জাগবে তখন প্রতি নারীই রাধা। যে কোনো নারীকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বে পৌছনো যায়। কিন্তু সে নারীর সম্মতি পাওয়া চাই। সুকু একজনের সম্মতি পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এই জন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোকদের সঙ্গে খায় দায়, গায় বাজায়, শোয়া বসা করে। ওকে নৌকো বাইতে, গোরুর গাড়ি চালাতে, ঘর ছাইতে দেখা গেছে। ওর বাবা সম্মানী ব্যক্তি। তাঁর মাথা হেঁট। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে ইতিমধ্যে তাঁর ছোটবৌ মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়বৌ আবার বাপের বাড়ি যান তবে আর একবার টোপর পরার মতো বল বয়স নেই। মুখে বলেন, "ওটাকে ত্যজ্যপুত্র করতে হবে দেখছি।" কিন্তু ভালো করেই জানেন যে সুকু তাঁর সম্পত্তির জন্যে লালায়িত নয়। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মজনু ফকির ওর গুরু। গুরুর উক্তি ও সুকুর প্রত্যুক্তি কতকটা এই রকম—

"বাবা, কাঁদতে জনম গেল। যদি সুখের পিত্যেশ পুষে থাক তবে আমার লগে আইসো না। আমি তোমায় সুখের নাগাল দিতে নারব।"

"আমি চোখের জলে মানুষ হয়েছি। কাঁদতে কি ডরাই?"

"সারা জনম কাঁদতে রাজি আছ?"

"আছি।"

"আমায় দুষবে না?"

"না, হুজুর।"

"তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয়

নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই 'না' বোলো না। তার ছলকলার অন্ত নেই। তেঁই তোমায় বলি, কাঁদতে জনম গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল।"

সুকু সেই যে ফেল করল তার পরে আর পরীক্ষা দিল না। তার পড়া-শুনা সেইখানেই সাঙ্গ হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা দিতে হলো, সে পরীক্ষা মাত্র একজনের কাছে। সে একজন তার নায়িকা। তার গুরুই তাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এইটুকু আমি জানি, এর বেশী জানিনে। আর যা জানি তা লোকমুখে শোনা, লোকের কথা আমি বিশ্বাস করিনে, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রবাদ আছে লোকের কথাই ভগবানের কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসে শুনি সুকু নিরুদ্দেশ। লোকে বলাবলি করছে সারী বোষ্টমী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি প্রথমে ছিল মোদকদের বৌ। অল্প বয়সে বিধবা হয়। পরে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবনে যায়, সেখানে বেশ কিছু কাল থেকে চালাক চতুর হয়। বৈষ্ণবটির কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে দেশে ফিরে সারী তাঁর বিষয়বাড়ি ভোগদখল করে। তারপর থেকে সুন্দর ছেলে দেখলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। গুণের মধ্যে সে গাইতে পারে অসাধারণ। গান দিয়েই প্রাণ মজায়। ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গাজমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সঙ্গে সুকুও। সুকুর বাবা থানা পুলিশ করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, "খোকন, তুমি তো পাশ করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেন অমন উচ্ছন্ন গেল! ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—" তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন।

সুকুর মা বললেন, "যে ছেলে মা'র সঙ্গে বনবাসী হয় সে কি তেমন ছেলে! আমার মন বলে সুকু আমার কোনো কুকাজ করেনি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!"

৪

পরবর্তী কালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোনো দিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোনো ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই স্বকুকে ও শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারি, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দী বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দু'চারটে ইংরেজী বুকনিও। হিন্দী ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি গায়িকা নায়িকা পেয়ে স্বকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দু'জন দু'জনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। স্বকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

স্বকুর মতো আরো অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমন কি স্বকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারো কারো লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে। হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়। স্বকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হলো না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু স্বকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, "এক দিন মা'র সঙ্গে গেছলুম, আজ তোর সঙ্গে যাব।"

সারী বলল, "আমি কি তোর মা!"

স্বকু বলল, "মাকে যেমন ভালোবাসতুম তোকেও তেমনি ভালোবাসি।"

সারী রসিয়ে বলল, "তেঁমনি?"

স্বকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "দূর! তেমনি মানে কি তেমনি?"

"তবে কেমনি?" সারী রঙ্গ করল।

"এমনি।" বলে স্বকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—

"আশা করি বান্ধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদী, তোর মনে কি এই সাধ ছিল!"

তার পরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারী ও শুক সেইখানে নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, "সই, তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়! ও যে তোর ছোট ভাইয়ের বয়সী।"

সারী বলে, "গোপালও ছিল গোপীদের ছোট ভাইয়ের বয়সী। কারো কারো ছোট ছেলের বয়সী।"

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, "আ মর! কার সঙ্গে কার তুলনা।"

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, "যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা!"

আসলে সারীর বয়স অত বেশী নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল। সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠিবদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। এক দিন শুক সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা সুকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ি। আহার সম্বন্ধে সুকুর বাছবিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রাঁধে খায়, শুধু ফটিকচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভালো, কিন্তু কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল সুকু তাদের একটি মেয়ের প্রীতিমুগ্ধ। সুকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন সুকুই অনুনয় করল, "চল, আমরা এখান থেকে যাই।"

সারী অভিমানের সুরে বলল, "কেন? আমি কি যেতে বলেছি?"

"না, তুই বলবি কেন! আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো!"

"কিসের উপর টান? জায়গার না মানুষের?"

এই নিয়ে কথাকাটাকাটি করতে সুকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এলো ফুরিয়ে। কারো কাছে তারা কিছু চায়ও না, পায়ও না, নিলে বড় জোর

চালটা আলুটা জ্বালানীর কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিংবা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, "চল আমরা শহরে যাই।"

সুকু বলে, "শহরে!" বলতে পারে না যে, শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বংশপরিচয় সুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ না কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

৫

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তর বঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো সেখানে টমটম বা একা গাড়ি চলে। টমটমওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ার এক ধারে পশুডাক্তারখানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত না পারদর্শী তার চেয়ে ওস্তাদ গানবাজনায় ও থিয়েটার করায়। সুকুর চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু'এক পরে যখন পশুদের ড্রেসার চাকরি খালি হলো তখন তিনি সাময়িক ভাবে সুকুকেই বাহাল করলেন।

সুকুর সারা দিনের কাজ হলো টমটমের ঘোড়া, চাষীদের গোরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চীৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় শখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলির হুকুম এলো। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হলো না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গানবাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসেছিল, সুতরাং এক কথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোনো ফল হলো না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন

টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি ডোম মুচি দোসাদ জেলে মালী প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান সঙ্গীতে পল্লী মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তার পর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এত দূর কুখ্যাত হলো যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে এক দিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। গণ্যমান্যরা শিউরে উঠলেন। ছি ছি! মেয়েমানুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হয়েছে। ছি ছি!

সুকু কাকার কথা শুনল না। ভালো ছেলে হলো না। তিনি অনেক করে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার দরুন সুকুকে তুষের আগুনে পুড়তে হলো।

সারীর বড় গয়নার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খেতেই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, ব্যথার ব্যথী বলে দ্বিগুণ লাগে। গানের প্রলেপ দিয়ে বুকের বেদনা ঢেকে রাখে। দিন কাটে।

এক দিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে এ কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাধল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ। ডাকল, "সারী। ও সারী।"

মিনিট পাঁচ সাত ডাকাডাকির পর দ্বার যদি বা খুলল কোথায় সারী! সারীর বদলে কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে হন হন করে চলে গেল। চলনটা মেয়েলি নয় মোটেই! সুকু ভেঙে পড়ল।

তার মনে হলো সে মরে যাবে, বাঁচবে না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে থাকল জানে না। যখন জ্ঞান হলো দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার পা ছুঁতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। স্বকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। দু'জনের একজনেরও চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। বুকে দুর্জয় রোদন। দু'জনেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল। "তা হলে এখন তুমি কী করবে?"

সারী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলল।

স্বকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

"বাড়ি ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে?"

স্বকু ভেবে বলল, "যেখানে তুমি সেইখানেই আমার বাড়ি।"

"কিন্তু দেখলে না? আমি যে বেশ্যা।"

"তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইনে।"

"আমি কে?"

"তুমি রাধা।"

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হলো। এবার ভেঙে পড়বার পালা তার। সে এমন কান্না কাঁদল যে স্বকুর মনে হলো তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনো তার গলায় দুলছিল এক ছড়া সোনার হার, সদ্য নির্মিত।

৬

কাকার চাল ব্যর্থ হলো। কিন্তু সারীর নামে যে সব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। স্বকুর পক্ষে মুখ দেখানো দায় হলো। কিন্তু নিরুপায়। টমটম পাড়ার টিটকারি সে গায়ে মাখে না, ছোটলোকের রসিকতা মাথা পেতে নেয়।

এমন করে তাদের বেশী দিন চলত না। দৈবক্রমে সে শহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে গান রেকর্ড করার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুক উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি তার

সাত আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তার পর সে সব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুমহলে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সরাসরি সারীকে লিখলেন কলকাতা আসতে।

সারী এলো, তার গান নেওয়া হলো। সে সব গানের আশাতীত আদর হলো। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারীর বরাতে জুটল সাহেবমহলের সুপারিশ। রেকর্ডের পর রেকর্ড করিয়ে সারী স্বনামধন্য হলো। তখন তাকে বাস উঠিয়ে আনতে হলো কলকাতায়। বলা বাহুল্য, সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তার পরে সারী পড়ল এক ফিল্মব্যবসায়ীর সুনজরে। তার রূপের জলুস ছিল না, কিন্তু রসের চেকনাই ছিল। ভালো করে মেক্ আপ করলে তাকে লোভনীয় দেখায়। যারা ফিল্ম দেখতে যায় তারা লোভনকে শোভন বলে ভুল করে। সে ভুলের পুরো সুযোগ পেল সারী। ডিরেক্টার তাকে পরামর্শ দিলেন ফিল্মী গান শিখতে। লোকসঙ্গীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সঙ্গীত শিখল। কণ্ঠের কৃপায় সে তাতেও নাম করল। ধীরে ধীরে সারী তারা হয়ে জ্বলল। চার পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিল্ম দেখল তারা জানল না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে এক দিন শুভলগ্নে সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ আশ্চর্য হলো না, কারণ সারীর আয় তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেঞ্জ থেকে ফিরছি। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। কোনোখানে একটিও বার্থ খালি নেই। বার কয়েক ঘোরাঘুরি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি এমন সময় একটা সার্ভেন্ট কামরা থেকে কে যেন আমাকে ডাক দিল, "খোকা? খোকা না?" আমি পিছন ফিরে দেখি সুকু।

ওর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে এক রাশ গোঁফ দাড়ি, গলায় একটা কালো কাঠের কি কালো কাচের মালা। ফিটফাট বেহারা চাপরাশির মেলায় ও নেহাৎ বেমানান। হাতে একটা একতারা না আনন্দলহরী ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

"প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু ধরো চিনে।"

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে স্বকু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে? জায়গা মিলছে না?"

আমি বললুম, "এত রাত্রে কে আমার জন্যে জায়গা ছাড়বে!"

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফার্স্ট ক্লাসে, যদিও আমার টিকিট সেকেণ্ড ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, "ও সারী। একবার খুলবে?"

সারীর বদলে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন স্বকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, "একটু কষ্ট করতে হবে এর জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু।"

ভদ্রলোকের মুখে পাইপ, হাতে ডিটেকটিভ নভেল ও পরনে সিল্কের স্লীপিং স্যুট। ভদ্রমহিলার পরনেও তাই, উপরন্তু রঙচঙে ড্রেসিং গাউন। তাঁরা বোধ হয় শয়নের উদ্যোগ করছিলেন।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হলো না। আমি উপরের বার্থে সসংকোচে নিদ্রার ভান করে পড়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোর বেলা আসানসোল স্টেশনে স্বকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে তার কাহিনী শুনলুম। বাকীটুকু বর্ধমানে ও ব্যাণ্ডেলে।

হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের আগে স্বকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?"

স্বকু উত্তর দিয়েছিল, "ও যে রাধা!"

(১৯৪৩)

হেঁয়ালি

আজকাল ডিটেকটিভ নভেল পড়তে আট বছরের খোকাদেরও দেখা যায়, তাদের মা'দের তো কথাই নেই। গিন্নীরা মনে করেন এতে তাঁদের উপকার হচ্ছে। ছদ্মবেশী চোর ডাকাতদের দেখলেই চিনবেন আর ধরিয়ে দেবেন। চোর ডাকাতেরও লেখাজোখা নেই। কে যে নয় তাই জিজ্ঞাস্য।

কেউ সদর দরজার কড়া নাড়লেই গিন্নীর মনে পড়ে, চোর নয় তো। তিনি মডার্ন মেয়ে, চোরের নামে ভয় পান না, বরং একটু উৎসুক হন। উৎকর্ণ হয়ে কড়া নাড়া শোনেন, তার পর সন্তর্পণে নেমে আসেন। দরজা খুলে দিয়ে প্রত্যাশা করেন রবিন হুড কি দস্যু মোহনকে দেখবেন, কিন্তু প্রতি বারই নিরাশ হন। আর একটু হলেই একটা রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটত। ঘটল না কেন? তবে কলকাতা শহরে থেকে সুখ কী?

রাগতভাবে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যান। দুপুর বেলাটা তিনি এক রকম একা। শাশুড়ী বুড়ো মানুষ, তাঁকে নিচে নামতে দেওয়া হয় না। তিনি ঠাকুরঘরে পড়ে থাকেন। তিনিও এক চোরের ধ্যান করেন। তাঁর নাম হরি। যিনি একে একে সব হরণ করেন। পরিশেষে প্রাণ।

সেদিন গিন্নী আন্‌মনা ছিলেন, কখন কে কড়া নাড়ল টের পেলেন না। খুব আস্তে আস্তে কড়ার আওয়াজ উপরে আসছিল। যেন কেউ কড়া নিয়ে খেলা করছে। মিনিট দশেক পরে তিনি কী একটা কাজে নেমে আসছিলেন, কড়া নাড়া শুনে চুপি চুপি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেলেন, একটুখানি ফাঁক করে দেখলেন একটি প্রিয়দর্শন যুবা, বয়স বিশ একুশ, সংকোচের সঙ্গে তাঁকে নমস্কার করছে।

"কাকে চান আপনি?"

"আপনি কি মিসেস খাশনবীশ?"

"আমিই।"

"মল্লিকা দেবী তাঁর ছাতা নিয়ে যাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ওহ্! আচ্ছা, আপনি ভিতরে এসে বসুন, আমি এনে দিচ্ছি।"

বসবার ঘরে ছোকরাকে বসিয়ে গিন্নী যখন উপরে গেলেন তখন সেটা ছাতার খোঁজে নয়, কারণ ছাতা তো ছিল নিচেই সিঁড়ির সুমুখে যেখানে

ছাতা জুতো ছড়ি ও টুপি রাখার জায়গা। গিন্নী ভালো করে সাজলেন। তাঁর এত দিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। চোর এসেছে।

মল্লিকা তাঁর ননদ, কলেজে পড়ে। কোনো দিন ছাতা নেয়, কোনো দিন নিতে ভুলে যায়। এই ভদ্রবেশী চোর আজ লক্ষ করেছে যে মল্লিকার হাতে ছাতা নেই। তাই ছাতাখানি হাতাবার ফন্দী এঁটে এসেছে। আজকাল ওরকম ছাতা দশ টাকার কমে পাওয়া যায় না। যার ছাতা সে আর কিনতে পাবে না, যার নয় তার দশ টাকা লাভ।

সাজতে সাজতে গিন্নীর বুদ্ধি খোলে, তাই সজ্জা। তা ছাড়া লোকটাকে দশ জনের সামনে ধরিয়ে দিতে হবে, তাদের খাতিরেও সাজতে হয়। গিন্নী কিন্তু দেরি করলেন না, কে জানে হয়তো ইতিমধ্যে লোকটা ছাতা সমেত সটকেছে।

"হাঁ, ছাতার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছে মল্লিকা। আপনি কি তার সহপাঠী ?"

"আজ্ঞে।"

"বাস্তবিক আপনার দয়ার শরীর। ক্লাস কামাই করে একখানা ছাতা নিয়ে যেতে আসে ক'জন !"

"দিনটা মেঘলা কিনা। ফেরবার সময় বৃষ্টিতে ভিজলে যদি আপনি বকেন সেইজন্যে তিনি কিছু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।"

"অ ! তাই বলুন !" গিন্নী এতক্ষণে নিশ্চিত বুঝলেন যে এ পাকা চোর বটে। কিন্তু পুলিশ যদি বিশ্বাস না করে। দশজনে যদি বলে, প্রমাণ কী ! তিনি দেখলেন ছাতাটা চোরের হাতে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াটাই সুবুদ্ধি।

"তা ছাতা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। ঐ তো ঐখানেই রয়েছে। কিন্তু দিনকাল খারাপ কিনা। তাই আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"কেন ? কেন ?" ছেলেটি রুদ্ধশ্বাসে সুধালো।

"ছাতাটা জাপানী। মল্লিকা আবার তাতে সুভাষ বোসের ছবি ছাপিয়ে রেখেছে। দেখেন নি ?"

"কই, না ? সুভাষ বোসের ছবি ঠিক জানেন ? সুভাষ মুখুজ্যের নয় ? আমরা আবার ফাসীবিরোধী কিনা।"

"সুভাষ বোসের ছবি চিনিনে ? আমরা আবার বসুপন্থী কিনা।"

"ভাবিয়ে তুললেন আমাকে! পুলিশে ধরবে তার জন্যে কেয়ার করিনে, কিন্তু আমার দল থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। বলবে পঞ্চম বাহিনীর চর।"

"তা হলেই দেখুন কত বড় ঝুঁকি! জাপানী চরদের তো ধরে ধরে গুলি করাও হচ্ছে শুনি। পুলিশকে একটু ভয়ডর করবেন।"

ছেলেটি সত্যি উঠল। ইতিমধ্যে গিন্নীর নজর গেছে তার পকেটের প্রতি। পকেটগুলো অস্বাভাবিক স্ফীত। কে জানে হয়তো বসে বসে কত কী পকেটে পুরেছে। হয়তো ছাতার চেয়েও মূল্যবান কিছু।

"ও কী! আর একটু বসুন। আমি কিন্তু আপনারই মতো ফাসীবিরোধী। আপনাদের ইশ্‌তাহার পেলেই চুরি করে পড়ি। এবারকার আওয়াজটা কী? গোপন মজুতদারকে জব্দ করো। না আর কিছু? একবার কেমন মজা হয়েছিল শুনবেন? ওঁর চোখ আবার ভালো নয় কিনা। উনি পড়লেন গোপাল মজুমদারকে জব্দ করো।"

"এবার আমরা পাকিস্থানের জন্যে কোমর বেঁধেছি।"

"হাঁ, তিন হাজার বছর পরে আবার এ দেশ পাখিস্থান হতে চলল। উনি বলছিলেন মহাভারতে নাকি লেখা আছে যে বাঙালীরা পাখি আর বেহারীরা গাধা! আর মান্দ্রাজীরা নাকি চেরপাদা, অর্থাৎ সাপ!"

"কই, তা তো কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না?"

"ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি করে। তিন হাজার বছর পরে পাখিস্থান। সবই প্রগতির খেলা। কিন্তু আমি বলছিলুম কী। আপনার পকেটে যদি কোনো ইশ্‌তাহার থাকে তো আমাকে একটু দেখতে দেবেন?"

"নেই। থাকলে দিতুম।"

"ওগুলো তবে কী? ঐ যে, ঠেলে বেরোচ্ছে।"

ছেলেটি তার ডান দিকের পকেট ঝেড়ে দেখাল। সিগরেট। দেশলাই। বাঁ দিকের পকেটে ছিল মনি-ব্যাগ, চশমার খাপ, রুমাল।

গিন্নী হতাশ হলেন। না, চোর নয়। বেচারাকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "মল্লিকাকে বুঝিয়ে বলবেন আমার দোষ নেই।"

কিন্তু তার পরেই কী জানি কেন তাঁর সন্দেহ হলো যে কী যেন ছিল, কী যেন নেই। তিনি বসবার ঘরে ঢুকে খানাতল্লাস করে দেখলেন একটা আলবাম উধাও, একটা টাইমপীস নিখোঁজ, একটা হাতীর দাঁতের তাজমহল নিরুদ্দেশ। আরো কিছু গেছে কি না চিন্তা করতেই তাঁর মাথা ঘুরল, তিনি

সেই ঘরেই শুয়ে পড়লেন। ছেলেটার নামধাম বিন্দুবিসর্গ জানেন না। পুলিশে খবর দিয়ে ফল কী!

মল্লিকা যখন বাড়ি ফিরল তিনি তাকে এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন, "ছাতার জন্যে কাকে পাঠিয়েছিলে, তার নাম ঠিকানা জানতে পারি?"

"কই, আমি তো কাউকে পাঠাইনি? কে এসেছিল?"

"চোর গো চোর। আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল তোমার নাম করে। তোমার সহপাঠী বলে পরিচয় দিল। দেখতে সুন্দর। বয়স বিশ একুশ। রেশমের পাঞ্জাবী গায়ে। গলায় সোনার হার। চোখে চশমা। সিগরেট খায়। দাড়ি-গোঁফ কামানো। জুল্‌পি রাখে।"

"চিনেছি, চিনেছি। কিন্তু সে আমার সহপাঠী হতে যাবে কেন? সে তো এই পাড়ারই একটা বকাটে ছোঁড়া। প্রায়ই দেখি। কিন্তু কী তার নাম, কোন রাস্তায় বাড়ি অত খবর রাখিনে।"

"তবে আসুন তোমার দাদা।"

কর্তা এসে সব শুনে বললেন, "ভালো করে খুঁজেছ?"

"ভালো করে খোঁজা কাকে বলে? তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে বিশ্বাস না করো তবে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

তিনি আর এক দফা খানাতল্লাস করলেন। টাইমপীসটা পাওয়া গেল বুক শেল্‌ফের পিছনে। হাতীর দাঁতের তাজমহলটা চেয়ারের তলায়। কিন্তু আলবামটা উদ্ধার হলো না। কর্তা বললেন, "আছে কোথাও। কাল একবার কার্পেট উঠিয়ে দেখতে হবে।"

গিন্নীও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। দুটো জিনিস যখন মিলল তখন তৃতীয়টাও মিলবে। তা হলে চোর নয়। যাক্, বাঁচা গেল। কিন্তু আফসোসও হলো। ঘটনাটা ঘটি ঘটি করে ঘটল না। অত বড় একটা রহস্য জলের মতো সোজা হয়ে গেল।

দেওর যখন ফিরল হেসে বলল, "বৌদির যা আক্কেল। লোকটা কোনখান দিয়ে চোরাই মাল নিয়ে যেত শুনি? পকেট তো দেখিয়েছে।"

পরের দিন ঠিক ঐ সময়টিতে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। গিন্নী যেন জানতেন যে অমন হবে, তাই আগে থেকে সেজে রয়েছিলেন।

যুবকটি ঘটা করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "ইশ্‌তাহার পড়তে চেয়েছিলেন। এনেছি। এর মধ্যে ডিমিট্রভের গোপনীয় নির্দেশ আছে।

আপনার পড়া হয়ে গেলেই আমি ফেরৎ নিয়ে যাব। আমি ততক্ষণ বাইরে দাঁড়াই।"

"না, না। বাইরে কেন? আপনি ভিতরেই আসুন।"

আলবামটা সকালবেলাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল তবে? এই সুদর্শন যুবকটিকে আর সন্দেহ করাও যায় না। সামান্য একটা আলবামের জন্যে এ কখনো অতটা নিচে নামবে না। রহস্য! কিন্তু রহস্যেও আনন্দ আছে, যদি বেশী লোকসান না হয়। গিন্নীর মেজাজ ভালোই ছিল।

"পড়তে বেশ লাগছে কিন্তু। ইচ্ছা করে সবাইকে একবার করে পড়াতে। তা আপনি তো ফেরৎ না নিয়ে নড়বেন না।"

"আমি নড়তে চাইনে, আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা পড়তে পারেন। কিন্তু দোহাই আপনার, কাউকে এসব পড়তে দেবেন না। দেখছেন না, উপরে লেখা আছে মোস্ট সীক্রেট। এ হলো খাস রাশিয়ার ছাপা। কলকাতায় মাত্র পাঁচ কপি এসেছে। আমরা এখনো এর নকল তৈরি করবার সময় পাইনি।"

"আচ্ছা, আমি কাউকে পড়তে দেব না। কিন্তু নকল লিখে নিতে পারি?"

"তা পারেন বোধ হয়। কী জানি, আমি ঠিক জানিনে।"

"আমি উপর থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। নকল করব আর আসব। আপনি ততক্ষণ সিগারেট খেতে পারেন। আপনার নিজেরটা না, আমাদেরটা। কেমন, আপত্তি আছে?"

"ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, তবে কিনা পার্টির আপত্তি থাকতে পারে। তা আপনি সেজন্যে ভাববেন না, আমার যথেষ্ট প্রভাব আছে।"

গিন্নী যখন ফিরে এলেন তখন চমকে উঠলেন হারানো আলবামটা যথাস্থানে লক্ষ করে। এ কি কখনো হতে পারে যে আলবামটা বরাবর ঐখানেই ছিল! তবে এলো কী করে? আনলে কে?

"আলবামটা—"

"হাঁ, আমিই অপরাধী। নিয়ে গেছলুম আপনাকে না বলে। কিন্তু ক্ষতি করিনি। বরং আরো কয়েকটি ফোটো জুড়ে দিয়েছি।"

তিনি হাঁ করে দেখলেন যে মল্লিকার স্ন্যাপশট বিশ বাইশখানা আঁটা হয়েছে। তবে যে ছুঁড়ি বলে সহপাঠী নয়, নাম জানিনে!

"এসব কার তোলা ? আপনার ?"

"অধমের।"

"নাম জানতে পারি ?"

"নিশ্চয়। আমার নাম জ্যোৎস্না রায়।"

"আপনি মল্লিকার সহপাঠী তো ঠিক ?"

"সে আর বলতে ? এক বছর এক সঙ্গে পড়ছি।"

"কিন্তু ও যে বলে সহপাঠী নন।"

"বোধ হয় স্বীকার করতে চান না। আমাদের রাজনীতি এক নয়।"

"ওহ্! তাই বলো। তুমি বলতে পারি ?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তুমি ওকে ভালোবাসো ?"

"তা তো বলিনি। 'হাঁ' বললেও ভুল হবে। 'না' বললেও ভুল হবে। আমরা এক ক্লাসে পড়ি। আলাপ পরিচয় আছে। এই পর্যন্ত বলা যায়।"

"বুঝেছি। তুমি কমিট করতে চাও না। কিন্তু আমাকে গোপনে বলো দেখি, সত্যি ওকে ভালোবাসো কি না।"

"গোপনে বলার অধিকার যদি পাই তবে যা বলব তা শুনে সহ্য করবেন কি ? আমার তো মনে হয়, না বলাই নিরাপদ।"

"খুব সইতে পারব। যদি বলার বাধা না থাকে।"

"বাধা যা ছিল সে তো আপনি নিজেই সরিয়ে নিলেন। কিন্তু আমার মুখে বাধে। থাক বলব না।"

"না, তুমি বলো। আমি কিছু মনে করব না।"

"আমি আরেক জনকে ভালোবাসি। সে আপ—"

"কী!"

"আমাকে মাফ কোরো, অনীতা। আমি চললুম।"

যুবক সত্যি ঝপ করে চলে গেল। অনীতা মূঢ়ের মতো বসে থাকলেন। একবার দাঁড়ালেনও না। ইশ্‌তাহার রইল তাঁর হাতেই। কতক্ষণ পরে চোখে পড়ল জ্যোৎস্না তার চশমাটি ফেলে গেছে।

এবার চুরি নয়। নিয়ে যায়নি কিছু। দিয়ে গেছে এমন একটি কথা যা শুনলে গিন্নী মানুষেরও প্রথম বয়স ফিরে আসে। মনে হয়, এখনো তরুণ আছি। নয়তো তরুণের উক্তি মিথ্যা। মিথ্যা ? মিথ্যা বলে তার লাভ ?

সে তো বলতে চায়নি। বলতে আসেওনি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়েছে। সাপের দোষ কী?

অনীতার বয়স সাতাশ। ছেলেপুলে হয়নি বলে আরো কম দেখায়। কেউ কেউ তাঁকে মল্লিকার সমবয়সী বলে ভ্রম করেছেন। এ ছোকরা যে তাই করে বসে আছে তা তো স্পষ্ট। মা গো, বলে কি না, আমি আপ—

অনীতা লজ্জায় জিব কাটলেন। এ কি কখনো সম্ভব! কিন্তু সম্ভব নয়ই বা কেন? কথায় বলে, ভালোবাসা অন্ধ। যার যাতে মজে মন। থাক, ভেবে কাজ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। এর পরে যখন ও চশমা নিতে আসবে তখন ওকে বিনা বাক্যে বিদায় দিতে হবে।

তা বলে চশমাটা বসবার ঘরে ফেলে রাখা যায় না। যত্ন করে তুলে রাখা উচিত। পরের জিনিস। যদি হারিয়ে যায়? আর ঐ আলবামখানাও ওখান থেকে সরাতে হবে। অনীতা ওগুলি নিয়ে বাক্সয় বন্ধ করলেন। আর অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বয়সের চিন্তায় বিভোর হলেন। বয়স বাড়ছে না কমছে? বয়স তো সৃষ্টিছাড়া নয়, আর সমস্ত বিষয়ের মতো রিলেটিভ। কমছে বললে কিছুমাত্র অসত্য হয় না। বাড়ছে বললেও তাই। সাতাশ বছর একটা কথার কথা। কেউ কুড়িতেই বুড়ী। কেউ সাতাশেও ষোড়শী। জ্যোৎস্না তা হলে তামাশা করেনি। কেনই বা করবে? লাভ?

ইশ্‌তাহার পড়ে খাসনবীশের চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কী। তিনি বললেন, "সর্বনাশ! আমি এই মুহূর্তে চললুম শ্যামাপ্রসাদের কাছে। বক্তৃতার সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে।"

এই বলে তিনি আঙুলে গোনা শুরু করলেন। "উজবেকিস্থান। কাজাকস্থান। তুর্কমেনিস্থান। তাজিকস্থান। চার চারটে স্থান নিয়ে ওদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। চায় আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পশ্চিম পাকিস্থান। তাই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, ওহে রেড ইণ্ডিয়ান কমরেডগণ, তোমরা মুসলিমদের উস্কে দাও, উঠে পড়ে লাগো! ইংরেজরা বলে, ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল। আমরা বলি, ডিভাইড য়্যাণ্ড সোয়ালো। পাকিস্থান গ্রাস করে হিন্দুস্থানে দাঁত বসাব।"

তিনি দন্তবিকাশ করলেন! কিন্তু সত্যি সত্যি তিনি শ্যামাপ্রসাদের সন্ধানে চললেন দেখে অনীতা বললেন, "ও কী? চা খাবে না?"

"আর চা! চায়ের সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মোগলের নাতিরা যোগ দিলে খানা খাইয়ে ছাড়বে। একমাত্র ভরসা ইংরেজের নৌবল আর মার্কিনের বায়ুবল।"

"তার মানে তুমি স্বাধীনতা চাও না।"

"কখন বললুম ও কথা! স্বাধীনতার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।"

"আমি তো জানতুম তুমি বামপন্থী।"

"একশো বার। তা বলে জাত ধর্ম টিকি পৈতে জমি জায়গা সুদ মুনাফা ছেড়ে দেব! একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি!"

অনীতা দেখলেন তর্কে ফল নেই। বললেন, "যা ভালো মনে করো তা করো। কিন্তু ডিমিট্রভের সার্কুলারখানা যদি কোনো গতিকে পুলিশের হাতে পড়ে তা হলে বাড়ি সার্চ হবে, যেন খেয়াল থাকে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যা হয়। খাসনবীশ এতটুকু হয়ে গেলেন।

"কই, চা কোথায়! তখন থেকে জল ফুটছে তো ফুটছেই। এ কী রকম চা খাওয়া! নিয়ে এসো।"

"চায়ের সময় আছে তা হলে?"

"হুঁ! স্বামীর সঙ্গে ইয়ার্কি!"

"তা তুমি অতটা উত্তেজিত হবে জানলে আমি তোমাকে ও ছাই পড়তে দিতুম না। আমার তো বেশ মজা লাগে ভাবতে যে আবার আমরা মোগল রাজত্বে বাস করব। পদবী যার খাসনবীশ সে তো আধা মুসলমান।"

"কাল থেকে আমি ওর বদলে শর্মা লিখতে আরম্ভ করব। প্রভঞ্জন শর্মা কি নেহাৎ খারাপ শোনায়?"

"আমি কিন্তু মিসেস খাসনবীশ থেকে যাব। মিসেস শর্মা যেন মিসেস পুরুষ। বীভৎস শোনায়।"

খাসনবীশ ক্রমে প্রকৃতিস্থ হলেন।

আলবামখানা তাঁর স্ত্রী তাঁর দৃষ্টিগোচর করেননি। রাত্রে এক সময় ননদকে দেখিয়ে বললেন, "এসব কার স্ন্যাপশট?"

"ওমা…" মল্লিকা যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল।

"আমার কাছে তোমার গোপন কিছু ছিল না বলেই জানতুম। এখন দেখছি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।"

"তোমার পায়ে পড়ি, বৌদি। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি।

আমি ওর নাম পর্যন্ত জানিনে। রাস্তায় আটক করে বলে, এক সেকেণ্ড দাঁড়ালে কৃতজ্ঞ রইব। এক সেকেণ্ড। ব্যস। ওর মধ্যেই ওর ফোটো তোলা হয়ে যায়। তার পরে আমি আমার পথে, ও ওর পথে। ফোটো কেমন উঠল তাও কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি। বাক্যালাপই নেই। নিজের ফোটো নিজের চোখে এই প্রথম দেখছি, বৌদি, তুমি বিশ্বাস করো।"

"জ্যোৎস্না রায় তোমার সহপাঠী নয়?"

"জ্যোৎস্না রায় বলে কোনো ব্যাটা ছেলে আছে এই প্রথম শুনলুম।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে, মল্লিকা!"

"তুমিও আমাকে!"

"তা হলে কি লোকটা মিথ্যুক?"

"পাগলও হতে পারে।"

"চোর। মিথ্যুক। পাগল। কোনটা ঠিক?"

"সব ক'টাই বোধ হয়।"

"না, ভাই, তুমি যাই বলো না কেন, ও চোর নয়। মিথ্যুক হলে আশ্চর্য হব, কেননা মিথ্যা বলে তার কোনো লাভ নেই। হাঁ, পাগল হওয়া সম্ভবপর। এক রকম পাগল আছে তাদের বলে সেয়ান পাগল। তাই, তাই হবে।"

সমস্যার সমাধান যে এত সোজা ওতে অনীতার রহস্যবোধ পীড়িত হলেও মনের ভার নেমে গেল। তিনি মল্লিকার কাছে মাফ চাইলেন।

এর পরের দিন তিনি কান পেতে বসে থাকলেন কখন কড়া নড়ে, কখন পাগলটা আসে তার চশমাটা নিতে। কিন্তু পাগলের নাম ভোলা। সেদিন সে এলোই না। তারপরের দিনও না। তার পরের দিন? না, সেদিনও না।

এমনি করে এক মাস কেটে গেল। অনীতা আর প্রতীক্ষাও করেন না, প্রত্যাশাও করেন না। মল্লিকাও আর তাকে দেখতে পায় না পথে। পাগল কি তা হলে পাড়া বদল করল? কে জানে, হয়তো পাগলা গারদেই গেছে।

একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি কড়া নাড়ার আওয়াজ এলো। অবিকল সেই শব্দ। অনীতা তখন প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু পাছে পাগল পালায় তাই তাঁর সাজ করা হয়ে উঠল না। এলো চুলে, ময়লা কাপড়েই তিনি তর্ তর্ করে নেমে গেলেন। দরজা খুলে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন।

"নমস্কার।"

"আর চা! চায়ের সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মোগলের নাতিরা যোগ দিলে খানা খাইয়ে ছাড়বে। একমাত্র ভরসা ইংরেজের নৌবল আর মার্কিনের বায়ুবল।"

"তার মানে তুমি স্বাধীনতা চাও না।"

"কখন বললুম ও কথা! স্বাধীনতার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।"

"আমি তো জানতুম তুমি বামপন্থী।"

"একশো বার। তা বলে জাত ধর্ম টিকি পৈতে জমি জায়গা সুদ মুনাফা ছেড়ে দেব! একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি!"

অনীতা দেখলেন তর্কে ফল নেই। বললেন, "যা ভালো মনে করো তা করো। কিন্তু ডিমিট্রভের সার্কুলারখানা যদি কোনো গতিকে পুলিশের হাতে পড়ে তা হলে বাড়ি সার্চ হবে, যেন খেয়াল থাকে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যা হয়। খাসনবীশ এতটুকু হয়ে গেলেন।

"কই, চা কোথায়! তখন থেকে জল ফুটছে তো ফুটছেই। এ কী রকম চা খাওয়া! নিয়ে এসো।"

"চায়ের সময় আছে তা হলে?"

"হুঁ! স্বামীর সঙ্গে ইয়ার্কি!"

"তা তুমি অতটা উত্তেজিত হবে জানলে আমি তোমাকে ও ছাই পড়তে দিতুম না। আমার তো বেশ মজা লাগে ভাবতে যে আবার আমরা মোগল রাজত্বে বাস করব। পদবী যার খাসনবীশ সে তো আধা মুসলমান।"

"কাল থেকে আমি ওর বদলে শর্মা লিখতে আরম্ভ করব। প্রভঞ্জন শর্মা কি নেহাৎ খারাপ শোনায়?"

"আমি কিন্তু মিসেস খাসনবীশ থেকে যাব। মিসেস শর্মা যেন মিসেস পুরুষ। বীভৎস শোনায়।"

খাসনবীশ ক্রমে প্রকৃতিস্থ হলেন।

আলবামখানা তাঁর স্ত্রী তাঁর দৃষ্টিগোচর করেননি। রাত্রে এক সময় ননদকে দেখিয়ে বললেন, "এসব কার স্ন্যাপশট?"

"ওমা..." মল্লিকা যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল।

"আমার কাছে তোমার গোপন কিছু ছিল না বলেই জানতুম। এখন দেখছি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।"

"তোমার পায়ে পড়ি, বৌদি। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি।

আমি ওর নাম পর্যন্ত জানিনে। রাস্তায় আটক করে বলে, এক সেকেণ্ড দাঁড়ালে কৃতজ্ঞ রইব। এক সেকেণ্ড। ব্যস। ওর মধ্যেই ওর ফোটো তোলা হয়ে যায়। তার পরে আমি আমার পথে, ও ওর পথে। ফোটো কেমন উঠল তাও কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি। বাক্যালাপই নেই। নিজের ফোটো নিজের চোখে এই প্রথম দেখছি, বৌদি, তুমি বিশ্বাস করো।"

"জ্যোৎস্না রায় তোমার সহপাঠী নয়?"

"জ্যোৎস্না রায় বলে কোনো ব্যাটা ছেলে আছে এই প্রথম শুনলুম।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে, মল্লিকা!"

"তুমিও আমাকে!"

"তা হলে কি লোকটা মিথ্যুক?"

"পাগলও হতে পারে।"

"চোর। মিথ্যুক। পাগল। কোনটা ঠিক?"

"সব ক'টাই বোধ হয়।"

"না, ভাই, তুমি যাই বলো না কেন, ও চোর নয়। মিথ্যুক হলে আশ্চর্য হব, কেননা মিথ্যা বলে তার কোনো লাভ নেই। হাঁ, পাগল হওয়া সম্ভবপর। এক রকম পাগল আছে তাদের বলে সেয়ান পাগল। তাই, তাই হবে।"

সমস্যার সমাধান যে এত সোজা ওতে অনীতার রহস্যবোধ পীড়িত হলেও মনের ভার নেমে গেল। তিনি মল্লিকার কাছে মাফ চাইলেন।

এর পরের দিন তিনি কান পেতে বসে থাকলেন কখন কড়া নড়ে, কখন পাগলটা আসে তার চশমাটা নিতে। কিন্তু পাগলের নাম ভোলা। সেদিন সে এলোই না। তারপরের দিনও না। তার পরের দিন? না, সেদিনও না।

এমনি করে এক মাস কেটে গেল। অনীতা আর প্রতীক্ষাও করেন না, প্রত্যাশাও করেন না। মল্লিকাও আর তাকে দেখতে পায় না পথে। পাগল কি তা হলে পাড়া বদল করল? কে জানে, হয়তো পাগলা গারদেই গেছে।

একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি কড়া নাড়ার আওয়াজ এলো। অবিকল সেই শব্দ। অনীতা তখন প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু পাছে পাগল পালায় তাই তাঁর সাজ করা হয়ে উঠল না। এলো চুলে, ময়লা কাপড়েই তিনি তর তর করে নেমে গেলেন। দরজা খুলে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন।

"নমস্কার।"

"নমস্কার। ভিতরে আসবেন না?"

"নাঃ। আমার সাহস হয় না। আমি তা হলে যাই।"

"সে কী! আপনার চশমা নেবেন না? দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি।"

"চশমা আমি সেই দিনই পালটেছি। ও আমি ইচ্ছে করেই ফেলে গেছি অকেজো বলে।"

"তা বলে আপনার চশমা আমরা কেন রাখব? আপনি নিয়ে যা খুশি করুন। আসুন, ভিতরে এসে এক মিনিট বসুন।"

এক মিনিটের স্থলে বারো মিনিট হলো। বেশ ভালো করে সেজেগুজে অনীতা যখন নামলেন তখন জ্যোৎস্না একমনে সিগারেট ফুঁকছে। দু' হাত পেতে চশমাটা নিল, নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

"অকেজো বলছিলেন কেন জানতে পারি?"

"জানাতে ভরসা হয় না। জানালে আমার কপালে কী আছে সেটা জানি। কিন্তু আর কথা বাড়াব না। আমি বোধ হয় শীগগির কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। নিকটে ফিরব না।"

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে? রাঁচী নয় তো?"

"নাঃ, এখনো তত পাগল হইনি। আপাতত এলাহাবাদ।"

"সেখানে তো—"

"নাঃ। সেখানে এ রকম পাগল আশ্রয় পায় না, তেমন কোনো আশ্রম নেই। কিন্তু সত্যিকার পাগল হলেই আমি সব চেয়ে খুশি হতুম। পাগলরাই সুখী। তাদের কাছে বাপ মা কিছু প্রত্যাশা করেন না। তাদের দেহের উপর জুলুম চলে, কিন্তু মনের উপর জোর খাটে না। কেউ যদি আমাকে সার্টিফাই করে তো আজকেই রাঁচীর টিকিট কিনতে রাজি।"

"ছি। ও কথা বলতে নেই। আমি অমন কোনো ইঙ্গিত করিনি। কিন্তু থাক ওসব বাজে কথা। এখন বলুন দেখি চশমা কেন অকেজো হলো?"

"কারণ চশমাটা অনুবীক্ষণ নয়। যদি কাউকে দু'নয়ন ভরে দেখতে চাই দেখতে পাইনে। অন্ধের মতো আঁকুপাঁকু করি।"

"এসব আপনার বানানো কথা। আচ্ছা, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। আপনি কি এই সময়টা একটু আধটু পান করেন?"

"আজ্ঞে না। আপনি তা হলে টের পেতেন। ধূমপান করি বটে, কিন্তু আপনি বোধ হয় সে অর্থে বলেন নি।"

"না, সে অর্থে নয়। তবে কি আমি বুঝব যে আপনি যা বলছেন তা নির্জলা সত্যি? জলমেশানো নয়?"

"চোখের জল মেশানো।"

"তবে যে মল্লিকার এক রাশ ফোটো তুললেন?"

"হুকুম পেলে অনীতার এক লাখ তুলতে পারি। ক্যামেরা এনেছি।"

অনীতা এতক্ষণ পরে তুমি বলতে শুরু করলেন।

"আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কী।"

"শুনতে পারি?"

"কথাটা ভালো নয়। কিন্তু শুনলে হয়তো তোমার স্বভাব শোধরাবে। তুমি খুব ফ্লার্ট করে বেড়াও। না?"

"তুমিও ভুল বুঝলে, অনীতা!"

"তা হলে আরো অনেকে ভুল বুঝেছে। কেমন?"

"আরো অনেকে? হাঁ, তাই। কেমন, এবার হলো তো? উঠি।"

"উঠলে? একটু বোস। বলো আমাকে, কেন তোমার এমন স্বভাব?"

"যখন যাকে ভালোবাসি তখন তাকে সত্যি সত্যি সত্যি ভালোবাসি। তিন সত্যি। বলতে চাইনে, কিন্তু বলতে বাধ্য হই। যেই বলি অমনি শুনতে পাই ফ্লার্ট করছি। হয়তো তাই। কিন্তু এখনো কারুর কোনো অনিষ্ট করিনি। তুমি যদি মনে করো আমার ভালোবাসাটা ভান তবে আমি চুপ করে সহ্য করব। সরে যাবঁও।"

"কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছিনে। তুমি মল্লিকার সহপাঠী কি না। তুমি বললে, হাঁ। মল্লিকা বলল, না।"

"আমি মিথ্যা বলিনি।"

"তা হলে মল্লিকা মিথ্যা বলেছে?"

"তা তো জানিনে।"

"আমি এই রহস্য ভেদ করতে চাই।"

"অনায়াসে। এটা একটা রহস্যই নয়। এর চেয়ে ঢের বড় রহস্য রয়েছে, নীতা। মানুষের হৃদয়। আমি তো যাবার মুখে, পাঁচ দশ মিনিট পরে আমাকে চাইলেও পাবে না। মিথ্যা বলে আমার কোনো দিক থেকে কোনো সুবিধে নেই। তাই যা বলছি তা সত্য বলেই মনে রেখো।"

"জ্যোৎস্না, তুমি কি আমাকে কাঁদাতে চাও?"

"না। কিন্তু যদি কাঁদো তো আমার কান্না সার্থক হবে।"

"থেকে যাও না কেন? যেতে বলছে কে?"

"সে সব পারিবারিক ব্যাপার। থাক, আমি উঠি।"

"ক্ষমা কোরো, তোমাকে ফ্লার্ট করার অপবাদ দিয়েছি।"

"ও আমি গায়ে মাখিনে।"

"জ্যোৎস্না।"

"নীতা।"

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে? মল্লিকাকে বিয়ে করবে?"

"বিয়ের কথা কোনো দিন মনে উদয় হয়নি। বিয়ে করলে ভালোবাসার স্বাধীনতা থাকে না।"

"তা বললে চলবে কেন? বিয়ে না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। আবার ভালোবাসাও সমান দরকার। সামঞ্জস্য চাই।"

"আমাকে দিয়ে হবে না। আমি অভাগা। চলি।"

"চললে? আবার কবে দেখা হবে জানিনে। এই রইল অভিজ্ঞান।"

অনীতা তাঁর সোনার রিস্ট ওয়াচ খুলে দিলেন। জ্যোৎস্না অমনি তার সোনার হার খুলে পরিয়ে দিল।

একদিন মল্লিকাকে অনীতা আনুপূর্বিক সমস্ত শোনালেন। মল্লিকাও অনীতাকে। উদ্দেশ্য, রহস্যভেদ। প্রেমের জন্যে দু'জনের একজনও কাতর নন, কিন্তু রহস্য নিরাকরণের জন্যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে চঞ্চল।

মল্লিকা বলল, "ও যে আমার ফোটো তুলত সে শুধু তোমার সঙ্গে ভাব করার আশায়। যখন দেখল আমি ওকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব না তখন সরাসরি তোমার কাছে ছাতা চাইতে এলো। বৌদি, তোমাকেই ওর ভালো লাগত, আমাকে নয়।"

"তা হলে আলবাম নিয়ে গেল কেন? নিয়ে গেল তো তোমার ফোটো এঁটে ফেরৎ দিল কেন? বেশ বোঝা যায় ও চেয়েছিল ফোটোগুলো তোমার চোখে পড়ুক। না, ভাই, আমি হলুম ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আমাকে ওর ভালো লাগার কথা নয়, কাজে লাগানোর কথা।"

"কী যে বলো, বৌদি। তোমার মতো রূপসী ও গুণবতী ক'জন? ও কেন আলবামখানা চুরি করেছিল বলব? তোমার ফোটো খুলে নিতে। নিয়েছেও। তুমি লক্ষ করোনি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি লক্ষ করোনি তা হলে। যেখানে যেখানে তোমার ফোটো ছিল সেখানে সেখানে আমার ফোটো বসিয়েছে। তা ছাড়া ফাঁকা দিকটাতে আমার বহু ফোটো এঁটেছে। তুমি শুধু সেই দিকটাই দেখেছ।"

অনীতা স্তম্ভিত হলেন। আলবামটা বার করে দেখলেন তাঁর ফোটোগুলি নেই। তা হলে ও চোর ঠিকই।

"চোর!" তিনি এর বেশী বলতে পারলেন না।

"চোর? না, চোর নয়। প্রেমিক।" মল্লিকা বলল।

"কিন্তু আমার সঙ্গে প্রেম করে ওর লাভ? বরং তোমার সঙ্গে বিয়ের আশা আছে।"

"তোমার বিশ্বাস লোকে একজনকেই ভালোবাসে ও বিয়ে করে?"

"সেইটেই তো উচিত।"

"যা হওয়া উচিত তাই বুঝি হয়ে থাকে?"

"কী জানি, আমি অত বুঝিনে। কিন্তু আমার মন বলে, ও তোমারই প্রেমিক। আমার নয়। সেদিন ওকে ছাতাটা দিয়ে দিলেই চুকে যেত। গোটা কয়েক টাকা বাঁচাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রিস্ট ওয়াচটা গেল।"

"কিন্তু হারটাও তো এলো।"

"কোনটা বেশী দামী? হারটা না রিস্ট ওয়াচটা?"

"তুমি কি বেনের মেয়ে না বামুনের? আমার মতে হারটারই দাম বেশী। ও তোমার পাণিগ্রহণ করতে পারেনি, তাই মাল্যদান করেছে তোমাকে।"

"তোমার মরণ!"

"আমার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর মরণ বাঁচন দুই সমান!" মল্লিকার স্বরে উদাস ভাব। শ্বাস বিলম্বিত। চাউনিতে কুয়াশার আভাস।

"আমাকে ক্ষমা করো, ভাই মল্লিকা। আমি তোমার প্রেমিককে চুরি করে নিইনি। বিশ্বাস করো, আমি ওর কাছে তোমার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলুম।"

"ও কী বলছ, বৌদি। ও চোর, না তুমি চোর, এই ভেবে বুঝি আমার ঘুম হচ্ছে না? আমি ওকে বিয়ে করলে তো ও আমাকে বিয়ে করবে!"

"কেন, তুমি ওকে বিয়ে করবে না কেন শুনি ?"

"বাঃ। আমার যদি মনের মানুষ পাবার আশা থাকে ?"

"যা পাওয়া উচিত তাই বুঝি পাওয়া যায় ?"

"তা বলে আমি তোমার প্রেমিককে বিয়ে করতে পারব না। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো চাও তো তোমার ছোট বোন অমিতা রয়েছে। এক বোনকে ভালোবাসবে, আরেক বোনকে বিয়ে করবে। এক ঢিলে দুই পাখি।"

"যাও, তোমার সাথে জন্মের মতো আড়ি।" অনীতা ভীষণ রাগ করলেন। রাগ করে উঠে গেলেন।

বছরখানেক পরের কথা।

সিনেমায় নতুন বই এসেছে। খাসনবীশ পাস্ পেয়ে সপরিবারে বক্স দখল করেছেন। বইখানা যে মুসলমানের লেখা আর তারকারা যে বেশীর ভাগ মুসলমান "এ কথা জানিতে তুমি ভারতবৎসল প্রভঞ্জন।" তা সত্ত্বেও তোমার উৎসাহ দেখে ধাঁধা লাগে।

ইণ্টারভ্যালের সময় আবিষ্কার করা গেল পাশের বক্সে তথাকথিত জ্যোৎস্না রায় ও কে একজন মহিলা। খাসনবীশ বললেন, "আরে তুমি এখানে! তার পর…"

"আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মিসেস্ সুধা ভট্টাচার্য। মিসেস্ নীতা—আই মীন, অনীতা—খাসনবীশ। মিস্ মল্লিকা খাসনবীশ। মিস্টার পি খাসনবীশ। মিস্টার—"

"নিরঞ্জন খাসনবীশ।" অনীতার দেওর বলল।

মহিলারা বসলেন খাসনবীশের বক্সে। আর খাসনবীশ বসলেন ভট্টাচার্যের বক্সে। খুব আড্ডা জমল। হো হো হাসির রোল উঠল। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ঘোলাটে হলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাশির আওয়াজ এলো।

"তারপর! ছবি কেমন লাগছে হে! নাসিম কেমন খুবসুরৎ! সুন্দরী যদি বলো তো ওদের মধ্যেই আছে। আর আমাদের—!"

"আর আমাদের! স্বচক্ষেই দেখছেন!"

ভাগ্যিস্ এ সব কথা মহিলাদের কানে যায়নি। নইলে কুরুক্ষেত্র

বাধত। মন্তরমতো গৃহবিবাদ। তার কাছে হিন্দু-মুসলিম সিভিল ওয়ার কিছু নয়।

ফেরবার পথে অনীতা বললেন, "ওর নাম বললে না যে?"

"ওঃ! তাই তো। জলধর ভট্টাচার্যের ছেলে সুধন্য, আমার আপিসে কিছু দিন কাজ শিখত। ওরা মস্ত কুলীন। বিয়ে করাই ওদের ব্যবসা। এখনো সুযোগ পেলে বার বার বিয়ে করে।"

(১৯৪৪)

সবার উপর মানুষ সত্য

১

বৌদিদি বললেন, "দেখলে তো ভাই তোমার দেশের ধারা। একটু ফ্যান দাও দুটি ভাত দাও করে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী প্রাণ বিসর্জন করল, কিন্তু দেশের জন্যে নয়। এই মানুষগুলো যদি মরণ ধ্রুব জেনে দেশের নামে মরত তা হলে কি একটা বিপ্লব—"

দাদা বললেন, "চুপ, চুপ, চুপ।" এই বলে তিনি জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন। দিয়ে বিদ্যুতের পাখা খুললেন।

আমার গলা চেপে ধরেছিল কী একটা শক্তি। বন্ধ ঘরেও আমার কণ্ঠের কুণ্ঠা দূর হলো না দেখে দাদা বললেন, "গরমে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। না?"

আমি বললুম, "কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু গরমে নয়, অন্য কোনো কারণে।"

বৌদিদি বললেন, "শুনতে পাই?"

আমি বললুম, "একটা গল্প মনে পড়েছে। শোনাব?"

বৌদিদি বললেন, "নিশ্চয়।"

দাদা তখন জানালাগুলো খুলে দিয়ে বললেন, "যাক, গল্প! বাঁচা গেল!" আমারও গলা খুলল।

২

আমি যেদিন কলেজে ভর্তি হই আমার সঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হয় বোকু বিশ্বাস, তার ভালো নাম বিরাজমোহন। প্রথম দিন থেকেই আমাদের বন্ধুতা জন্মায়। তার কারণ বোধ হয় এই যে আমরা দু'জনেই সেকেণ্ড ডিভিজনে পাস করি অথচ আমাদের পাওনা ফার্স্ট ডিভিজনের চেয়েও বেশী। তখন জোর অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, আমরা পড়াশুনা করিনি, পরীক্ষাটা দিয়েছিলুম গুরুজনের উপরোধে। আমরা যে দেশের জন্যে সেকেণ্ড ডিভিজনের চুণকালি মেখেছি আমাদের এই ত্যাগ আর কেউ স্বীকার করত না, করতুম আমরা দু'জনে।

কিন্তু আমাদের দু'জনের স্বভাব ছিল দু'রকম। বোকু ছিল এক নম্বর আলাপনবীশ, আর আমি তো চিরকাল মুখচোরা। বোকু আমার কাছ থেকে ক্রমে সরে যেতে লাগল, আমিও তার অভাবে ম্রিয়মাণ হলুম না, কারণ আমাকে উঠে পড়ে সেকেণ্ড ডিভিজনের কালিমা ক্ষালন করতে হচ্ছিল। এক দিন শুনলুম বোকু দেশবন্ধুর ডাক শুনে স্বরাজ-মন্দিরে গেছে, তার মানে শ্রীঘরে। নিজের জন্যে আমি লজ্জা বোধ করলুম, বোকুর জন্যে গর্ব।

এর পরে সে কলেজ বদল করল, আমিও তার সঙ্গে বন্ধুতার খেই হারিয়ে ফেললুম।

বিলেতে আবার আমাদের দেখা। সেখানে তার আরেক মূর্তি। দেশে যখন ছিল তখন তার চুল ছিল উস্কো খুস্কো, চোখে ছিল ভাঙা চশমা, তাই পরে সে হকি খেলত দারুণ। বয়স্যেরা আদর করে ডাকত, "বোকু বাব্।" বাবু নয় বাব্। পরণে বেশীর ভাগ সময় লুঙ্গী আর কুর্তি। দুটোই খদ্দরের। একটা টুপিও ছিল। ঠিক মনে পড়ে না। আর বিলেতে সে পুরোদস্তুর সাহেব। সে যখন খেলার পোশাক পরে টেনিস খেলতে যেত তখন তাকে ভারতবর্ষের কোনো রাজকুমার বলে ভ্রম হতো।

আমরা তাকে হিংসা করতুম তার রাশি রাশি সাহেব বন্ধু দেখে। চাণক্য পণ্ডিত যাই বলুন না কেন, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজা পায় না একালে। পায় খেলোয়াড়।

আমার অনুযোগের উত্তরে বোকু বলত, "দেখ হে, আমি যে ওদের সঙ্গে এত মিশি তার কারণ কি এই যে ওরা ইংরেজ? না, ওরা মানুষ। মানুষের জাত আছে, কিন্তু সে জাতের চেয়ে বড়। ধর্ম আছে, কিন্তু সে ধর্মের চেয়ে বড়। রং আছে, কিন্তু সে রঙের চেয়ে বড়। একটা আস্ত মানুষ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমার মনেই থাকে না সে ইংরেজ আমি বাঙালী, সে ক্রিশ্চান আমি হিন্দু। সে মানুষ, আমিও তাই। আচ্ছা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে কম মিশি?"

সে কথা ঠিক। বোকু যে আমাদের উপেক্ষা করত তা নয়। ওর আপন পর ভেদ ছিল না, আমাদের ছিল। আমরা ওকে ভুল বুঝতুম, বলতুম "বোকুটা বিলেতে এসে বকে গেছে, দেশপ্রেমিক না হয়ে বিশ্বপ্রেমিক হয়েছে।" দেখা হলে ক্ষেপিয়ে বলতুম, "কি হে বিশ্বপ্রেম বিশ্বাস, আছ কেমন?"

বোকু বলত, "হাঁ হে, দেশপ্রেম রায়। আছি ভালো।"

বোকু ফিরল ব্যারিস্টার হয়ে, বসল পাটনায়। আমি থাকি বাংলাদেশে, দেখা হয় না। ভেবেছিলুম বোকু তেমনি সাহেব আছে, কিন্তু অবাক হলুম যখন শুনলুম সে আইন অমান্য করে জেলে গেছে। আবার ওর জন্যে গর্ব বোধ করলুম।

জেল থেকে বেরিয়ে বোকু যা পসার জমিয়ে তুলল তা প্রত্যাশাতীত। পাটনা থেকে যারা আসত তারা বলত বোকু বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, নামে বোকু হলে কী হয়। শুনতুম সে তেমনি দিলদরিয়া, তেমনি মিশুক। বিয়ে করেনি, রোজগার যা করে তা দু'হাতে ওড়ায়। তার বাড়িতে নানা জাতের নানা ধর্মের লোক খায় শোয় মাসের পর মাস কাটায়। কাউকে একবার পেলে সে ছাড়ে না। তা তিনি মহাত্মা গান্ধীই হোন আর জনাব জিন্নাই হোন। "আইয়ে হজরৎ, তশরিফ লাইয়ে" এই ছিল অনবরত তার মুখে লেগে।

অথচ পলিটিক্সে সে ছিল বামপন্থী। এ কথা সে সভাসমিতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দিত। তার সহকর্মীরা ক্ষুণ্ণ হলে বলত, "ইণ্টারন্যাশনাল সোশ্যালিজম হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজমের চেয়ে বড়।"

এমন যে বোকু তার এক অতি প্রিয় ইংরেজ বন্ধু ছিলেন, নাম জেনিংস্। তিনি লণ্ডনের এক খবরের কাগজে কাজ করতেন। বোকু তাকে বিলেত ছাড়বার আগে আমন্ত্রণ করে এসেছিল, পরেও অনেকবার এ দেশে আসতে লিখেছিল। তিনি আসবার সুযোগ পাননি। সুযোগ পেলেন এই যুদ্ধের মাঝখানে।

ক্রিপ্স্ যখন ভারতবর্ষে এলেন মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে জেনিংস্ এলেন বিশেষ সংবাদদাতা রূপে। তার পর ক্রিপ্সের বিদায়ের পর এদেশে থেকে গেলেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। বোকু তাঁকে পাটনায় এনে পুরো পনেরো দিন ধরে রাখল। রাজনীতি সম্বন্ধে তার নিজের বলবার ছিল অনেক।

পাটনা থেকে তিনি কলকাতা গেলেন, কলকাতা থেকে আরো কয়েক জায়গায়। এর পরে পাটনায় ফিরলেন বোকুর কাছ থেকে বিদায় নিতে। এবার কিন্তু তার ওখানে উঠলেন না, উঠলেন এক ইংরেজের বাড়ি।

বোকু বলল, "কেন, বল তো?"

তিনি বললেন, "আমি কি বলতে বাধ্য?"

বোকু বলল, "না, না, বাধ্য হবে কেন? কাজ নেই বলে।"

তিনি গাঢ়স্বরে বললেন, "আমার দোষ নেই, কিন্তু কার দোষ তাও আমি বলব না। কিছু মনে কোরো না, বোকু।"

"কিছু মনে করব না, ফিল্।"

তাদের দেখাশোনা সমানে চলল। কিন্তু কোথায় যেন খচ খচ করছিল। একদিন কথাবার্তায় ধরা পড়ল।

জেনিংস্ বললেন, "তোমাদের নেতারা যে ধুয়ো ধরেছেন, ভারত থেকে চলে যাও, সত্যি যদি আমরা চলে যাই তখন কী হবে? জাপানকে রুখবে কে?"

বোকু বুঝিয়ে বলল, "জাপানকে রুখতে হলে সর্বপ্রথম চাই দায়িত্ববোধ। নানা কারণে দেশের লোক দায়িত্ব নিতে চায় না। যাতে তারা দায়িত্ব নেয় সেইজন্যে দরকার দায়িত্বের হস্তান্তর। ভারত থেকে চলে যাও বলতে এইটুকুই বোঝায়। এর বেশী নয়।"

"বেশ তো, দায়িত্ব নাও না। কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে পারবে? যদি এত সোজাই হতো তবে চীন কেন নাজেহাল হলো?"

"তা হলেও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?"

"ওসব এক্স্পেরিমেন্টের সময় নেই, বোকু। যারা দায়িত্ব পালন করতে জানে তাদের বিদায় দিয়ে তোমাদের লাভের মধ্যে হবে দু'তিন মাস স্বাধীনতা, তার পরে শ' দু'তিন বছর পরাধীনতা।"

বোকু মনে মনে জলছিল। বলল, "কে জানে, হয়তো আমরা শ' দু'তিন বছর স্বাধীন থেকে যেতে পারি।"

"আমাদের বিনা সহায়তায়?"

"তোমাদের বিনা সহায়তায়।"

"ননসেন্স। আমি ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়ালিস্ট।" তিনি রেগে গেলেন। "চীনেদের তবু চিয়াং কাইশেকের মতো সেনাপতি আছে। তোমাদের কে আছে?"

বোকু বলল, "পণ্ডিত নেহরু।"

"ওঃ সেই মহাপণ্ডিত!" এমন সুরে বললেন যেন কোনো এক টোলের পণ্ডিতের কথা হচ্ছে। অবজ্ঞার সুর।

বোকু আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। বলে উঠল, "কই, কোনো দিন তো শুনিনি স্টালিন রণশিক্ষা করেছেন? তা সত্ত্বেও মার্শাল স্টালিন

মার্শাল স্টালিন বলে তাঁকে করযোড়ে উপাসনা করছেন যাঁরা তাঁরা কি একবার ভুলেও জেনারেল নেহ্রু বলতে পারেন না ?”

“হা হা হা ! জেনারেল নেহ্রুউ !” জেনিংস ব্যঙ্গ করলেন। “তা হলে প্রথম দিনেই পরাজয়। মাই ডিয়ার বোকু, আমি ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়ালিস্ট।”

বোকু পাল্টা শুনিয়ে দিল, “মাই ডিয়ার ফিল্, আমি রিয়ালাইজ করছি যে তুমি একজন ইম্পীরিয়ালিস্ট।”

হাতে হাত মিলিয়ে ফিলিপ বললেন, “মাফ কোরো, যদি রূঢ় হয়ে থাকি। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছিনে কী করে তোমরা আমাদের ছেড়ে একটা দিনও বাঁচবে। সেই জন্যে সন্দেহ হয় যে তোমাদের মতলব জাপানের সঙ্গে রফা করা।”

বোকু হাত ছাড়িয়ে নিল। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, “গুড বাই।”

৩

কিছুদিন পরে আগস্ট মাস এলো। ধরপাকড় শুরু হলো। গ্রেপ্তার হলো বোকুও। তারপরে যে সব ব্যাপার ঘটল তার বিবরণ দিয়ে কাজ নেই। শুধু বললে যথেষ্ট হবে যে আমাদের দু'জনের বন্ধু হরদীপ সিং জনতার হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। এবং আরো কয়েকজন বন্ধু আর একটু হলে সপরিবারে নিহত হতেন। তখন থেকে তাঁরা এমন চটে রয়েছেন যে গান্ধীর নাম শুনলে হিংসার গন্ধ পান ও কংগ্রেসের নাম শুনলে ষড়যন্ত্রের। নেতারা জেলে আছেন বলেই তাঁরা নিরুদ্বেগে আছেন, তবে একথাও তাঁরা বলে থাকেন যে ঘাট মেনে ঘরে ফিরে আসাই হতো সুবুদ্ধি।

বোকু তো ছাড়া পেয়ে বোকা বনে গেল। করবার নেই কিছু, অথচ সবাই বলে, “কিছু একটা করুন, বোকু বাব্।”

বোকুর শরীর ভালোই ছিল, তবু কাগজে ছাপিয়ে দিল যে অনেক রকম রোগ হয়েছে, হাওয়া বদলের জন্যে হিমালয়ে যেতে হবে। যমালয়ের চেয়ে হিমালয় শ্রেয়। তাই তার অনুবর্তীরা চুপ করে।

যাবার উদ্যোগ আয়োজন চলছে এমন সময় তার অতিথি হলেন এক মুসলমান বন্ধু আলি জমান। তিনি ভারত সরকারের কোন এক ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, ভারতময় ঘুরে বেড়ান।

আলি যেমন আমুদে লোক বোকুও তেমনি। তিনিও চার দিনের জায়গায় আট দিন থামলেন, সেও যাত্রার দিন পেছিয়ে দিতে লাগল। মনে হলো বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না, আড্ডা দিয়ে ও খানাপিনা করে তার আয়ু পরিবর্ধন হবে।

কিন্তু কপাল মন্দ। ঠিক এমন সময় গান্ধীজী অনশন করলেন। আর বোকুরও অশনে অরুচি এলো। ওদিকে আলিও আমোদ ভুলে বিমর্ষভাবে বসে থাকলেন। গান্ধীর উপরে উনি যে খুব প্রসন্ন ছিলেন তা নয়, কিন্তু গান্ধী চলে যাবেন, ভারতবর্ষ থাকবে, একথা কল্পনা করতেই ওঁর চোখে জল আসে। বোকুকে বললেন, "যতই দোষ করুন, আমরা কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারি?"

খালাসের হুকুম যখন হলো না তখন বোকু ভেঙে পড়ল অবধারিত মৃত্যুশোকে। যদিও সে কতবার সন্দেহ করেছে যে গান্ধী ধনিকদের মিত্র, শ্রমিকদের কেউ নয়। আর আলি তাঁর বন্ধুকে ফেলে পাটনা থেকে প্রয়াণ করলেন না। ওকে সঙ্গ দেবার জন্যে আরও কিছু দিন থামলেন।

তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ধূমোদ্গার করলেন বোকুর চেয়েও অনেক বেশী। এক টিন সিগারেট এক ঘণ্টায় খতম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা বললেন তাতে বোকুর পিলে চমকাল।

"পাকিস্তান। পাকিস্তান ছাড়া উপায় নেই, ইয়ার।"

"ও কথা কী করে আসে?"

"কী করে আসে? আজ যদি হিন্দু মুসলমান এক বাক্যে বলত, গান্ধীজীর মুক্তি চাই, তা হলে তাঁকে বেঁধে রাখত কার এত সাধ্য?"

"বলে না কেন তবে?"

"কেন বলবে? পাকিস্তান পেলে তো বলবে?"

বোকু তো হতবাক্।

"তুমি বোধ হয় ভাবছ মুসলমানরা এমন দুর্দিনেও দর হাঁকে। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, তোমরাও ইংরেজের দুর্দিনে দর হেঁকেছিলে—ভারত থেকে চলে যাও। পলিটিক্সের দস্তুর এই। কী করা যায়!"

বোকু বলল, "পলিটিক্সের কী বোঝ! আমরা দর হেঁকেছি না দেশকে বাঁচাতে চেয়েছি তার উত্তর দেবে ইতিহাস।"

তর্ক বেধে গেল। আলি বললেন, "ইয়ে বড়ি আফশোশকি বাত। গান্ধী

মরে যাবেন তবু আমাদের পাকিস্তান দিয়ে যাবেন না, এমন গোঁ। কী করে হিন্দু মুসলমান এক হবে, কী করে ইংরেজদের তাড়াবে! মুঝকো তো মালুম হোতা হৈ কি আজাদী কব্‌হি নেহি মিলেগি!"

"কিন্তু পাকিস্তান নিয়ে তোমরা রাখবে কেমন করে? জাপানীরা যদি এক দিক থেকে আসে, আর রাশিয়ানরা আরেক দিক থেকে?"

"হাসালে ইয়ার!" আলি হো হো করে হেসে উঠলেন, "হিন্দু মুসলমানে যদি মেল থাকে তবে তোমাদের সিপাহীরা আমাদের জন্যে লড়বে, যেমন মার্কিন সিপাহীরা লড়্‌ছে ইংরেজদের জন্যে। মার্কিনরা যদি উত্তর আফ্রিকায় লড়তে পারে হিন্দুরাও পারবে বেলুচিস্থানে ও আসামে।"

বোকু বলল, "তা ঠিক। কিন্তু দেশটাকে দু'ভাগ করলে হিন্দুদের দিল্‌ জখম হবে। লড়তে ওদের জোর থাকলে তো লড়বে? তোমরা আমাদের দিল্‌ জানো না ইয়ার।"

তখন আলি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তা হলে গান্ধীজীকে বাঁচাতে পারা যাবে না, আজাদীরও আশা নেই।"

এবার বোকু পুনরুক্তি করল জেনিংস যা বলেছিলেন তার। "মাই ডিয়ার আলি, ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়ালিস্ট।"

আলি উত্তর দিলেন, "তুমি দেখছি ব্রিটিশ ইম্পীরিয়ালিস্টদের জুনিয়ার পার্টনার হিন্দু ইম্পীরিয়ালিস্ট।"

বোকুর ইচ্ছা করল সীতার মতো কেঁদে বলতে, "মা ধরণী, দ্বিধা হও।" কিন্তু সে একটি কথা কইল না। কথা কওয়া বন্ধ করে দিল।

বোকু যে সময় আলমোড়া যায় তার মাস কয়েক পরে আমিও। এসব তার কাছে সেইখানেই শোনা। হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। আমারও ছুটি। বোকুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, ভাই, এখনো কি তুমি বিশ্বাস করো যে মানুষ তার জাতের চেয়ে বড়, তার ধর্মের চেয়ে?"

"বিশ্বাস করতে চাই। কিন্তু করতে দেয় কে?" বোকু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। "মানুষ বলে যাদের ভালোবাসতুম তাদের একজন ম্যান নয়, ইংলিশম্যান। আরেকজন ম্যান নয়, মুসলম্যান।" এই বলে সে মুষড়ে পড়ল।

আমার গল্প শেষ হলে বৌদিদি বললেন, "সত্যি আমার মনে হয় স্বাধীনতা কোনো দিন মিলবে না। নইলে এত বড় মন্বন্তর মাথার উপর দিয়ে যায়, আমরা যে অসহায়কে সে অসহায়!"

দাদা বললেন, "চুপ।" তিনি জানালার দিকে তাকালেন। তাঁর টিকটিকিকে বড় ভয়।

আমি বললুম "বৌদি, কোনটা বড় ট্রাজেডি বলতে পারো? মন্বন্তর, না মনান্তর?"

"নিশ্চয় মন্বন্তর।"

"না, বৌদি। পাঁচ কোটি ইংরেজ আর দশ কোটি মুসলমানের সঙ্গে ত্রিশ কোটি হিন্দুর মন মিলছে না। কোনো দিন মিলবে তার লক্ষণ দেখছিনে। ঠিক এমনি মনান্তর থেকে এসেছে এই যুদ্ধ। বিশ বছর ধরে ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে আগুন জ্বলে উঠল একদিন। কবে নিববে তাও জানিনে। একটা নিবলেও নিষ্কৃতি নেই, বৌদি। আরেকটার পূর্বাভাস দেখছি।"

দাদা শিউরে উঠলেন। বৌদি বললেন, "তুমিও যেমন!"

"থাক, বৌদি। আপনাদের সুখস্বপ্নে বাদ সাধব না। কিন্তু আমার বন্ধুর সুখস্বপ্ন ভেঙেছে। সে এখন প্র্যাকটিসে মন দিয়েছে বটে, কিন্তু ভুলতে পারছে না যে মানুষ কোথাও নেই। আছে শুধু ইংলিশম্যান, মুসলম্যান, জারম্যান, জাপম্যান, ব্রাহ্ম্যান। কোনটা বড় ট্র্যাজেডি? মানুষের অন্তর্ধান না মানুষগুলোর মৃত্যু?"

(১৯৪৪)

হাসন সখী

ক্লাসের যারা ডাকসাইটে দস্যি ছেলে, পড়া বলতে পারে না, বেঞ্চির উপর দাঁড়ায়, তারা বসে পিছনের সারিতে। একদিন তাদের রাজা সূর্যমোহন এসে আমায় বললে, "আজ থেকে তুমি হলে আমাদের মন্ত্রী। আমাদের সঙ্গে বসবে, খাতা দেখতে দেবে, প্রম্প্‌ট্‌ করবে। কেমন, রাজি ?"

আমি নবাগত, আমার ছেলেবেলার ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে পুরী জেলা স্কুলে ভর্তি হয়েছি: কাউকে চিনিনে বললে হয়তো ভুল বলা হবে, কারণ আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা আমার সহপাঠী, তারই কাছে বসি ও তারই সঙ্গে বেড়াই। এমন যে আমি, সেই আমাকেই কিনা মন্ত্রী মনোনয়ন করলেন সেকেণ্ড ক্লাসের ছোট লাট সূর্যমোহন ছোটরায়।

শুনেছিলুম তাদের অসাধ্য কাজ নেই। ফুটবল খেলার সময় ফাউল করে পা ভেঙে দেওয়া তাদের নিত্য কর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকারে ল্যাং মারা ও গলির মধ্যে অদৃশ্য হওয়া তাদের অভ্যাস। আমার যদিও ফুটবল খেলার ব্যসন ছিল না, সমুদ্রতীর থেকে বাসায় ফিরতে প্রায়ই অন্ধকার হতো। বাসা ছিল গলির ভিতরে, সুতরাং ভয়ের হেতু ছিল। আমি আর কথা কাটাকাটি না করে পিছনের সারিতে মুখ ঢাকলুম।

এই ঘটনা যে কেউ লক্ষ করবে অতটা আমি ভাবিনি। আমি অপরিচিত নগণ্য ব্যক্তি, কে-ই বা আমাকে চেনে ? কিন্তু দিন কয়েক পরে আমাদের ইংরেজীর মাস্টার কেশববাবু আমাকে অযাচিত অপমান করলেন আমি খারাপ ছেলেদের একজন বলে। তার পর কী মনে করে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "If you want to be a good boy follow my Nilu."

কেশববাবুর ছেলে নীলাদ্রি পড়ত আমাদেরই ক্লাসে, বসত সামনের সারিতে। সত্যিকারের ভালো ছেলে, ফার্স্ট সেকেণ্ড হতো। আমি তার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করিনি, সেও আমার সঙ্গে না। আমি লাজুক, সে অহংকারী। অন্তত লোকে তো তাই বলে। তার বাবা যখন এত মানুষের মাঝখানে আমাকে অপমান করে গেলেন তখন আমিও আমার মুখরক্ষার জন্যে তাঁর কথাগুলির অন্য অর্থ করলুম। আমার দুষ্টু ছেলের দলটিকে মন্ত্রণা

দিলুম, "ওহে মাস্টার মশাই কী করতে বললেন শুনলে তো! নীলুকে ফলো করতে হবে। তার মানে, নীলু যখন যেদিকে যাবে তোমরাও তখন সেই দিকে যাবে। কিন্তু খবরদার, নীলু যেন টের না পায়।"

সে দিন থেকে আমাদের মন্ত্র হলো, নীলুকে ফলো করো। আমরা ওটার উপর বাঁদরামি ফলিয়ে ওর উচ্চারণ করতুম, ফল্‌লো মাই নীল্‌লো!

তখন ঠাহর হয়নি এর পরিণাম কী হতে পারে। এক দিন আমাদের দলের দীনকৃষ্ণ এসে আমার কানে কানে বললে, "জানিস, ও কোথায় যায়?"

"কোথায়?"

"কাউকে বলিসনে। সমুদ্রের ধারে একটা ছোট দোতলা বাড়ি আছে, চক্রতীর্থের দিকে। সেখানে রোজ বিকেল বেলা নীলু গিয়ে কাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, শুনবি?"

"কাদের সঙ্গে?"

"মেয়েদের সঙ্গে!"

ডিটেকটিভ বই পড়েও আমি এমন রোমাঞ্চিত হইনি। সেদিন আমার ইচ্ছা করছিল দুনিয়ার লোককে ডেকে বলতে, আহা! নীলু কেমন ভালো ছেলে দেখলেন তো আপনারা! ফল্‌লো মাই নীল্‌লো!

মেয়েদের উল্লেখ শুনে আমি আমার মুখখানাকে যথাসাধ্য সাধু সন্ন্যাসীদের মতো করে বললুম, "আমরা দুষ্টু ছেলে বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্র নই। আমাদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, আমরা কি কখনো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারি!"

দীনু বললে, "মেশা দূরে থাক, ওদের কাছে যেতেই আমার বুক ধুকপুক করে। একটি মেয়ে যেই নিচে নামল আমি দিলুম ভোঁ দৌড়। নীলুর, যাই বল, সাহস আছে।"

আমি সেদিন আবিষ্কার করলুম যে আমরা দু'জনেই সমান ভণ্ড। যেমন আমি তেমনি দীনু। আসলে আমরা নীলুর অনুসরণ করতে পেলে বাঁচি। দুনিয়ার লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা দুই ভণ্ড সন্ন্যাসী নীলুর পিছু নিলুম। বুক ধুকপুক করছিল বটে দু'জনেরই, কিন্তু মেয়েদের জন্যে নয়, তাদের অভিভাবকদের ভয়ে। মুখে বোলচাল দিচ্ছিলুম, "নীলুটাকে ধরিয়ে দিতে হবে।" কিন্তু অন্তরাত্মা জানেন যা মনে মনে বলছিলুম। "যদি ধরা পড়ি তখন?" তখন অবশ্য ভোঁ দৌড়।

বাড়িটার নাম 'ঊর্মিমুখর'। ছোট দোতলা বাড়ি। ফিকে নীল রং। সমুদ্রের হাওয়ায় ছিল সমুদ্রের স্বনন। বাড়িটা সার্থকনামা।

আমরা ওর পাশে ঝিনুক কুড়োতে বালু খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলুম গুটি কয়েক অচেনা শিশুর সঙ্গে ভাব করে। নজর রাখলুম নীলুর উপরে। নীলু যখন দোতলায় পৌঁছল তখন হাসির হররা উঠল তাকে দেখে, না তার পোশাক দেখে, না কী দেখে তা বোঝা গেল না। নীলুও সে হাসিতে যোগ দিলে। আমাদের কানে আসতে লাগল, হা হা। হো হো। হি হি।

নীলুটা যে এমন বাঁদর তা কে জানত। মেয়েদের সঙ্গে সমানে চাল দেয়। কখনো হাসে, কখনো গায়, কখনো খুনসুটি করে। আমরা শুনতে পেলুম ওরা ওকে ভুতুম বলে ডাকছে। নামের কী ছিরি। ভুতুম! নীলুর কিন্তু তাতেই আনন্দ। সে পেঁচার মতো আওয়াজ করছে, হুঁম...হুঁম···হুঁম···"

দীনু বললে, "খেতে খেতে আওয়াজ করছে বলে অমন শোনাচ্ছে।"

আমি বললুম, "বুঝেছি, খাবার লোভেই ছোঁড়া রোজ এদিকে আসে।"

নীলু যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ বিষয়ে আমাদের দ্বিমত ছিল না। না জানি কী ভালোমন্দ খায়, আমরা তো পাইনে। এতগুলো মেয়ে মিলে রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। হয়তো চপ কাটলেট ডিমের অমলেট। কী বলে ওকে? পুডিং। হয়তো চকোলেট টফি লজেঞ্চ খেতে দেয়, আইসক্রীম লেমনেড সীরাপ।

আমরা স্থির করলুম নীলুর বাবাকে জানাতে হবে সে কুসংসর্গে মিশছে। আমাদের দলের টাইগারের উপর সে ভার পড়ল। ওর মতো ঠোঁট কাটা বেহায়া খুব কম দেখা যায়। মানুষের গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়, বিশ্রী গালাগাল দেয়। ওর মুখে কিছু আটকায় না। গুরু লঘু জ্ঞান নেই।

টাইগার একদিন মাস্টার মশায়ের পা মাড়িয়ে দিয়ে ঘটা করে পায়ের ধুলো নিলে। তারপর বললে, "এবার থেকে নীলুরও পায়ের ধুলো নেবো, স্যার। সে আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে।"

"কেন হে?"

"সে গাছের ডালে বিচরণ করে, নাম তার ভুতুম। একটি নয়, দুটি নয়, অনেকগুলি পেঁচানী তার সহচারিণী।"

মাস্টার তো হতবাক। তারপরে টাইগারের কানটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "ভালো করে খোঁজ নিলে জানবে যে নীলু যায় একটি

রুগ্ণ মেয়েকে একটুখানি আনন্দ দিতে। মেয়েটির যক্ষ্মা, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। সহচারিণী যাদের বলছ তাদেরও ওই কর্তব্য। সহচরও আছে। সব ভদ্র ঘরের ছেলে, ভদ্র ঘরের মেয়ে। তোমাদের মতো ইতর নয়।"

এর পরে আমি নীলুর সঙ্গে যেচে আলাপ করি। সে একটি যক্ষ্মা রোগীকে একটুখানি আনন্দ দিতে যায়, ভূতুম সাজে, লোক হাসায়! এতে আমি তার মহত্ত্বের পরিচয় পেলুম। তাকে খুলে বললুম সমস্ত, মাফ চাইলুম। নিজের দল ছেড়ে সামনের সারিতে বসতে লাগলুম তার পাশে। ইতিমধ্যে সেও পেয়েছিল আমার বিদ্যার পরিচয়। মাস্টার মশায় আমার খাতা দেখে তাকে নাকি বলেছিলেন যে ছোকরার স্টাইল আছে।

অবশেষে সেই অনিবার্য দিনটি এলো যেদিন নীলু আমাকে তার অনুসরণ করতে বললে 'উর্মিমুখরে'র দোতলায়। সেখানে একখানি ইজি চেয়ার পাতা, তাতে ঠেস দিয়ে বসেছিল বা শুয়েছিল আমাদেরই বয়সের একটি বিষণ্ণ রুগ্ণ মেয়ে। নীলু বললে, "এ আমার হাসন সখী।" মেয়েটি একটু হাসল। "আর আমি এর ভূতুম।"

"তোমার নাম কি বুদ্ধু?" প্রথম আলাপেই প্রশ্ন করল মেয়েটি। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আমার নাম, কিন্তু চোখ টিপল নীলু। তখন আমি উত্তর করলুম, "হাঁ, ভাই, আমার নাম বুদ্ধু।" সে যখন আমাকে তুমি বলেছে আমিও কেন তাকে তুমি বলব না? সুধালুম, "তুমি বুঝি 'ঠাকুমার ঝুলি' পড়তে ভালোবাসো?"

"ভালোবাসি। সব চেয়ে ভালো লাগে কিরণমালার কাহিনী। আমি যেন কিরণমালা আর তোমরা যেন অরুণ বরুণ। তোমরা যেন মস্ত এক পুরী বানালে মর্মর পাথরের। আর আমি তাকে সাজালুম যত রাজ্যের মণি মাণিক্য দিয়ে। তবু কিসের যেন অভাব। তাই তোমাদের বললুম, যাও তোমরা, নিয়ে এসো সেই সোনার পাখি আর সেই মুক্তা ঝরার জল।"

মেয়েটির আসল নাম চাঁপা। এক কালে ওঁর গায়ের রং চাঁপার মতো ছিল, এখন শুকিয়ে কালো হয়ে আসছে। মুখে এক প্রকার মাদকতা, বা মদিরতা। নেশা লাগে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে। দেখতে যে খুব সুন্দর তা নয়, কিন্তু তন্ময় হয়ে কথা যখন বলে তখন মনের সৌন্দর্য এসে তনুর সৌন্দর্য হয়।

সেদিন ওদের ওখান থেকে যখন ফিরলুম তখন চোখে আমার জল। নীলু লক্ষ করলে। বললে, "কাঁদছিস নাকি?"

"কাঁদব না তো কী? হাসব? আমি কি তোর মতো পাষাণ?"

"আমি যে হাসি তা পাষাণ বলে নয়। হাসি ওকে হাসাতে।"

"ওকে হাসাতে চাইলেও আমি হাসতে পারব না। এ কি হাসির কথা যে একটি সুন্দর ফুল দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! হায় ভগবান, কেন আমাদের এত অক্ষম করে সৃষ্টি করলে! কেন, কেন, ওগো একটিবার বলে দাও কেন আমরা পারব না ওকে মুক্তা ঝরার জল দিয়ে বাঁচাতে!"

নীলু শুধু বললে, "মানছি তোর স্টাইল আছে।"

এখন যেমন আমি একজন হাস্যরসিক তখন তেমন ছিলুম না। তখন ছিলুম উচ্ছ্বাসপরায়ণ ও অরসিক। সেই যে সেদিন ফিরলুম আর ও মুখো হলুম না। নীলু ডাকলে চোখের জল মুছি। বলি, "যেদিন পারব ওকে মুক্তা ঝরার জল এনে দিতে সেদিন যাব। তার আগে নয়।"

নীলু হাসিয়ে হাসিয়ে বলে, "বুঝেছি। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দ্বিতীয় দর্শনের আবশ্যক হতো বিয়ের আশা থাকলে।"

আমি তাকে তাড়া করে যাই। ভাবি, নীলুটা এমন নীরেট।

পুরীতে আরো কিছু কাল থাকলে হয়তো আবার যেতুম, কিন্তু যে কারণেই হোক আমাকে আবার নাম লেখাতে হলো আমার ছেলেবেলার ইস্কুলে। পুরী থেকে বিদায় নিলুম অকালে।

প্রায় চার বছর পরে পাটনা কলেজের উত্তরে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছি এমন সময় নীলুর সঙ্গে মুখোমুখি। শুনলুম সে পাটনা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে পড়ে, ওভারসিয়ার হয়ে বেরোবে। তার বাবা হঠাৎ মারা যান, তাই কলেজে পড়বার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না।

নীলু বললে, "তোর চেহারার তো বিশেষ পরিবর্তন দেখছিনে। তোর স্বভাবটি কি তেমনি আছে? কথায় কথায় কান্না।"

"তোর শরীরটি তো বেশ খোট্টার মতো হয়েছে। স্বভাবটি কি তেমনি আছে? কথায় কথায় হাসি!"

এর থেকে হাসন সখীর প্রসঙ্গ। নীলু বললে, "বেঁচে আছে। তার চেয়ে বড় কথা, ভালো আছে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে।"

"বলিস কী! এত দূর!" আমি আশ্চর্য হলুম। "আমি ভাবছি এ অসম্ভব সম্ভব হলো কী করে? কে তাকে এনে দিলে মুক্তা ঝরার জল? তুই, নীলু? না আর কেউ?"

নীলু আমাকে তার হোস্টেলে ধরে নিয়ে গেল। খেতে দিলে পাটনার অমৃতি আর পল্লী অঞ্চলের ঠেকুয়া। যাক, ছাতু আর লঙ্কা খেতে দেয়নি, এই ঢের। ও নাকি নিজে তাই খেয়ে খেয়ে চেহারা ফিরিয়েছে। পাশেই কোন এক মহাবীরজীর আখড়ায় ডন বৈঠক ফেলে, সাঁতার কাটে গঙ্গায়।

সে কিছুতেই স্বীকার করলে না যে তার সখী সেরে উঠেছে তার আনন্দ রসায়নে। বললে, "দু' বছরের উপর আমি পাটনায়, চাঁপা দেওঘরে। ছুটির সময় দেখা হয় অল্প কয়েক দিনের জন্যে। কাজেই আমার কৃতিত্ব কতটুকু! জানিনে আর কেউ আছে কিনা ওখানে।"

পাটনায় নীলুর পড়া শেষ হয়ে গেল আমার আগে, যাবার আগে সে আমাকে খবর দিয়ে গেল যে চাঁপার বিবাহ হয়েছে কলকাতার এক ডাক্তারের সঙ্গে। বললে, "ওঃ! কী ভাবনাই ছিল ওর জন্যে আমার। ডাক্তার শুনে ধড়ে প্রাণ এলো। ও বাঁচবে বহুকাল। চির কাল বাঁচবে ও। ডাক্তার ঠিক বাঁচাবে ওকে। তোকে বোধ হয় বলিনি যে ডাক্তারটি প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ। হাঁ, দোজবর।"

আমি বললুম, "নীলু, মুক্তা ঝরার জল ডাক্তারখানায় মেলে না। মানুষকে যে বাঁচায় সে ডাক্তার নয়। আমি নিশ্চিন্ত হতুম, যদি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে হতো। হাসছিস যে। তোর না হয় অর্থ নেই, কিন্তু ভালোবাসা তো আছে। তুই কিসে অযোগ্য শুনি?"

"শঙ্কর," নীলু আমার দু'হাত ধরে আমার দু'চোখে চোখ রেখে বললে, "তুই বিদ্বান, তুই কবি। কিন্তু বিদগ্ধ নস্। কখনো ভালোবেসেছিস কি না সন্দেহ। যদি কোনো দিন বাসিস তা হলে দেখবি দু'রকম ভালোবাসা আছে। সখার সঙ্গে সখীর। প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার। চাঁপার সঙ্গে আমার ভালোবাসা দ্বিতীয় পর্যায়ের নয়, কোনো দিনই ছিল না, তুই ভুল বুঝেছিলি।"

"বুঝেছি।" আমি যেন কত বড় একটা আবিষ্কার করলুম। "তোরা ছিলি এক হিসাবে ভাইবোন। কেমন, ঠিক ধরেছি কিনা।"

"না, ঠিক নয়, বেঠিক। ভাইবোনের ভালোবাসা অন্য জিনিস। চাঁপাকে আমি বোন বলে ভাবতে পারিনে! ও আমার সখী, সই, সহেলী। এই যেমন তোর সঙ্গে আমার সখ্য তেমনি ওর সঙ্গেও। তুই কি আমার ভাই? ভাইয়ের কাছে কি সব কথা বলা যায়? তুই আমার সুহৃৎ, তাই তোর কাছে আমার লুকোবার কিছু নেই। তেমনি চাঁপার কাছে।"

"কালিদাস তো গৃহিণীকেই সখী বলে গেছেন। তা হলে চাঁপা কেন তোর গৃহিণী হতে পারে না, বল আমাকে।" আমি চেপে ধরলুম।

"গৃহিণী হয়তো সখী হতে পারে, কিন্তু সখী হতে পারে না গৃহিণী। কেউ যদি জোর করে আমাদের বিয়ে দেয় তা হলেও আমরা স্বামী-স্ত্রী হব না। যদি হই তা হলে আমাদের মুখের হাসি চোখে মিলিয়ে যাবে।"

বছর পাঁচ ছয় পরে আমি বিলেত থেকে ফিরেছি, উঠেছি কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে। ওরা আমার নাম খবরের কাগজে ছাপিয়েছে। ফলে অনেকেই দয়া করে আসছেন আমাকে দেখতে। বেয়ারা এক রাশ কার্ড নিয়ে এলো। তাদের একখানার পিঠে ছাপা ছিল "নীলাদ্রিনাথ গুপ্ত। মার্টিন এণ্ড কোম্পানী।" পাছে চিনতে না পারি সেই জন্যে কালি দিয়ে লেখা ছিল "নীলু"।

নীলু! আমার বাল্য বন্ধু নীলু! সেই নীলু কলকাতায়, মার্টিন কোম্পানীতে! নীলুকেই অভ্যর্থনা করলুম সকলের আগে।

খাটো শার্ট খাটো প্যাণ্ট পরা এক লৌহ মানব আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল না পাঞ্জা কষল। আমি শিউরে উঠে বললুম, "আঃ ছেড়ে দে, ভাই। লাগে।"

"হুঁ! বাংলা মনে আছে। আমি পরখ করে দেখছিলুম, বাংলা বেরিয়ে আসে, না ইংরেজী।"

শুনলুম চাকরিতে বেশ উন্নতি করেছে, মাইনে পাচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারের সমান। বললে, "সময় এক দম পাইনে। এই যে তোকে দেখতে এসেছি এ অনেক কষ্টে। চাঁপার ওখানে তোর নিমন্ত্রণ। আমি তোকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাব সন্ধ্যার পরে। তৈরি থাকবি। না, না, অন্য এনগেজমেণ্ট আছে, ও কথা শুনব না। ক্যানসেল ইট। চাঁপা একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে তোকে দেখতে। ওঃ, কত কাল পরে! তুই কিন্তু তেমনি আছিস। তোর স্বভাবটিও কি তেমনি আছে?"

আমি জানতে চাইলুম চাঁপা কেমন আছে, বিয়ে সুখের হয়েছে কিনা, ছেলেমেয়ে ক'টি, নীলুও কি বিয়ে করেছে, ইত্যাদি। উত্তর পেলুম, নীলুর স্ত্রী চাঁপার সঙ্গে অত মাখামাখি পছন্দ করেন না, তাই চাঁপার সঙ্গে নীলুর কদাচ দেখা হয়। ওদিকে আবার ডাক্তার সাহেবেরও সেই মনোভাব, তিনিও নীলুকে প্রশ্রয় দেন না। এসব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাদের বন্ধুতা অবিকল তেমনি রয়েছে। নীলুর একটি ছেলে, চাঁপার সন্তান হয়নি।

নীলু এক নিঃশ্বাসে উত্তর দিয়ে এক দৌড়ে প্রস্থান করলে। সময় নেই যে। সন্ধ্যার পর কথা রাখলে। ওর নিজের মোটরে করে আমাকে পৌঁছে দিলে থিয়েটার রোডে। ডক্টর সেন আমাকে সাদর সম্ভাষণ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে ছিলেন আরো কয়েকটি তরুণী। শুনলুম তাঁরা সকলেই মিস। কেউ ও বাড়ির, কেউ পাশের বাড়ির। বাড়ি মানে ফ্ল্যাট। আমার কিন্তু নজর ছিল না আর কারো প্রতি। আমার দৃষ্টির সবটা জুড়েছিল চাঁপা। আমাদের হাসন সখী। আমাদের কিরণমালা। আমাদের হারানো কৈশোর।

চাঁপার গায়ের রং আবার চাঁপাফুলের মতো হয়েছে, ভরন্ত দেহ, সুঠাম গড়ন। কেবল তার চোখ দুটিতে কত কালের ক্লান্তি, কত কালের নিরাশা।

"তার পর, বন্ধু, তোমাকে বন্ধু বলে ডাকলে ক্ষমা করবে তো? তুমি বলব না আপনি বলব?" সে হাসল। কী তন্ময় হাসি। সে যখন যা বলে, যা করে, তন্ময় হয়ে বলে, তন্ময় হয়ে করে।

"বন্ধু বলতে পারো, বরুণ বলতে পারো, যা বলতে তোমার সাধ যায়, যা বললে তুমি রূপকথার স্বাদ পাও।" আমি আশ্বাস দিলুম। "না, আপনি কেন? আপনি কবে হলুম? সেই প্রথম থেকেই তো তুমি।"

"তুমি তো এত দেশ দেখলে, এত রাজ্য বেড়ালে, ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের মতো। কই, তোমার রাজকন্যা কোথায়?" সে তেমনি হাসল।

"রাজকন্যা এখনো ঘুমিয়ে। সোনার কাটি খুঁজে পাইনি।"

"কিন্তু রূপোর কাটির খোঁজ তো পেয়েছ?"

"তা পেয়েছি, কিন্তু রূপোর কাটি ছোঁয়ালে তো সে জাগবে না। যে জাগবে না তাকে নিয়ে আমি কী করব! আমার অন্য কাজ আছে, হাসন। আমি একজন কবি।"

এমনি কত কথাবার্তা। সব সাংকেতিক ভাষায়। সে বুঝল যে আমি তার ননদদের কাউকে, তার প্রতিবেশিনীদের কাউকে বিয়ে করব না। একটু ক্ষুণ্ণ হলো। তার আশা ছিল ওদের একজনকে বিয়ে করে আমি তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতাব। তা হলে দেখাশোনা সুগম হবে। কিন্তু আমি নীলুর দৃষ্টান্ত দিলুম। বিয়ের পরে সব মেয়েই সমান। কেউ কারো স্বামীকে স্বাধীনতা দেবে না সখীর সঙ্গে মিশতে, নিজের বোন হলেও না, বৌদি হলেও না।

ডিনার টেবিলে আমি ছিলুম তার ডান দিকে, খেতে খেতে কথা বলছিলুম সাংকেতিকে। ডিনারের পর অন্যান্য মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিতে হলো। হাসন তাতে খুব খুশি হলো না, নীলুকে নিয়ে বসল তাস খেলতে। আমার কানে এলো, "বুদ্ধু দেখছি এক নম্বর স্মার্ট। বিয়ে করবে না একজনকেও, তবু সকলের সঙ্গে রঙ্গ করা চাই।"

ডাক্তার সাহেবের লক্ষ্য সব সময় নীলুর উপর, আমাকে তিনি প্রতিযোগী বলে গণ্য করেননি। নীলু বেচারা সমস্তক্ষণ উসখুস করছিল, তার লক্ষ্য একটা ক্লক ঘড়ির উপরে। দেরি করলে তার বৌ রাগ করবে। লৌহ মানবও তার বৌকে ভয় করে। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল ভাবতে। আমি তাকে রহস্য করে বললুম, "আজ তোর কপালে ঝাঁটা আছে।"

বিদায়বেলায় চাঁপা বললে, "আবার যখন কলকাতা আসবে দেখা করবে তো? বুদ্ধু, আবার যেন দেখা হয়।" কী জানি কেন আমার চোখ সজল হলো। নীলু বললে, "চল, তোকে রেখে আসি। ইচ্ছা ছিল এক দিন আমার ওখানে ডাকতে, কিন্তু কালকেই আমাকে মফঃস্বলে বেরোতে হচ্ছে। আসছে বার কলকাতা এলে আমার ওখানেই উঠিস।"

তারপর নানা কারণে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। প্রায় সাত বছর পরে ছুটি নিয়ে মিহিজামে বিশ্রাম করছি. একদিন ঠিক দুপুর বেলা একখানা মোটর এসে আমার দরজায় থামল। লাফ দিয়ে নামল একটা কুকুর, তা দেখে ছুটে এলো আমার দুই ছেলে। উত্তেজিত হয়ে বললে, "বাবা, দেখবে চল কাদের মোটর আর কুকুর।"

বেরিয়ে দেখি সাহেবী পোশাক পরা এক ভদ্রলোক ও ফারকোট গায়ে দেওয়া শাড়ি পরা এক মহিলা। আরে, এ যে আমাদের নীলু, সঙ্গে ওর স্ত্রী রত্নাবলী। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ছিলেন, তাঁকে ইতিমধ্যে কুকুরের ও মোটরের খবর দেওয়া হয়েছিল, মহিলার খবর দেওয়া হয়নি। আমার ডাক শুনে তিনি বাইরে এলেন ও থাকবার নিমন্ত্রণ জানালেন। শোনা গেল নীলুরা আসানসোল থেকে এসেছে জমি কিনতে, একটু পরে আসানসোল ফিরে যাবে, থাকবে না। যদি রান্নার দেরি না থাকে খেয়ে যাবে।

আমি বললুম, "আমরা একটার সময় টিফিন খাই, এখনো এক ঘণ্টা বাকি। চল, নীলু, তোকে একখানা মনের মতো জমি দেখাই।"

নীলু রাজি হলো। তার স্ত্রী আমার স্ত্রীর সঙ্গে রান্নাঘরে গেলেন। শীতের দুপুর। হাওয়া দিচ্ছিল। আমরা পায়ে হেঁটে কতক দূর গেলুম। মোটর এবং কুকুর রইল ছেলেদের হেফাজতে। জিজ্ঞাসা করলুম, "নীলু, চাঁপা কেমন আছে?"

নীলু উত্তর দিলে "সে অনেক কথা। আরেক দিন বলব।"

"আরেক দিন মানে তো আরো সাত আট বছর। তার চেয়ে তুই যেটুকু পারিস বল।"

"আচ্ছা, তবে সারাংশটুকু বলি।"

বিয়ের অল্প কয়েক দিন পরেই তার স্বামী তাকে বলেন অপারেশন করতে হবে। কিসের অপারেশন, চাঁপা অত শত বোঝে না। মত না দিলে যদি প্রাণসংশয় হয় সে কথা ভেবে মত দেয়। অপারেশনের পরে টের পায় চির জীবনের মতো বন্ধ্যা হয়েছে। তার মনে দারুণ আঘাত লাগে। নীলুকে বলে, আর বেঁচে থেকে কী হবে! কী হবে প্রাণ রেখে, যদি প্রাণ দিতে না পারি! নীলু বলে, কত মেয়ে বন্ধ্যা হচ্ছে নৈসর্গিক কারণে। মনে করো, তুমিও তাদের একজন। তোমার স্বামীর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তারা তোমাকে মা বলে। তুমি তাদের মানুষ করে তোল, প্রচুর বাৎসল্য রস পাবে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভদ্রলোক তাঁর ছেলেমেয়েদের অন্যত্র সরালেন। বাড়িতে রইল তাঁর ভাই বোন, চাঁপার ননদ দেওর। তাদেব নিয়ে চাঁপার সময় কাটত মন্দ না, কিন্তু তাদের সঙ্গ পেয়ে তার হৃদয় ভরবে কেন! স্বামীর সঙ্গ পাওয়া ভার, তাঁর পসারের ক্ষতি তিনি সইতে পারেন না, আর পসারও তাঁর অসাধারণ। সে নীলুকে চিঠি লেখে, ফোন করে, সাধে। কিন্তু নীলুরও কি উপায় আছে! তারও যে ঘরে বাইরে হাকিম, এখানে জবাবদিহি, ওখানে কৈফিয়ৎ। নীলু পরামর্শ দিলে, চাঁপা, তুমি একটা কোনো কাজ বেছে নাও। কাজ করো, কাজ করে যাও। পৃথিবীতে আমরা হৃদয় ভরাতে আসিনি, এসেছি মাটি খুঁড়তে, বাড়ি গড়তে, রাস্তা বানাতে, শহর বসাতে, ভোগোপকরণ উৎপাদন করতে, শিক্ষা বিস্তার করতে, স্বাস্থ্য বর্ধন করতে, আনন্দ দিতে ও পেতে। চাঁপা, তুমি যে কোনো একটা কাজ বেছে নাও, তা হলেই বাঁচবে।

সে এক এক করে অনেক রকম কাজে হাত দিলে, কিন্তু দিতে না দিতে

গুটিয়ে নিলে। বললে, আমার পুরী কবে নির্মাণ করবে, তাই বল? অরুণ বরুণ, কবে আনবে মুক্তা ঝরার জল, সোনার বরণ পাখি? আমি এ বাড়িতে বাঁচব না, অরুণ। আমাকে আমার নিজের বাড়ি দাও। কত লোকের বাড়ি তৈরি করো, সখীর বাড়ি তৈরি করতে পারো না?

বাস্তবিক এর কোন উত্তর নেই। ইচ্ছা করলেই নীলু পারে হাসনকে তার নিজের বাড়ি দিতে। অবশ্য মুক্তা ঝরার জল কিংবা সোনার বরণ পাখি দেওয়া তার সাধ্য নয়। শঙ্করেরও অসাধ্য। কিন্তু বাড়ি! মনের মতো বাড়ি দিতে পারবে না সখীকে! নীলু ভাবে। কিন্তু উপায় খুঁজে পায় না। মনের মতো একখানা বাড়ি মানে কত কালের সঞ্চয়। স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সখীকে দেবে তার সঞ্চয়! তা কি হয়! রত্না কী মনে করবে! সমাজ কী মনে করবে! নীলু পিছিয়ে যায়। কথা দিতে পারে না। চাঁপা একেবারে অবুঝ। যে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকার বাড়ি তৈরি করছে সে মানুষ পাঁচ সাত হাজার টাকার বাড়ি তৈরি করতে পারত না! তার কি টাকার অভাব! আর দেওঘর তো শস্তা।

ডাক্তারের টাকার অভাব নেই, চাঁপা চাইলেই সাত হাজার টাকার চেক পায়। কিন্তু চাইবে কী করে! ডাক্তার কি অরুণ বরুণ, বুদ্ধু ভুতুম! তিনি তাকে দয়া করে বিয়ে করেছেন, যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন, পারত পক্ষে অবহেলা করেন না, কিন্তু তাঁর কাছে কি সখীর মতো দাবি করা চলে! না, তাঁর সঙ্গে তেমন সম্পর্কই নয়। কোন সুবাদে চাইবে!

নীলু কিছু করলে না, পরিণামে চাঁপার আবার জ্বর হতে লাগল এবং সে কথা শুনে নীলুর মনে হলো সে-ই দায়ী। তখন সে দেওঘর মধুপুর গিরিডি অঞ্চলে জমি খুঁজতে শুরু করে দিলে রত্নাকে না জানিয়ে! বাড়িও তৈরি হলো বেনামীতে মধুপুরে। খরচ যা পড়ল তা এলো বোনাস থেকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরাবে কে? ডাক্তারকে সমঝাবে কে যে মধুপুরে না গেলে চাঁপার শরীর সারবে না? কে তাঁকে বিশ্বাস করাবে যে সেখানে চাঁপার আপন বাড়ি আছে? চাঁপার আত্মীয়দের একে একে ডাক পড়ল। তাঁদের জেরা করে ডাক্তার জানতে পারলেন তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। শেষ কালে একটা মনোমালিন্য ঘটল। চাঁপা চলে গেল মধুপুর। বছর খানেক সবুর করে সেন আবার সাদী করলেন।

চাঁপা সে কথা শুনে দুঃখিত হলো না, বরং অভিনন্দন জানালে। নীলু

তো চটেমটে লাল। বোকা মেয়ে, নিজের স্বার্থ বোঝে না। আর হতভাগা ডাক্তার, কেবল শরীরটি বোঝে। মানুষের যেন মন বলে কোনো পদার্থ নেই। কিন্তু নীলুর চোখ কপালে উঠল যখন চাঁপা লিখলে, আমি একা থাকলে মরে যাব। অরুণ, বরুণ, তোমরাও এখানে এসো। আবার আমরা হাসব, আমরা গল্প করব, গান করব, রাঁধব আর খাব। তোমরা আনবে মুক্তা ঝরার জল, অর্থাৎ অফুরন্ত জীবন। তোমরা আনবে সোনার বরণ পাখি, সোনালী রঙের শুক, অর্থাৎ সুখ। অরুণ বরুণ, তোমরা কবে আসবে?

এক বার নয়, দু'বার নয়, বার বার আসতে লাগল চিঠি। নীলু আর চুপ করে থাকতে পারলে না, গেল মধুপুর। দেখলে সখী শুকিয়ে যাচ্ছে চাঁপা ফুলের মতো। ওকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পন্থা ওর সঙ্গে সময় কাটানো। কিন্তু সময় যে বয়সে সুলভ ছিল সে বয়স তো আর নেই। এখন সময় মানে টাকা, টাকা মানে প্রাণধারণের উপায়। নীলু ওকে অনেক কিছু দিতে পারে, কিন্তু সময় দেবে কী করে? নিজের স্ত্রীকেই সময় দিতে পারে না, রোজ ঝাঁটা খায়। ঝাঁটা নয় খোঁটা, একই কথা। পরের স্ত্রীকে সময় দেবে? বাপ রে! সমাজ ফোঁস করে উঠবে না? সমাজের কথা দূরে থাক, ঘরের লোকটি কি রক্ষা রাখবে?

নীলু অনেক খরচ পত্তর করে ওর জন্যে সঙ্গিনী নিয়োগ করলে। বই কিনে দিলে। গ্রামোফোন, রেডিও, রিফ্রিজেরেটর কিনে দিলে। ওর বসবার ঘর শোয়ার ঘর ডিস্‌টেম্পার করা হলো। মার্বেল পাথর আনিয়ে মেঝে বাঁধিয়ে দেওয়া গেল।

তা সত্ত্বেও সখী বলে, ওতে আমার হৃদয় ভরবে না। আমি চাই বান্ধব বান্ধবী। বান্ধবীদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। কেউ আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয় না। এমন কি, মিনতি, যার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে সেও আমার কাছে আসবে না। তুমি একমাত্র বান্ধব যে আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছ। আর সবাই স্বার্থপর। তুতুম, তোমার কাছে আমি চির ঋণী। এ ঋণ জন্মান্তরেও শোধ হবে না। জন্মান্তরে যেন তোমার মতো বন্ধু পাই। তোমাকেই বন্ধু রূপে পাই।

"তারপর?" আমি এতক্ষণ পরে কথা কইলুম।

"তারপর?" নীলু শুকনো গলায় বললে, "আমি তার আত্মীয়দের

অনুনয় বিনয় করলুম, টাকা দিতে চাইলুম, কিন্তু কেউ কেন রাজি হবে তার কাছে থাকতে? তাদের প্রাণের দাম আছে, তারা সংসারী মানুষ, তাদের উপর নির্ভর করছে বহু অসহায় প্রাণী। তারা বললে, 'দাও ওকে কোনো স্যানিটরিয়ামে পাঠিয়ে। ভাওয়ালীতে কি মদনপল্লীতে। অন্ততপক্ষে যাদবপুরে। আমরাও সাহায্য করব।' বোঝে না যে মধুপুরে ওর নিজের বাড়ি, ওর 'মায়াপুরী,' ওখান থেকে ও কোথাও যায় তো স্বর্গে।"

"তারপর, ও কি এখনো সেইখানে আছে, না স্বর্গে?"

"তারপর, আমি সমস্ত খুলে বললুম, আমার সহধর্মিণীকে। বললুম, ও যদি মরে যায় তো আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাবে, ঝুনো নারকেলের মতো। তুমি কি তেমন স্বামী নিয়ে সুখী হতে পারো, রত্না? যদি না হও তো আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে অনুমতি দাও মাঝে মাঝে ওর ওখানে হাজিরা দিয়ে আসবার, অবশ্য উঠব আমি ডাক-বাংলোয়। তুমিও যেতে পারো আমার সঙ্গে। রত্না যখন দেখলে যে আমার ভিতরের মানুষটাই মরতে বসেছে তখন অনুমতি দিল। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলো না। এই ভাবে দু'বছর কাটল। সখী আবার সজীব হলো, তার রং ফিরল, হাসি ফুটল। মনে হলো তার সুখ না থাকলেও দুঃখ নেই। কিন্তু ওটা আমার মনের ভুল। ভিতরে ভিতরে ও শুকিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। সখ্যের অভাবে নয়, প্রেমের অভাবে। আমি তার কী করতে পারি!"

"থাক," আমি সান্ত্বনা জানালুম, "যে যাবার সে গেছে, তার কথা ভেবে মন খারাপ করিসনে। তুই তোর যথাসাধ্য করেছিস। সংসারে এই বা ক'জন করে! তুই আদর্শ বন্ধু।"

"কিন্তু ও বেঁচে আছে। হ্যাঁ, বেঁচে আছে। ভালো আছে। সুখে আছে। ও পেয়ে গেছে মুক্তা ঝরার জল, সোনার শুক পাখি।"

"য়্যাঁ! এ অসম্ভব সম্ভব হলো কী করে! করলে কে!"

"ওরই মতো এক যক্ষ্মা রোগী। মধুপুরেই ওদের আলাপ। ওরা এখন এক সঙ্গেই থাকে। আমি কিছু বলিনে। দেখেও দেখিনে শুনেও শুনিনে। জীবন বড় না নীতি বড়? মানুষ বড় না সমাজ বড়? শঙ্কর, তুই তো কবি ও সাহিত্যিক। তোর কী মনে হয়?"

উচ্ছ্বাস আমার কণ্ঠ রোধ করেছিল। কোনো মতে বলতে পারলুম, "ওরা নিরাময় হোক!"

কলকাতায় নীলুর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল এই সেদিন। রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক আসরে। রত্না ছিলেন সঙ্গে। কুশল-বিনিময়ের পর ওকে একান্তে টেনে নিয়ে সুধালাম, "সখীর খবর কী?"

"ভালো আছে। ওদের জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে। ওরা এখন তিন চারটি ছেলেমেয়ের মা বাপ।"

আমি চমকে উঠলুম। "বলিস কী! হলো কী করে!"

নীলু হেসে বললে, "হয়নি। রুগ্ণ দেখে আশ্রয় দিয়েছে। হাসন তাদের আপন সন্তানের মতো ভালোবেসে মানুষ করছে।"

"খরচ জোগায় কে?"

"যে জোগাত সেই জোগায়।"

"রত্না জানে?"

"জানে। তারও তো মায়ের প্রাণ। এত দিনে তার গ্লানি মুছে গেছে। আমাকে আর ঘরে বাইরে সংগ্রাম করতে হয় না।"

আমি তার হাতে হাতে রেখে বললুম, "নীলু, তোকে যদি ফলো করতে জানতুম ধন্য হতুম। চাঁপার সঙ্গে দেখা হলে বলিস, যে বাঁচায় সেই বাঁচে।"

(১৯৪৫)

জখ্‌মী দিল্‌

মন্বন্তরের বছর আলমোড়া গিয়ে দেখি সেখানেও মানুষের মুখে হাসি নেই। তারা বলাবলি করছে, "ডিসেম্বর মাসে এখানেও আকাল পড়বে।" শুনে নিরাশ হলুম।

নিরাশ হয়েছি, এই কথাটা ভাঙা হিন্দীতে সমঝিয়ে দিচ্ছি আমার ব্যাঙ্কারকে, খেয়াল হয়নি যে তাঁর সঙ্গে কুমাওনী ভাষায় আলাপ করেছেন যিনি তিনিও বাঙালী। তাঁর পোশাক পরিচ্ছেদ কুমাওনীদের মতো। যোধপুর ব্রিচেসের উপর গলা-বন্ধ কোট, মাথায় দেশী টুপি। কপালে চন্দনের ফোঁটা। লম্বা চওড়া জমকালো চেহারা। বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে, গোঁপদাড়ি কামানো।

ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "নৈরাশ্যের কথা যদি তুললেন তো অমন যে কাশ্মীর—যাকে ভূস্বর্গ বলে—সেখানেও মানুষ খেতে পায় না। ভারতের এমন অঞ্চল নেই যেখানে আমি যাই নি, কিন্তু কোথাও দেখিনি যে মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে।"

শাহজী কত দূর বুঝলেন জানি নে, তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি কাশ্মীর যাবার কথা ইতিপূর্বে ভাবছিলুম, কিন্তু এর পরে সে ভাবনা ত্যাগ করলুম। আমার বিমূঢ় দশা লক্ষ করে ব্যাঙ্কার বললেন হিন্দীতে, "মল্লিকজীর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই? আপ পলিটিকল লীডর থে। অব জখ্‌মী দিল্‌।"

শুনলুম ভদ্রলোক এখন এখানকার "নন্দা দেবী রেস্টোরাণ্ট"র মালিক। তখন আমার মনে পড়ল যে ইনিই তিনি যাঁর কথা স্থানীয় বাঙালীদের মুখে শুনেছি। আলিপুর বোমার মামলায় নাকি ছিলেন ফেরার আসামী।

"ওঃ, আপনি!" আমি নমস্কার করলুম। মল্লিক কিনা মল্লিকজী। তিনি বললেন, "নমস্তে।" তারপরে আমরা দু'জনেই কাজ সেরে এক সঙ্গে গা তুললুম।

মল্লিক যখন জানালেন যে তাঁর রেস্টোরাণ্ট খুব কাছেই তখন আমিও জানালুম যে আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই। চললুম তাঁর সঙ্গে।

রেস্টোরাণ্টের উপর তলায় তাঁর ফ্ল্যাট। বারান্দা থেকে হিমালয় দেখা

যায়। হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্যে তন্ময় হলুম দু'জনে। কখন এক সময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠল।

"যা বলছিলুম। কাশ্মীর গেলে যে আপনি কোটি মানুষের সুখ দেখে সুখ পেতেন তা নয়। আমি তো সারা ভারতের কোনোখানেই পাইনি। যে দেশে যা নেই তা আমি খুঁজলেও নেই, আপনি খুঁজলেও নেই। তেমন সুখ যদি দেখতে চান তো ছুটি নিয়ে ভারতের বাইরে যান। এই অভিশপ্ত দেশে—" বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

তাঁকে দেখে মনে হয় না যে কখনো ভারতের বাইরে গেছেন। আন্দামান বাদ দিলে। তাই প্রশ্ন করলুম, "ভারতের বাইরে কোন কোন দেশে গেছেন?"

"ইংলণ্ডে, সুইটজারলণ্ডে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র।"

এসব দেশ আমারও ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "ক'বছর ছিলেন?"

এর উত্তরে তিনি কী জানি কী ভাবলেন, তার পরে বললেন, "রাম যত বছর নির্বাসনে ছিলেন।"

"চো-দ্দ বছর!" আমি আশ্চর্য হলুম। কথাবার্তায়, চালচলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে তার আভাসমাত্র নেই।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না লক্ষ করে তিনি বিলিতি ধরনে হা হাআ করে উঠলেন। তারপর ফরাসীতে মাফ চাইলেন, "পার্দঁ!" তার পর জার্মান ভাষায় গান ধরলেন, "Herz mein herz sei nicht beklommen···"

হৃদয়, আমার হৃদয়, ব্যথায় কাতর হোয়ো না···

তাঁর কণ্ঠের কারুণ্য আমার নয়নপল্লবে সঞ্চারিত হলো। আমি চেপে ধরলুম, "বলুন না, কী আপনার ব্যথা। যদি গোপনীয় না হয়।"

এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সবটা মনে নেই, মনে থাকলেও লেখার সময় আসেনি। একাংশ লিখছি।

আর ভাবছি তিনি এখন কোথায়!

তখন স্বদেশীর যুগ। বয়স কাঁচা। দেশের মাটির দিকে চেয়ে আমার মনে ভাব জাগত, মাটি কি সত্যি মাটি? না চিন্ময়ী মায়ের মৃৎপ্রতিমা? আমরা প্রতিমা পূজা করি বলে ওরা যে আমাদের অবজ্ঞা করে, ওরা কি জানে

যে এই জল এই হাওয়া সবই এক একটি প্রতিমা? যাঁর প্রতিমা তিনি ভারতমাতা।

একালের ছেলেরা শুনে হাসবে, কিন্তু সেকালে আমরা সত্যি বিশ্বাস করতুম যে ভারতমাতা বলে বস্তুত কেউ আছেন, যেমন জগন্মাতা বলে কেউ আছেন। সেই ভারতমাতাকেই বন্দনা করে বলতুম, ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী। মনে মনে বলতুম, মা, তুমি যদি শক্তিময়ী তবে তোমার শক্তি কেন সুপ্ত রয়েছে! মা, তোমার শক্তির পরিচয় দাও। মহিষমর্দন করো। সিংহবাহিনী, সিংহটা যে বড় বাড়াবাড়ি করছে, মা। ওকে শায়েস্তা করো।

হাসছেন। কিন্তু তখন আমরা ভুলেও হাসতুম না। আমরা প্রত্যেকেই ছিলুম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হতুম। ভিতরের আগুন বাইরেও জ্বলত। হাসবেন, আমরা কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস করতুম যে মা একদিন আক্ষরিক অর্থে জাগবেন। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করব জাগ্রত দেবতা দশপ্রহরণ ধারণ করে দশ হস্তে সংগ্রাম করছেন। আজ কলকাতায়, কাল পাটনায়, পরশু দিল্লীতে তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করছেন। দেখব কয়েকদিন পরে একটিও শত্রু অবশিষ্ট নেই। দেশ স্বাধীন।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হলো, ওসব সত্য যুগে সম্ভব, কলি যুগে নয়। এ যুগে মা তাঁর আপন শক্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আমরাই তাঁর এক একটি হাত, আমরাই ধরব এক একটি প্রহরণ। জাগব আমরাই, আমরাই যুঝব।

তখন আমরা অস্ত্রসংগ্রহে মন দিলুম, অস্ত্রচালনা শিখলুম। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয়, কেমন করে বারুদ তৈরি করতে হয়, শেখা গেল এসব। ভেবেছিলুম কেউ টের পাবে না, জানতুম না যে দেয়ালেরও কান আছে। দলের লোক ধরা পড়ল, আমিও পড়তুম, কিন্তু বাবার ছিল ওষুধের দোকান, তলে তলে চোরাই মদের কারবার। জাহাজী গোরাদের কাছ থেকে তিনি মাল আমদানী করতেন। সেই সূত্রে জাহাজী গোরাদের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। তারাই আমাকে লুকিয়ে চালান দিল ইংলণ্ডে। তখনকার দিনে পাসপোর্টের হাঙ্গাম ছিল না। ইংলণ্ড আমাকে আশ্রয় দিল। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে রক্ষা পেলুম দ্বীপান্তর হতে। ইংরেজ আমাকে উদ্ধার করল ইংরেজের রোষ থেকে।

এই ঘটনার পর আমার ব্রিটিশ বিদ্বেষ আপনি অন্তর্হিত হলো। বিলেতে বাস করে দেখলুম ওরা রাক্ষস নয়, পশু নয়, পঙ্গপাল নয়, আমাদেরই মতো মানুষ। বিলেত দেশটাও মাটির। সে মাটিও মাটি নয়, মৃন্ময়ী মা। ভক্তি জন্মাল। মা ব্রিটানিয়াকে মনে মনে বন্দনা করলুম। বললুম, মা, তুমি জাগ্রত দেবতা। তোমার শক্তি বদ্ধ নয়, বিকীর্ণ। তোমার অভিব্যক্তি কত উপনিবেশ, কত অধীন দেশ, কত বন্দর, কত নৌঘাঁটি, কত যুদ্ধজাহাজ, কত কামান। আবার কত বড় সাহিত্য, কী মহান ধর্ম, কী উন্নত বিজ্ঞান, কী উদার গণতন্ত্র। মা, তুমি তোমারই গৌরবের জন্যে ভারতকে মুক্তি দাও।

জাহাজে উঠে নাম বদলেছিলুম। সেই নামে টাকা যেত বাড়ি থেকে বিলেতে। টাকার অভাব ছিল না। লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্যে পড়াশুনা করতুম আর সভাসমিতিতে হাজিরা দিতুম। আয়ারলণ্ড কী ভাবে তার স্বাধীনতা ফিরে পায় তাই লক্ষ করা ছিল আমার প্রধান কাজ। আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের কর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দিনের পর দিন কাটত। আইরিশদের মধ্যে তখন আরো একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার নাম শিন ফেন। এই তরুণ আন্দোলনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল। সেই সূত্রে অনেক বার আয়ারলণ্ডে গেছি। বন্ধুরা আমাকে পীড়াপীড়ি করত ডাবলিনে আইন পড়তে। কিন্তু লণ্ডনের আকর্ষণ দুর্বার। নানা দেশের আশ্রয়প্রার্থীতে লণ্ডন তখন ভরা। কেউ রাশিয়ান, কেউ চীনা, কেউ তুর্ক, কেউ পোল। তাদের আড্ডা বসত এক একটা রেস্টোরাণ্টে। আমি সে সব রেস্টোরাণ্টে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতুম না তাদের কর্মনীতি। আর তারাও বুঝত না ভারতীয় রাজনীতি। কাজেই আইরিশদের সঙ্গেই আমার বনত ভালো। অথচ মিশতে মন যেত স্বাধীন জাতিদের সঙ্গে। হাজার হোক রুশরা চীনারা তুর্করা স্বাধীন। পোলরা অবশ্য তা নয়, সেটা ব্যতিক্রম।

ভারতীয় মহলে আমার অবাধ গতিবিধি। ভারতীয়দের একাধিক দল, নরম গরম দুই দলের সঙ্গে আমার সামাজিকতা ছিল, কিন্তু গভীর সম্বন্ধ ছিল কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। ওঁর ওখানে কেউ এলেই ডাক পড়ত আমাকে। একবার দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যারিস্টার এসেছেন। গান্ধী তাঁর নাম। চমকে উঠলেন যে! হাঁ, আপনাদেরই মহাত্মা গান্ধী। তখন তিনি মহাত্মা ছিলেন না, ছিলেন নিতান্তই মিস্টার। তখন আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই

নিরীহ গোবেচারি একদিন ভারতের মহানেতা হয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তবে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে ধাক্কা লেগেছিল। পরে আমরা সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে।

ওঃ আপনি শুনতে চান কী কথাবার্তা? আচ্ছা, বলছি। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, যদিও ১৯০৮ কি ১৯০৯ সালের কথা। সাবারকার সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাঁ, আপনাদেরই বীর সাবারকার। আশ্চর্য! না? কে জানত তিনি একদিন হিন্দু মহাসভার কর্ণধার হবেন। কই, তেমন কোনো হিঁদুয়ানি তো তখনকার দিনে দেখিনি। যা হোক, যা বলছিলুম।

সাবারকার সুধালেন গান্ধীকে, "মনে করো মস্ত একটা সাপ তোমার দিকে ফণা তুলে তেড়ে আসছে। তোমার পালাবার পথ নেই, পিছনে গভীর খাদ। তোমার হাতে একগাছা ছড়ি আছে, তা দিয়ে ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষা করা যায়। তখন তুমি কী করবে? মারবে, না মরবে?"

গান্ধী এক মুহূর্ত ভাবলেন না, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ছড়িখানা আমি ফেলে দেব, পাছে আমার লোভ জাগে তাকে মারতে।"

অবাক হচ্ছেন। অবাক হবারই কথা। এমন কথা আমি জন্মে কখনো শুনি নি, তাই পঁয়ত্রিশ বছর পরে আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"I would drop the stick lest I should feel tempted to kill it."

সেদিন সেখানে আমরা যে কয়জন উপস্থিত ছিলুম সকলের শ্বাস উড়ে গেল। ছড়ি ফেলে দিলে সাপ কি আমাদের ছাড়বে! মনের সুখে গিলবে। সাবারকার বললেন, "গান্ধী, তুমি আমার ধর্মগুরু হতে পারো, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে অক্ষম।" সে কথা আমাদের সকলের মনের কথা।

গান্ধী কিছুদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেলেন, আমরাও ভুলে গেলুম তাঁকে। রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার কোনো মানে হয় না, ওটা নিছক পাগলামি। তাই আমরা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করি নি। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল সাধারণত এই যে, স্বরাজ কি যোগ্যতার প্রমাণ দিলে পাওয়া যাবে, না অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নিতে হবে? অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়াই যদি স্থির হয় তবে অস্ত্র কোথায় পাব? অস্ত্র পেলেও অস্ত্রশিক্ষার কী উপায়?

আমাদের মধ্যে জন কয়েক ছিলেন, তাঁরা বলতেন, জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ একদিন বাধবেই, তখন অস্ত্র জোগাবে জার্মানী, অস্ত্রবিদ্যাও সেই শেখাবে।

এত বড় কথা ভাবতে আমার ভয় করত। তা ছাড়া আমি ছিলুম সত্যি সত্যি ইংরেজভক্ত। না, রাজভক্ত নয়, ইংরেজভক্ত। যুদ্ধে জার্মানীর চর হওয়া যদি অস্ত্রসংগ্রহের ও অস্ত্রশিক্ষার একমাত্র উপায় হয় তবে চাইনে ওসব। কিন্তু আমার ও আমার মতো অনেকের তখন ধারণা ছিল অন্য উপায় আছে। সে উপায় যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেওয়া।

যুদ্ধ যখন বাস্তবিক বাধল তখন আমাদের সেই ক'জনকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁরা ততদিনে বার্লিনে। আমরা গিয়ে কর্তাদের জানালুম, আমরা লড়তে প্রস্তুত, সৈন্যদলে আমাদের নেওয়া হোক। আমার নিজের পক্ষপাত আর্টিলারির উপর। অনেক দিনের সাধ গোলন্দাজ হতে। তদ্বির করলুম। কিন্তু ভবী কেন ভুলবে! কর্তারা বললেন, তোমাদের চেহারা সুবিধের নয়, অর্থাৎ রাজনীতি সুবিধের নয়।

তখন যে যার নিজের কাজে মন দিল। আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারলুম না। এত বড় সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না। এমন সুযোগও ব্যর্থ গেল। এ জীবন রেখে লাভ! মনের অসুখ শরীরে সংক্রামিত হলো। ডাক্তার বলল, সুইটজারলণ্ডে না গেলে সারবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বে ইংলণ্ড থেকে বিদায় নিলুম। সুইটজারলণ্ডে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা দেশ, সেও কেমন স্বাধীন, কেমন সমৃদ্ধ! পর্বতকে মানুষ বশ করেছে, তার পিঠে শহর বসিয়েছে। সেখানে যত রকম আরাম পাবে, যত রকম খেলা, যত রকম আমোদ। সুইটজারলণ্ড আমার ইংলণ্ডের চেয়েও ভালো লাগল। সেখানেও নানা দেশের রাজনৈতিক শরণাগত।

সুইটজারলণ্ডে থাকতে খবর পেলুম রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, সেদেশে যা ঘটেছে তার নাম নাকি বিপ্লব। উল্লাসে অধীর হলুম। ইচ্ছা করল সে দেশে উড়ে যেতে, কিন্তু উড়ব কী করে? ডানা নেই যে। দেখলুম শরণাগতরা সবাই উত্তেজিত। বিপ্লব যদি এক দেশে ঘটল তবে অন্য দেশেও ঘটবে। অস্ট্রিয়াতে, জার্মানীতে, তুরস্কে। আমি মনে মনে জুড়ে দিলুম, ভারতেও। যেই ও কথা ভাবা অমনি শরীর সেরে যাওয়া। আমি আমার লুৎসার্নের বন্ধুদের ডেকে ভোজ দিলুম। কিন্তু কে জানত সেই বছরই সেই রুশদেশেই আর এক দফা বিপ্লব ঘটবে। কেন ঘটল কিছুই ঠাহর হলো না। আমার রুশ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলুম। তাঁরা তো রেগে টং। আমার উপর নয়, বোলশেভিকদের উপর।

বললেন, ওরা ডাকাত, ওরা চোর, ওদের ওটা বিপ্লবই নয়, ওটা বর্গীর হাঙ্গামা।

কিন্তু আমার সন্দেহ মিটল না, উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। আমার এক মার্কস্‌পন্থী আলাপী ছিলেন, তিনিই আমাকে ধীরে ধীরে বোঝালেন মানুষের ইতিহাসটা শ্রেণীসংঘাতে ভরা। ওর একটা বিশেষ অধ্যায় এক দিন আরম্ভ হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবে, বুর্জোয়া আধিপত্যে। এতদিনে শেষ হলো কেরেন্‌স্কীর পতনে, বুর্জোয়াদের মূর্চ্ছায়। এখন থেকে শুরু হলো ইতিহাসের শ্রমিক অধ্যায়। সব দেশেই এই হবে। এ কথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জারের সঙ্গে জারতন্ত্রের সঙ্গে একশো বছর ধরে যুঝল যারা তাদের প্রাণদানের, তাদের নির্বাসনের, তাদের কারাভোগের এই কি পুরস্কার! ছ'সাত মাস রাজত্ব করতে না করতে রাজ্যকাল গেল ফুরিয়ে! শেষ হয়ে গেল তাদের যুগ, সেই লক্ষ লক্ষ শহীদের পুরস্কারের যুগ! এর উত্তরে মার্কস-পন্থী বললেন, ইতিহাস তাদের মেরে রেখেছে, লেনিন তো নিমিত্তমাত্র।

ইতিহাস পড়িনি, এই যদি হয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা তবে ইতিহাস পড়ে সুখ নেই। ভারতমাতাকে মনে মনে ডেকে বললুম, মা, আমরা যে তোমাকে এতকাল বন্দনা করে আসছি, তোমার জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলছি, দ্বীপান্তরে মরছি, কারাগারে পচছি, সে কি এইজন্যে! এই কি তোমার ন্যায়বিচার যে আমরা দু'দশ মাস রাজত্ব করেই সিংহাসন থেকে নামব, আর সেই সিংহাসনে উঠবে শ্রমিক শ্রেণী! তা হলে আমরা কেন এমন করে বুকের রক্ত পাত করছি!

এর পরে কিন্তু আমার ভগবানে বিশ্বাস চলে গেল, সুতরাং ভারতমাতায়। জগতে যদি ন্যায়বিচার না থাকে তবে ভগবানও থাকেন না। দেশজননীও না। রাশিয়া থেকে আরো শরণাগত এসে জুটল, এবার বোলশেভিকদের অত্যাচার থেকে। তাদের মুখে শ্রেণীবিদ্বেষের কথা শুনতে শুনতে আমার ধারণা জন্মাল যে ইতিহাসটা শ্রেণীসংঘাতে ভরা। তাই যদি হলো তবে বুর্জোয়ারা চির দিন রাজত্ব করতে পারে না। দু'মাস পরে হোক, দু' শতাব্দী পরে হোক, এক দিন না এক দিন তাদের পুনর্মূষিক হতে হবেই। ত্যাগ করলেও যে পরিণাম, ত্যাগ না করলেও সেই একই। ত্যাগ তবে করব কেন? করব ত্যাগের জন্যেই।

বুকটা দমে গেল। তার আগে আমার বুকের ব্যামো ছিল না, তখন

থেকে হলো। স্বৈরতন্ত্রের অবসানের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদেরই পরিবারের লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে প্রাণ নিয়ে। এরা এখন নিঃস্ব। দেশ থেকে কেউ এদের টাকা পাঠাবে না, এরা বিদেশীর দয়ানির্ভর। একদিন ভারতেও কি এই রকম হবে, এই ভাবে দেশান্তরী হবে আমার আত্মীয় স্বজন? এই কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধারা?

এর পরে জার্মানীতে বিপ্লব ঘটল ও সে বিপ্লব বিফল হলো। বিপ্লব তা হলে সব দেশে সফল হয় না। আমি আশ্বস্ত হলুম। হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় একটা দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে গেছল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্যারিসে গিয়ে হাজির হলুম ও বাসা করলুম পীস কন্‌ফারেন্স দেখতে। ভের্সাইতে যেদিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন আমি ছিলুম সেখানে। জার্মানীর লাঞ্ছনা দেখে আমার চোখে জল এলো। ভাবলুম জার্মানদের বিপ্লব যদি সফল হতো তা হলে কি ভের্সাইতে তাদের এ দশা হতো! মনে হলো, মধ্যবিত্তদের মাজা দুর্বল, অতি সহজেই তারা অপমান মাথা পেতে নেয়. ইতিহাস তাই তাদের ঘাড়ে ভের্সাই চাপিয়ে দেয়।

ফল হলো এই যে আমার স্বশ্রেণীর প্রতি আমার অনাস্থা জন্মাল। আমার নিজের অলক্ষ্যে মার্কস্‌পন্থী হয়ে উঠলুম। না, কমিউনিস্ট না। এমনি সাধারণ অর্থে মার্কসিস্ট। ক্রিয়াকর্মে নয়, মতবাদে। হিন্দুর ছেলে ব্রাহ্ম-সমাজে নাম না লিখিয়ে তো নিরাকারবাদী হয়। আমিও তেমনি কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসিস্ট। আমার জীবনে এক নতুন পৃষ্ঠা খুলে গেল। প্রতিমা-পূজক আমি, সর্বপ্রথমে ভাঙ্‌লুম ভারতমাতার প্রতিমা। "বন্দে মাতরম্"এর উপবীত বর্জন করলুম। অতঃপর বহু দেশ ঘুরি, কিন্তু রাশিয়ায় যাবার ছাড়পত্র পাইনে। হয়তো আরো কিছু দিন পরে পেতুম। কিন্তু দেশে ফেরবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। মস্ত ভুল করলুম দেশে ফিরে। আমার ধারণা ছিল দেশ একেবারে বদলে গেছে এবং সে পরিবর্তন দেখবার মতো। অনেক তদ্বির করে দেশে ফেরবার অনুমতি পাই। অভয় পাই যে আর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে না। আমার সহকর্মীরা মার্জনা পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরেছিলেন। অতএব আমাকে মার্জনা করা কঠিন হলো না।

দেখলুম জোর অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তার নেতা হয়েছে গান্ধী। গান্ধীর মতো অদ্ভুত লোককে যারা নেতা করতে পারে তারা সব পারে। দেশের মতিগতি আমাকে হতাশ করল। রাজনীতিক্ষেত্রে জৈনধর্মের প্রয়োগ

দেখে আমি তো ধরে নিলুম দেশ তিন হাজার বছর পেছিয়ে যাবার উদ্‌যোগ করছে। একে তো দেশটা যারপরনাই গরম, তার উপর খদ্দর পরবার ফরমায়েশ শুনে মেজাজ গেল বিলকুল বিগড়ে। তার পরে যখন কানে এলো যে মদ খাওয়া পাপ তখন আমি পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করলুম। ইউরোপে ফিরে যাবার পাসপোর্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ভক্তেরা রটিয়েছিল যে আমি আয়ারলণ্ডে গিয়ে গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছি ও বাংলাদেশের ছেলেদের ও বিদ্যা শেখাতে চাই। খবরটা সরকারী মহলে আতঙ্ক সঞ্চার করে। তার ফলে আমার পাসপোর্ট পাওয়া তো হলোই না, তার বদলে হলো মাদ্রাজের ভেলোর জেলে বিনা বিচারে অবরোধ। মদ খাওয়া যখন কপালে লেখেনি তখন কী আর করি। ঘটর ঘটর করে চরকা ঘোরাতে শুরু করে দিলুম। মাছমাংস ছাড়তে হলো মাদ্রাজীদের রান্নার সঙ্গে অসহযোগ করে। সকলেই স্বীকার করল যে অসহযোগী বটে। কিন্তু গরমে মারা যাচ্ছিলুম। গবর্নমেণ্টকে লেখালেখি করে বদলি হলুম এই আলমোড়ায়। মানে আলমোড়া জেলে। ছাড়া পেলুম তিন বছর পরে।

ছাড়পত্রের আশা ছিল না। অথচ ইউরোপের আকর্ষণ তীব্র। চললুম বম্বে, সেখানে একটা রেস্টোরাণ্ট খুলে বসলুম। বিনা খরচে মদ খাবার ফন্দী। জাহাজ ভিড়লেই আমি যাই ইউরোপীয় যাত্রীদের সঙ্গে ভাব করতে, তাদের ধরে এনে মদ খাওয়াতে, মদের গেলাসের উপর গল্প জুড়তে। ইউরোপের তাজা খবর সেই ভাবে আমার কানে আসত, আর সেরা মদও আসত আমার সেলারে। বম্বে আমার বেশ স্যুট করেছিল, মাঝে মাঝে সেখান থেকে জলপথে সিংহলে বেড়িয়ে আসতুম, কলম্বোতে বড় বড় জাহাজ ধরতুম। ইউরোপের স্বাদ পেতুম সেসব জাহাজে। বয়স থাকলে আবার পালাতুম তার কোনো একটা জাহাজে, কিন্তু এত বয়সে আর অ্যাডভেঞ্চার সাজে না। ধরা পড়লে জেল।

বম্বে থাকতে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কংগ্রেসে ঢুকে দেখলুম ওর নেতারা কেউ দিগম্বর জৈন নন, গান্ধীকে ওঁরা মান্য করেন অন্য কারণে। সে কারণটি এই যে গান্ধীই একমাত্র লোক যিনি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কাকে বলে জানেন। যেই সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের দিন ঘনিয়ে এলো অমনি আমিও চরকা কেটে খদ্দর পরে মদের শেষ স্বাদ নিয়ে তালগাছ খেজুরগাছ কাটবার জন্যে তৈরি হলুম। আমার মার্কসীয় বস্তুবাদ আমাকে

নিবৃত্ত করতে পারল না, আমি গলা ছেড়ে হাঁকলুম, "বন্দে মাতরম্!" "আল্লা হো আকবর!" "মহাত্মা গান্ধীকী জয়!"

থাক, আর বাড়াব না। কয়েক বছর পরে ভাঙা মন নিয়ে জেল থেকে বেরোবার আগে ভালো করে মার্কস্ লেনিন পড়েছিলুম, পড়ে গান্ধীজীর ব্যর্থতার হেতু উপলব্ধি করেছিলুম। ইচ্ছা ছিল নতুন উদ্যমে কাজে লেগে যাব, কিন্তু বুকের ব্যামোর জন্যে বাধ্য হয়ে বঙ্গের মায়া কাটাতে হলো। আলমোড়ার সুবিধে এই যে এখানে চুপচাপ থাকা যায়। অন্যান্য হিল স্টেশনের মতো হৈ চৈ নেই। আর হিল স্টেশনে থাকার কারণ গরম আমার একেবারে সহ্য হয় না। ইউরোপ আমাকে মাটি করেছে। তাই দিন রাত ভাবি, কবে আবার ছাড়পত্র পাব। দরখাস্ত করেওছি কয়েক বার। কিন্তু যুদ্ধ না থামলে আশা নেই।

আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ খুব শীগগির থামবে? না, আমারও সে ভরসা নেই।

সেদিন মল্লিকজী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না, কাজেই আমিও তাঁকে অনুরোধ জানালুম একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী যখন তাঁকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন তখন জবাব এলো তাঁর ভাগনের কলম থেকে। মল্লিকজী নেই, নৈনিতাল গেছেন, কবে ফিরবেন বলে যাননি। আমরা ক্ষুণ্ন হলুম।

এ কথা শুনে আমার আলমোড়ার বন্ধু লাহিড়ী বললেন, "ক্ষেপেছেন! মল্লিকজী আসবেন আপনার হোটেলে খেতে! আপনার হোটেলের বাবুর্চি যে মুসলমান এ খবর কে না রাখে!"

আমি আহত হয়ে বললুম, "কিন্তু মল্লিক যে ইউরোপে চোদ্দ বছর ছিলেন!"

"হাঁ, কিন্তু সে মল্লিক আর নেই। এঁর নাম মল্লিকজী, এঁর কত বড় চন্দনের ফোঁটা, আপনি বোধ হয় লক্ষ করেননি যে বড় বড় চুলের সঙ্গে এক গোছা টিকিও আছে।"

"কিন্তু তিনি যে মার্কসীয় বস্তুবাদে বিশ্বাসবান।"

"বোধ হয় সেইজন্যেই বস্তু ভালো বোঝেন। টাকা চেনেন।"

কিন্তু প্রকৃতই তিনি নৈনিতাল গেছলেন। আমি অন্য সূত্রে জেনেছিলুম।

লাহিড়ী তা শুনে তামাশা করলেন, "তা হলে আপনার নিমন্ত্রণ এড়ানোর জন্যেই তিনি নৈনিতাল গেছেন। আপনি থাকতে ফিরছেন না।"

লাহিড়ী আমাকে খুলে বললেন যে মল্লিকজী ব্যবসাদার মানুষ, জাতধর্ম মেনে চললে এই ঘোরতর নিষ্ঠাবান শহরে পসার জমে ভালো।

মাস খানেক পরে উদয়শঙ্করের স্টুডিয়ো থেকে আসছি, পথে মল্লিকজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। লক্ষ করলুম সেদিন তাঁর পরনে ইউরোপীয় পোশাক। হালকা গ্রে রঙের স্যুট, ফেল্ট্ হ্যাট। কপালে চন্দনের চিহ্ন ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, "ভালো কথা, আপনার বাবুর্চি কেমন রাঁধে?"

"কেমন রাঁধে তা আসুন না পরখ করে দেখবেন। কবে আসতে পারবেন বলুন।"

"তার কি আর সময় আছে, ভাই! আমাকে যে কাল নৈনিতাল ফিরে যেতে হবে। সেখানে নতুন একটা রেস্টোরাণ্ট খুলছি কি না। নাম রাখছি রেস্তোরাঁ আঁতেরনাসিওনাল (Restaurant Internationale)।"

"তাই নাকি?" আমি চমৎকৃত হলুম। "তা হলে কি আপনি এখানকার পাট তুলে দিচ্ছেন?"

"না। এখানকার ভার নিচ্ছে আমার ভাগনে।"

"কিন্তু হঠাৎ নৈনিতাল!"

"ঠিক হঠাৎ নয়। ভাবছিলুম অনেক দিন থেকে। পাসপোর্টের জন্যে এখন থেকে তদ্বির না করলে নয়। আর তদ্বির করার মোক্ষম পদ্ধতি হলো উদরের অভ্যন্তর দিয়ে।"

আমি হাসলুম। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "বুঝছি আমার পতন হলো। কিন্তু পতন কি এই প্রথম? এতদিন যে মল্লিকজী সেজে আলমোড়ায় বসেছিলুম সেই বা কম কী! আসল কথা, আমার কিছু পুঁজি চাই। কী নিয়ে ইউরোপে যাব? আর তো বাবা নেই যে বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবেন।"

শেষের উক্তিটিতে করুণ রস ছিল। আমি সমবেদনায় আপ্লুত হলুম। বললুম, "কিন্তু দেশ যে আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, মল্লিক—"

"—জী না। শুধু মল্লিক।" তিনি আমার কোটের বাটন্‌হোলে আঙুল ঢুকিয়ে একটু অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, "দেশ যখন তৈরি হবে তখন আবার আসব। যদি বেঁচে থাকি।"

তার পর তিনি জানতে চাইলেন তুলনকে তালিম দিলে সে কি 'বফ রোতি' 'রাগু অ মুতোঁ' ইত্যাদি বানাতে পারবে? আমি পরিহাস করলুম, "রোস্ট বীফ বানালে চেখে দেখবে কে? আপনি?"

তিনি অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন। বললেন, "ও না খেলে আমার তাকত ফিরবে না। কিন্তু রোস্ট বীফ নয়। বফ রোতি। আমার ওখানকার মেন্যু ছাপা হবে ফরাসী ভাষায়। যুদ্ধের হিড়িকে আজকাল কত রাজ্যের লোক আসছে, তাদের সঙ্গ পাওয়া আমার চাইই চাই। আপাতত ওই আমার ইউরোপ, আমার সঞ্জীবনী। রায়, তোমাকেও আসতে হবে একদিন। বৌমাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো, ভাই। তিনিও যদি আসেন তো সত্যি খুশি হব।"

(১৯৪৫)

বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী

আর কেউ নয়, আমিই। আমাকেই একবার ঘটকালি করতে হয়েছিল মকরকেতুর কৌতুকে। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ ছিল অন্যরূপ। সেই ইস্তক ওকর্মে ইস্তফা দিয়েছি।

কাজলদির সঙ্গে প্রথম দেখা এক বিয়েবাড়িতে। দূর সম্পর্কের দিদি, দূর দেশে থাকে, আর্থিক ব্যবধানটিও সুদূর। কাজেই তার আগে দেখা হয়ে ওঠেনি। দেখা যখন হলো তখন আমার বয়স দশ এগারো, দিদির বয়স বারো তেরো। কে জানত যে পরবর্তী জীবনে দিদির বয়স আমার চেয়ে দু'এক বছর কমবে ও দুনিয়ার লোকের সামনে সে আমাকে দাদা বলে ডাকবে।

বিচিত্র জীবন। ইংলণ্ড যেদিন ছাড়ি তার একদিন আগে হঠাৎ একজন আমাকে বললেন, "ওহে, তুমি তো চললে, তোমার ছোটবোনের দেখাশোনা করবে কে?"

"আমার ছোটবোন!" হতভম্ব হলুম। "আমার ছোটবোন কবে বিলেত এলো।"

"সে কী! মিসেস বক্সী কি তোমার ছোটবোন নয়?"

"মিসেস বক্সী! কোন মিসেস বক্সী?"

"কেন, রোমা? দিল্লীর রোমা?"

তখন আমার মনে পড়ল যে কাজলদির শ্বশুরকুলের পদবী বক্সী ছিল বটে। কিন্তু কাজলদির তো বিলেত আসার কথা ছিল না। থাকলে আমি জানতুম।

ঠিকানাটা জোগাড় করে সেই দিনই লণ্ডনের এক মেয়েদের হস্টেলে দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। যেই ডাকব "কাজলদি" অমনি সে তার মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললে, "চুপ। চুপ।" সে বাড়িতে আরো জনকয়েক বাঙালী তরুণী ছিলেন। এবং ছিলেন ইংরেজ তরুণীরা। কাজলদি ফিস ফিস করে বললে, "এই যে অনুদা, এসো। তোমার কথাই হচ্ছিল। এঁদের বলছিলুম এখানে আমার এক দাদা আছেন, তিনি আই সি এস।" তার পরে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "May I introduce my elder brother……"

কিন্তু বিলেতের কথা পরে। দেশের কথা চলছিল, দেশের কথাই চলুক। সেদিন সেই বিয়েবাড়িতে মল্লযুদ্ধ বেধেছিল দু'দল ছেলেতে। তাদের এক দলে ছিল কাজলদির ভাই টোগো, আরেক দলে ছিলুম আমি। কাজলদি এসে আমাদের এক এক জনের হাতে এক একটা নাড়ু ধরিয়ে দেয়। তখন আমরা "আর একটা, আর একটা" বলে এক সঙ্গে আবেদন জানাই। এই একটু আগে যারা মহাশত্রু ছিল তারাই হয়ে দাঁড়াল মহামিত্র। সকলেরই আরাধ্য কাজলদি। সে যেন শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি। আর আমরা যেন দেবাসুর।

বিয়েবাড়ির সেই মজা আমার অনেক দিন মনে ছিল। প্রায়ই মনে পড়ত কাজলদিকে, তার মোহিনী মূর্তিকে। যখন তখন যাকে তাকে কথায় কথায় বলতুম, "আমার কেমন কাজলদি আছে, কী সুন্দর দেখতে, কী রকম খাইয়েছিল আমাকে।" এটাও শোনাতে ভুলতুম না যে কাজলদির বাবা মস্ত বড় সরকারী চাকুরে। আর সেই কাজলদি কিনা আমার আপন মামীমার পিসতুতো ভাইয়ের মেয়ে।

আমি খুব আশা করেছিলুম যে, অত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা কাজলদির স্মরণ থাকবে। কিন্তু বার বার চিঠি লিখেও তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মনটা দমে গেল। তারপরে তার কথা এক রকম ভুলেই গেছলুম। অকস্মাৎ আমার নামে একফলক চকোলেট এসে পৌঁছল, তার গায়ে লেখা ছিল, "এই তোমার চিঠির জবাব। স্নেহশীলা কাজলদি।"

খুব খুশি হইনি, কারণ আমি চেয়েছিলুম খবর, দিদি পাঠালে খাবার। মনের খোরাকের বদলে মুখের খোরাক। খাবার অবশ্য তুচ্ছ নয়, বিশেষত চকোলেট। কিন্তু আমার বারো তেরো বছর বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে একখানা চিঠি ওর চেয়ে আরো তৃপ্তিকর। যা হোক, চকোলেটখানা আমি তুলে রাখলুম, খেলুম না, খেতে দিলুম না। অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল ওটা।

তার পরে চিঠি লিখিনি। হয়তো ঠাওরাত, ছেলেটা কী হ্যাংলা! কবে একটা নাড়ু খাইয়েছিলুম, সেই থেকে আরো কিছু খাবার ফন্দীতে এসব চিঠি। এই তো সেদিন একটা চকোলেট আদায় করলে। তবু—

কে জানে হয়তো এও ঠাওরাবে যে বাপ মা গরিব, কোথায় পাবে খেতে, দিই একটা কেকটেক পাঠিয়ে।

কী লজ্জা! আমি চকোলেটখানা বাক্স থেকে বার করে পাড়ার ছেলেদের ডেকে ভাগ করে খাওয়াই ও খাই।

সে ঘটনাও ভুলে গেছলুম।

তার পরে যখন আমার বয়স ষোলো সতেরো—উঁহু, সতেরো আঠারো—তখন কলেজের ছুটিতে পুরী গিয়ে দেখি, কাজলদি। বেচারির পোড়া কপাল। বিয়ের ক'দিন পরেই বিধবা। কী চেহারা ছিল, কী হয়েছে। চোখে জল আসে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে, যেই বললুম, "কাজলদি, কবে বিয়ে করলে, খবর দিলে না কেন!" তা দেখে আমিও আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারলুম না।

কিছুদিন আগে আমারও মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সহানুভূতির কাঙাল ছিলুম আমি। কাজলদিকে সে কথা বলায় সে তার হৃদয়ের সব সুধা ঢেলে দিলে। "দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী, নয়নে জল ঝরে অনিবার।"

আমি ওকে রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি" পড়ে শোনালুম। কতটুকু সান্ত্বনা পেলে জানিনে, কিন্তু আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "অমু, তুমি আমাকে বাঁচালে।"

এর পরে আমাদের চিঠি লেখালেখি চলেছিল দু'চার মাস। পুরী থেকে ও আরো দক্ষিণে যায় তীর্থ করতে। আমি ওর ঠিকানা হারিয়ে ফেলি কি ওই আমার চিঠি খোয়ায়। যে কারণেই হোক চিঠি লেখালেখি আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

বছর দুই পরে কলকাতায় কাজলদির সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্যে দেখা। তাঁদের ওখানেই প্রথম দেখি রাখালদাকে। আমার কাকিমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে রাখাল চৌধুরী। অত্যন্ত ছটফটে লোক, এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। ছাদের উপর পায়চারি করতে করতে কাজলদির তৈরি আইসক্রীম খাচ্ছিলেন, আর কাজলদিকে আপনি বলছিলেন। শুনলুম দিদির টিউটর। তীর্থভ্রমণের পর দিদির পড়াশুনায় মন গেছে, প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিচ্ছে। কলকাতায় তার বাবা, মিস্টার সরকার, সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন। দিদি এখন বাপের বাড়ি থাকে। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। ক'টা দিনেরই বা সম্বন্ধ।

লক্ষ করলুম দিদির মুখখানি শরতের আকাশ। ক্ষান্তবর্ষণ। মেঘ ভাসছে, কিন্তু শাদা মেঘ। দিদি যেন একটা স্থিতি পেয়েছে। তার ফলে

তার চেহারাও কতক ফিরেছে। আমাকে বললে, "পড়াশুনায় তুমি আমার চেয়ে তিন বছর এগিয়ে গেছ। অতএব তুমি আমার দাদা।"

তখন ঠাহর হয়নি যে সেই সুবাদে কাজলদি আমাকে দাদা বলে ডাকবে। আবার যখন কলকাতায় দেখা হয় মাস ছ'য়েক বাদে তখন দাদা ডাক শুনে চমক লাগল। সেবারেও আমার সময় ছিল না। সেবারে কিন্তু রাখালদাকে দেখিনি।

তারপরে মিস্টার সরকার শিলং বদলি হয়ে যান, কাজলদিও ম্যাট্রিক পাস করে। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলুম, তার উত্তরে সে লিখেছিল, "যেন তোমাদের যোগ্য হতে পারি।"

আড়াই বছর পরে পাটনায় খবর পেলুম নতুন পোস্টমাস্টার জেনারেলের নাম সরকার এবং তাঁর ছেলের নাম টোগো। বাপের চেয়েও ছেলের নামডাক বেশী, ও নাকি মোহনবাগানে খেলত। টোগো একদিন আমাদের কলেজে এলো, ভর্তি হলো আমার নিচের ক্লাসে। আমাকে দেখে চিনতে পারলে না, কিন্তু আমার নাম শুনে বললে, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ও নামে আমার এক দাদা ছিলেন বটে।" আমি যতই বলি, "আমি বয়সে ছোট", সে ততই বলে, "তা হলে আপনি অন্য লোক।" বুঝতে সময় লাগল যে, টোগোর মানহানি হয় যদি কেউ বলে সে বয়সে বড় হয়েও নিচের ক্লাসে পড়ে। অগত্যা আমাকেই দাদা সাজতে হলো। তখন টোগো আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

কী আশ্চর্য, কাজলদির মা মিসেস সরকারও রায় দিলেন যে আমি টোগোর চেয়ে তো বটেই কাজলের চেয়েও বয়সে বড়। এবং আমার মতো অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানোর জন্যে কাজল ও টোগো দু'জনেই দু'খানা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট এনে দেখালে। তাতে বয়সের ঘরে যা লেখা ছিল তা যদি সত্য হয় তবে "স্নেহশীলা কাজলদি"র অনেকগুলি চিঠির স্বাক্ষর ঝুটো।

এবং সব চেয়ে আশ্চর্য কাজলদি অম্লানবদনে বললে, "তুমি আমাকে দিদি সম্বোধন করে চিঠি লিখতে বলে আমার কেমন যেন একটা ধারণা জন্মায় যে আমিই বড়। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি ওটা আমার ভুল। ও ভুল আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, অনুদা।"

এর পরে আমিও ওকে সরাসরি কাজল বলে ডাকতে শুরু করি। তা শুনে ও এত খুশি হয় যে ঠিক ছোট বোনের মতো আমাকে যত্ন করে খাওয়ায়।

হস্টেলের রান্নায় আমার অরুচি ধরেছিল, আমি তো বর্তে গেলুম। বললুম "শুধু দাদা কেন ঠাকুরদাদা হতেও রাজি আছি, যদি হপ্তায় একবেলা তোমার হাতে খেতে পাই।"

শনিবার বিকেলে ওদের ওখানে আমার বাঁধা নিমন্ত্রণ। ফিরতে রাত হয় বলে রাতের খাওয়াটাও সেরে আসি। ক্রমশ রবিবার বিকেলেও অনাহূত উপস্থিত হই, এবং হস্টেল থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরি। কাজলদি আমাকে স্টোভে রেঁধে খাওয়াত। বিধবা বলে ও স্বপাক রেঁধে খেত। কিন্তু ওর নিরামিষের তালিকায় মাছ-মাংস ছিল। ডাক্তারের হুকুম। তাতে আমারই সুবিধে। আমিও সায় দিয়ে বলতুম, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।"

কিন্তু মাছ-মাংস খেলে হবে কী, দিনরাত যা পড়া সে পড়ত তার ফলে তার শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। এমন কি রাঁধতে রাঁধতেও বইয়ের পাতা ওলটাত। আমাকে জিজ্ঞাসা করত যত সব কেতাবী প্রশ্ন। যা খাওয়াত তার দাম আদায় করে নিত আমাকে সমস্তক্ষণ বকিয়ে।

"আচ্ছা, কাজল," আমি মাঝে মাঝে রাগ করতুম, "তুমি যে ঐ অতটুকু খেলে ওতে কি তোমার পড়াশুনা চালিয়ে যাবার মতো সামর্থ্য হবে?"

"বিধবা মানুষের," সে জবাব দেয়, "ওর বেশী খেতে নেই।"

এ নিয়ে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া বাধত। আমি বলতুম, "তুমি কিসের বিধবা! বিয়ের একমাসও যায়নি—"

"আমি তবে কী?"

"কুমারী।"

সে মনে মনে খুশি হতো, কিন্তু বাইরে বিরাগের ভান করত। "ওমা! বিয়ে হলো, সব হলো, কুমারী! ছি! কী যে বল, দাদা।"

একদিন আমি তাকে গম্ভীরভাবে বললুম, "দাদা বলেছ যখন, তখন দাদার কথা শুনতে হবে।"

"কী কথা?"

"তুমি যে দিন দিন অমন করে শুকিয়ে যাচ্ছ এ আমার চোখে সয় না। আমি আর আসব না, যদি এর প্রতিবিধান না করো।"

"প্রতিবিধান!" সে একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "তবে কি তুমি চাও আমি

পড়াশুনা বন্ধ করে দিই? দিলে কী নিয়ে থাকব? বিধবা মানুষের একটা অবলম্বন থাকা চাই তো।"

"আবার বিধবা! বিধবা নয়, কুমারী।"

"বেশ, বিধবা নয়, কুমারী। কিন্তু কুমারীরই বা করবার কী আছে!"

"কেন, বিয়ে?"

"বিয়ে দেবে কে? তুমি?"

"কেন, তোমার মা-বাবা?"

"মা বলেন, পড়ছে পড়ুক, কিন্তু বিয়ে আমি কিছুতেই দেব না। বিদ্যাসাগরের মুয়ে আগুন। আর বাবা বলেন, দিতে পারি, যদি বিনা পণে আই সি এস, কি, আই এম এস পাত্র পাই।"

আমি হেসে বললুম, "আর টোগো?"

"টোগো বলে, আমি ম্যাচ বলতে বুঝি ফুটবল ম্যাচ। আর কোনো ম্যাচ বুঝিনে। নিজেও করব না, তোমাকেও বিয়ে করতে বলব না। ভাইবোনে যেমন আছি তেমনি থাকব চিরকাল।"

"কথাটা ঠিক। ম্যাচ বলতে যা বোঝায় আমিও তার বিপক্ষে। কিন্তু ভালোবেসে বিয়ে করায় আপত্তি কী?"

দিদি তা শুনে হেসে আকুল। আমি যেন কী একটা বেথাপ কথা বলেছি।

সেদিন দিদি আমার হাতে একতাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে বললে, "খবরদার কাউকে দেখিয়ো না। পড়া হয়ে গেলে লুকিয়ে ফেরৎ দিয়ো। লক্ষীটি, আমার মুখ হাসিয়ো না।"

হস্টেলে ফিরে আলো জেলে পড়তে বসি। পাঠ্যপুস্তকের ফাঁকে অপাঠ্য চিঠি। পরের চিঠি পড়তে একটুও ভালো লাগে না, মনে হয় পাপ করছি। একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলুম ওগুলি প্রেমপত্র। রাখালদা লিখেছেন কাজলদিকে! খুশি হলুম। কারণ রাখালদা এম এতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে প্রোফেসার হয়েছেন! উপায় থাকলে বিলেত যেতেন, অক্সফোর্ড কি কেম্ব্রিজের ডিগ্রি নিয়ে ফিরতেন। তাঁর মতো পাত্র বিনা পণে পাওয়া দুর্লভ ভাগ্য।

পরের শনিবার কাজলদিকে বললুম, "ভাবছ কী? চোখ বুঁজে ঝুলে পড়। এমন পাত্র হাতছাড়া করতে নেই। আর এ তো শুধু পাত্র নয়, প্রেমিক।"

কাজলদি আমার গালে এক ঠোনা মেরে বললে, "দুষ্টু।"

তার পরে আমরা দুজনে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম খিড়কি দিয়ে রাস্তায়। কাছেই রেললাইন, লাইন পেরিয়ে বন। সেদিন আমাদের কথাবার্তা কি ফুরয়! সে আমাকে সমস্ত খুলে বললে গোড়া থেকে।

সেই যে আইসক্রীম খাওয়ানো তার কয়েকমাস পরে রাখালদা বিয়ের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটা যেই কর্তাগিন্নির কানে গেল অমনি তাঁরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কর্তা বললেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বামন হয়ে চাঁদে হাত।" গিন্নি বললেন, "আমি দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম গো। ছেলের মতো ভালোবেসেছিলুম। হায় হায়! কী অকৃতজ্ঞতাই করলে।" রাখালদার আসা বারণ হয়ে গেল। কাজলদিকে পড়াতে এক বাহাত্তুরে বুড়ো বহাল হলেন।

কিন্তু চিঠি লেখা বন্ধ হলো না। শিলংএ রাখালদা একবার হাওয়া-বদলের জন্যে গেছলেন, হোটেলে উঠেছিলেন। কথাটা পেশ করা হয় পাঁচজন ভদ্রলোকের মারফৎ। কর্তা তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। গিন্নি তাঁদের কাছে মাফ চেয়ে পাঠালেন, নইলে অনেক দূর গড়াত। তার পর থেকে রাখালদার চিঠি লেখায় ইতি। কাজলদি বার বার লিখে উত্তর পায়নি। শেষ বার লিখেছিল পাটনা বদলির খবর দিয়ে।

কাজলদির ভীষণ ভাবনা রাখালদা হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে শোধ তুলবেন। হয়তো এতদিনে বিয়ের কথাবার্তা বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। কিন্তু ভেবে তো কোনো কূলকিনারা নেই। যা হবার তা হবেই। কাজলদি তার কী করতে পারে। শুধু শুধু মন খারাপ করার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা লেখাপড়া করা ভালো, তাতে মনটাকে ভুলিয়ে রাখা যায়। তবে হ্যাঁ, শরীরটাকে ভোলানো শক্ত। এমন তীব্র মাথা ধরে যে য়্যাস্‌পিরিন খেতে হয় হামেশা।

দু' একজন বন্ধুর সঙ্গে আইনের কথা কয়ে কাজলদিকে একদিন বললুম, "বোন, আইন তোমাকে বাধা দিচ্ছে না। ধর্মেও বাধা নেই। ইচ্ছা করলে, তুমি নিজেই নিজের বিয়ে দিতে পারো। লজ্জা করে তো আমায় বলো, আমিই তোমার বিয়ে দেব। খামকা কষ্ট পাচ্ছ কেন? অমন করে তুমি ক'দিন বাঁচবে! বলো তো আমি চেষ্টা করি।"

"তার মানে!" সে চমকে উঠল। "কার সঙ্গে চেষ্টা করবে?"

"যাঁর সঙ্গে তোমার প্রেম তাঁর সঙ্গে। রাখালদার উপর আমারও তো একটা দাবি আছে। আমি যদি অনুনয় করি তো তিনি আর কাউকে বিয়ে করবেন না। আমার দাদা তিনি, আমার কথা রাখবেন।"

কাজলদি কেমন এক হেঁয়ালীর মতো হেসে বলল, "আচ্ছা, তা হলে তুমি তাঁকে চিঠি লেখ। কী জবাব দেন দেখব।"

আমি অনেক খেটেখুটে একখানা ভারী চমৎকার চিঠি খাড়া করলুম। দিদিকে দেখতে দিলুম না। যদি আমার উৎসাহের মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালে। চিঠি তো গেল, আমি আমার ঘুম নষ্ট করে যত রকম প্ল্যান আঁটতে থাকলুম, কোথায় বিয়েটা হবে, হিন্দু মতে না তিন আইন অনুসারে। দিদির মা বাবার চোখে ধূলো দেওয়া যায় কী করে, শেষকালে যদি ওঁরা তাকে নজরবন্দী করেন তো কী উপায়।

যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। দেখা গেল দিদি সম্পূর্ণ উদাসীন। বলে, "আগে থাকতে অত ভেবে কী হবে! চিঠির কী জবাব আসে দেখ। হয়তো তিনি অন্যত্র এন্‌গেজড্‌।" মুচকি হাসে।

অবশেষে রাখালদার উত্তর এলো। তিনি লিখলেন, তিনি আমার মতো সাহিত্যিক বা সাহিত্যের ছাত্র নন। অমন চমৎকার চিঠির উত্তরটা যদি চমৎকার না হয় আমি যেন তাঁকে ক্ষমা কার। তাঁর যা বলবার আছে তিনি তা মুখে মুখে বলতে চান। আমি কি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে পারি? ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি পাটনা আসতে কুণ্ঠিত।

অগত্যা আমাকেই কলকাতা যেতে হলো। রাখালদা আমাকে তাঁর মেসের অতিথি করলেন। দুই ভাইয়ে মনের কথা বলাবলি হলো।

"আমি জানি তুমি তোমার কাজলদির দুঃখে দুঃখী। তুমি তার দুঃখ দূর করতে চাও। সাধু, সাধু। কিন্তু তোমার দিদির দুঃখ যাকে ভাবছ সেটা একটা প্রচ্ছন্ন সুখ। তিনি নিজেই সেটাকে পুষে রাখতে চান যে। তুমি করবে কী। আর আমিই বা তার কী করতে পারি!"

"কিন্তু রাখালদা—"

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা! তবে শোনো বলি। কাজল এখনো তার সেই স্বামীকেই ধ্যান করছে। পাচ্ছে না বলে রোখ করে বই পড়ছে। না, তার জ্ঞানপিপাসা নেই। সে জ্ঞানের জন্যে পড়ে না। এমন কি পাস করার জন্যেও পড়ে না। সে পড়ে স্রেফ আত্মপীড়নের জন্যে। এ যেন

নিজেকে নিজের হাতে চাবকানো। শরীর তো ভেঙে যাবেই। আর ঐ য়্যাসপিরিন হচ্ছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। ওতে উদ্দীপনা বাড়ে। বুঝলে, ভাই, তোমার কাজলদি হচ্ছে যাকে বলে masochist অর্থাৎ মর্ষকামী।"

আমি মনোবিকলনের বিশেষ কিছু জানতুম না, তবে মোটামুটি এই বুঝতুম যে, কতক লোক আছে তারা মার খেতে ভালোবাসে। তাদের মন পেতে হলে মার লাগাতে হয়। আমার দিদি যে তাদের একজন একথা কখনো আমার মনে উদয় হয়নি, তাই রাখালদার উপর চটে গেলুম। কোথাকার এক টুলো পণ্ডিত, একেলে টোলের বিদ্যাদিগ্‌গজ। এই পুঁথি পোড়োর সঙ্গে তর্ক করে ফল কী।

আমি ফোঁস করে উঠে বললুম, "রাখালদা, আপনি সোজা বলে দিন যে ওকে বিয়ে করবেন না, ওর চেয়ে ভালো মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। মিথ্যে বেচারিকে অপবাদ দিচ্ছেন! আর এ কি বড় সামান্য অপবাদ! একথা শুনলে কোন মেয়ে না লজ্জায় গলায় দড়ি দেবে!"

রাখালদা অট্টহাস্য করলেন। বললেন, "বাইশ বছরে তুমি সবজান্তা হতে পারো, কিন্তু স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—বুঝলে ভায়া—এখনো তোমার অপঠিত। এটা অপবাদই নয়, বরং সুখ্যাতি। শুনলে তোমার কাজলদি গলায় দড়ি দেবেন না, গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর ফোটোর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করবেন। বলবেন, এত প্রহারেও যদি তোমায় না পাই তবে, হে আমার প্রভু, মারো মারো আমায় আরো আরো। য়্যাসপিরিন দিয়ে দফা সারো।"

আমি আর শুনতে প্রস্তুত ছিলুম না। উঠতে চাইলুম। রাখালদা বললেন, "ও কী! তুমি এত দূর থেকে এলে, অমনি ফিরে যাবে! না, আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। এই যে চিঠিগুলো এগুলো বসে বসে পড়ো। আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি।"

কাজলদির চিঠি এক রাশ। উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদন। কোনোখানেই তার ভূতপূর্ব স্বামীর নামগন্ধ নেই। যেন কুমারী মেয়ের চিঠি। তার যা কিছু ভয়, যা কিছু ভাবনা তার মা বাবার জন্যে। তাঁরা যে রাজি হবেন না এটা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদের অবাধ্য হওয়া তার অকল্পনীয়। তার একমাত্র আশা ধীরে ধীরে তাঁদের মত বদলাবে। মেয়ের কষ্ট দেখে তাঁদের মন গলবে। একদিন তাঁরা তার বিয়ের প্রস্তাবে সায় দেবেন। ততদিন অপেক্ষা করা তার কর্তব্য এবং রাখালদা যদি তাকে ভালোবাসেন তো রাখালদারও।

কিন্তু রাখালদা কি ততদিন অপেক্ষা করবেন! কী জানি! পুরুষের মন চির চঞ্চল।

শিলংএর সেই অবমাননার পরে যেসব চিঠি লেখা হয়েছে তাতেও কাজলদি তাঁকে আশা রাখতে বলেছে, অপেক্ষা করতে বলেছে। পিতামাতার হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে। বলেছে অপমানের আঘাত শতগুণ বেজেছে শিবের চেয়ে সতীর গায়ে। সতীর মতো সে হয়তো দেহত্যাগই করবে, কিন্তু তিলে তিলে। তবে যদি তাঁদের চৈতন্য হয়।

রাত্রে রাখালদাকে বললুম, "কই, এর মধ্যে ওর স্বামীর কথা কই? ওর যে স্বামী ছিল তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।"

"তুমি ছেলেমানুষ!" তিনি আমাকেই দোষ দিলেন। "চিঠি কী করে পড়তে হয় তাও শেখনি। আর কাজল এত কাঁচা মেয়ে নয় যে, সোজা ভাষায় বলবে! এসো তোমাকে দেখাই!"

দু'একখানা চিঠি তিনি এমন সুরে এমন অর্থপূর্ণভাবে পাঠ করে শোনালেন যে, আমার মনে হতে লাগল যার চিঠি সেই বলতে পারে ওর মধ্যে কী আছে না আছে। রাখালদার কথাই মেনে নিলুম।

তখন তিনি আমাকে তাঁদের দু'জনের সমস্যা আনুপূর্বিক শোনালেন। তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এখনো চান, দিদিকে বাঁচাতে। তিনি যদি না বিয়ে করেন, কেউ যদি না বিয়ে করে, তবে দিদি বাঁচবে না। দিদির জন্যে আমার যত না মাথাব্যথা তাঁর ততোধিক। কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না, আমিও পারব না। কারণ দিদি বাঁচতে চায় না।

"সে কী, রাখালদা! এ জগতে কে না চায় বাঁচতে! সামান্য ধূলিকণাটুকু, সেও বলে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"—

"ওটা তোমার কবিত্ব। তোমার দেখছি অনেক শিক্ষা বাকি আছে। ধূলিকণা কী বলে জানিনে, কিন্তু মানুষ যা বলে তার কোন্‌টা যে সত্যি কোন্‌টা যে মিথ্যা মুনিরাও বুঝতে পারেন না। কবিরা তো কপি।"

তারপর জুড়লেন, "তোমার কাজলদি কেমন অকাতরে মিথ্যা বলে তা কি তুমি জানো!"

ফিরে এলুম। কাজলদি সব শুনল। শুনে বলল, "কেমন, হলো তো?"

তারপরে এক সময় মন খুলল। "আমি ওঁকে অন্তত একশোবার বুঝিয়েছি যে ওঁর ঐ সন্দেহ ভুল। পূর্ব-স্বামীর ফোটোর কাছে দু'মিনিট দাঁড়ানো,

এক মিনিট চোখ বুজে থাকা, দু'হাত জোড় করে একটিবার কপালে ঠেকানো—এর সঙ্গে বর্তমান স্বামীর প্রতি অনুরাগের অসামঞ্জস্য কোথায়? মৃত পত্নী থাকলে উনিও একভাবে না একভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন। আমি কিছু মনে করতুম না।"

সেকথা ঠিক। আমি একমত হলুম।

তারপরে দিদি ফিক করে হাসল। "মৃত পত্নী না থাক, জীবিত বৌদি আছেন। আমি কি কোনো দিন কিছু মনে করেছি?"

আমি বললুম, "মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা কথা! আচ্ছা, আমিই না হয় মিথ্যাবাদী, আসছেবার কলকাতা গেলে ওঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো।"

"ছি। এ কি কখনো সত্যি হতে পারে!"

"কে জানে! উনি যদি নিজের থেকে না বলতেন আমি কেমন করে জানতুম! উনিই তো বলেছিলেন একদিন, কাজল, আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার করো, আমি যে ডুবতে বসেছি।...আমি তো ছাড়তে চাই, কমলি নেহি ছোড়তি।...বুঝতে পারলে, না আরো ভেঙে বলতে হবে?"

এ রাম! আমি কানে আঙুল দিলুম! কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুলো।

"একটা মানুষ ডুবে মরছে দেখলে কার না ইচ্ছে যায় জলে ঝাঁপ দিতে! আমি ঠাকুরঘরে ঢুকে বললুম, ঠাকুর, আমি ঝাঁপ দিতে চললুম। ওঁকে যদি বাঁচাতে পারি তো বাঁচব। নয়তো মরব। হে ঠাকুর, বল দাও আমাকে, বল দাও ওঁকে।...বিয়ে আমাদের হয়নি, তা তুমি জানো। কেন হয়নি, তাও জানো। কিন্তু প্রাণপণে তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি, উপদেশ দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমার ক্ষোভ শুধু এই যে, তিনিও বাঁচলেন না, আমিও মরলুম।"

এর পরে আমি আবার রাখালদাকে চিঠি লিখি। তিনি যখন বিয়ে করতে এখনো রাজি আর ইনিও ইচ্ছুক, তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুবে মরার কোনো মানে হয় না। বিয়ের পরে আপনি একটা বোঝাপড়া হবে, দু'জনে দু'জনকে বাঁচাবেন। সাবালক ও সাবালিকার বিবাহে গুরুজনের হস্তক্ষেপ গর্হিত। পোস্টমাস্টার জেনারেল যদি না সমঝেন তো তাঁকে সমঝানোর জন্যে উকিল নিযুক্ত করা যাবে।

কিন্তু রাখালদা কেমন করে টের পেলেন যে, কাজলদি আমাকে তাঁর

বৌদির কথা বলেছেন। আমি উল্লেখ করিনি, সেটুকু সুবুদ্ধি আমার ছিল। কিন্তু কবিত্ব ফলাতে গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুবে মরা ইত্যাদি লিখেছিলুম। পরস্পরকে বাঁচানোর উল্লেখ করেছিলুম। তার থেকে যা অনুমান করবার তা অনুমান করতে তাঁর এক মুহূর্ত লাগেনি। জবাব এলো, চাচা, আপনা বাঁচা। কেউ কাউকে বাঁচাতে যাবে কেন? যে যার নিজেকে বাঁচাক। বিয়ের কোনো আবশ্যক নেই। বিয়ে না করলেও মানুষের বেশ চলে যায়, বেশ চলে যাচ্ছে।

চিঠিখানা কাজলদিকে দিলুম। তারই উদ্দেশে লেখা। সে একটা উত্তর খসড়া করে আমাকে দিলে। আমি নিজ হাতে নকল করে পাঠালুম। তাতে ছিল, তা হলে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কেন? বিয়ে কি আর কোথাও করবেন না? যদি চিরকুমার থাকা স্থির করে থাকেন তো সেই সুসংবাদ দিয়ে সুখী করবেন। হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। কাজলদি আর শুকিয়ে যাবে না, যদি শোনে আপনি চিরকুমার থাকবেন।

এবার যে জবাব এলো তা আমার জন্যে নয়, কাজলদির জন্যে। আমি ডাক হরকরা। পরের চিঠি পড়া আমার বারণ। চিঠিখানা দিদিকে দিলুম, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চিঠিখানাকে বুকে চেপে ধরে সে চোখের জল ঝরাল আর মিষ্টি মিষ্টি হাসল।

এবার আমি তারই লেখা খসড়া আমার লেখা খামে ভরে ডাকঘরে পাঠালুম, পড়ে দেখলুম না কী ছিল তাতে। জবাব এলো তারই নামে, আমার কেয়ারে। এরপর খামের উপর ঠিকানা লেখা ও খাম বন্ধ করাও কাজলদি আমার হাত থেকে স্বহস্তে নিলে। আমার কাজ হলো চাপরাশির ও ডাক-পিয়নের কাজ বাঁচিয়ে দেওয়া। কারণ ছিল। কাজলদির মা ডাকঘরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন—মেয়ের নামের চিঠি তিনিই হস্তগত করতেন। আর মেয়ে কাউকে চিঠি লিখলে চাপরাশিকে বলা ছিল তাঁকে একবার দেখিয়ে নিতে।

পোস্টমাস্টার জেনারেলের চোখে ধূলো দিলুম, কিন্তু পোস্টমিস্ট্রেস জেনারেলের হাতে ধরা পড়ে গেলুম। তখন আমাকেও সম্বর্ধনা করা হলো রাখালদার মতো। সম্মার্জনী নিয়ে নয়, সেটা আজকাল উঠে গেছে। কিন্তু সেই মনোভাব দিয়ে। অপমান পরিপাক করে হস্টেলের ছেলে হস্টেলে ফিরলুম। আর ও-মুখো হইনি।

তারপরে পাটনা ছাড়ি। কাজলদির সঙ্গে শেষ দেখা হলো না বলে মনে আক্ষেপ ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল এই যে আমি ওদের ভাঙা প্রণয় জোড়া দিয়েছি। কলকাতায় দাদার সঙ্গে দেখা করি ও দু'তিন দিন থাকি। দিদির সেই কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি। তিনি ও-কথা হেসে উড়িয়ে দেন। "হো হো। নিজে ভার্জিন নয় কিনা। তাই কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ পায় যে আমিও ভার্জিন নই। স্রেফ মেয়েলি কল্পনা। তোমায় ছেলেমানুষ দেখে মোয়া ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের মনোবিজ্ঞানে এ-রকম কেস শত শত আছে। একটা থীসিস লিখলে হয়।"

কিছুদিন পরে আমি বিলেত চলে যাই। বলা বাহুল্য, কাজলদিদের ভুলে যাই। দু'বছর তাদের কোনো খবরাখবর পাইনে। অবশেষে যেদিন ইংলণ্ড ছাড়ব তার একদিন আগে হঠাৎ শুনলুম আমার ছোটবোন লণ্ডনে।

সেই মেয়ে হস্টেল থেকে কাজলদিকে নিয়ে যাই দোকানে একটা উপহার কিনে দিতে। পথে জিজ্ঞাসা করি, "মিসেস চৌধুরী হতে পারলে না, মিসেস্ বক্সী রয়ে গেলে। কার দোষে বলো তো?"

"দোষ কারো নয়। আমার নিয়তি। আমাদের নিয়তি।...কমলির একটি ছেলে হয়েছে! অবিকল ওঁর মতো দেখতে। কমলি কেন ছাড়বে!"

আমি ভয়ানক শক্ পেলুম। বিশ্বাস করলুম না, বললুম "তা হলে সব চুকিয়ে দিয়ে বিলেত পালিয়ে এলে?"

"না। চুকিয়ে দেব কেন?...এই দেখ, দিনরাত বুকে বুকে রেখেছি।" যা দেখালে তা একটি লকেট। তাতে ছিল একটিমাত্র ইংরেজী হরফ। "R"। রাখালদার নামের আদ্য-অক্ষর।

তখন আমার খেয়াল হয়নি, হলো বহু কাল পরে, কাজলদির আসল নাম যে রমা। ততদিনে কাজলদি স্বর্গে।

(১৯৪৫)

ঐ মাননীয় মহোদয় যেবার আমাদের শহরে শুভাগমন করেন ওঁর গুণমুগ্ধরা ওঁকে একটি প্রীতিভোজ দেন। আমন্ত্রিতরা সকলেই পুরুষ, দু'চারজন আবার রাজপুরুষ।

এ ধরনের পার্টিকে বলে স্ট্যাগ পার্টি। মাঝে মাঝে স্ট্যাগ পার্টিতে যেতে বেশ লাগে। মহিলারা অনুপস্থিত থাকায় প্রাণ খুলে হাসি মশকরা করা যায়। অনেকের অনেক গুণপনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট গুপ্ত সাহেব যে মদের সঙ্গে মদ মেশাতে জানেন এ বিদ্যা এত দিন গুপ্ত ছিল। তিনি নিলেন কক্‌টেল বিভাগের ভার।

খানা টেবলে বসে পিনায় চুমুক দিতে দিতে সাফল্যের প্রসঙ্গ উঠল। জীবনের সাফল্য। আমাদের ডাক্তার সাহেব মেজর দাস বললেন, "আমার বন্ধু বাগচীর secret of success কী, জানেন? বাগচী যে আজ এত দূর উন্নতি করেছেন তার সীক্রেট আর কিছু নয়, একটি কথা।"

সেই কথাটি কী কথা তা তিনি একটু একটু করে বললেন। বাগচীর নাম আমরা শুনেছিলুম, কিন্তু জীবনী এই প্রথম শুনলুম। বাস্তবিক বাগচীর মতো ভাগ্যবান পুরুষ ভাগ্যবানদের মধ্যেও বিরল। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী। কিন্তু কই, উদ্যোগী লোকের তো অভাব নেই, তবু কেন বাগচীর মতো লোক এত কম দেখা যায়!

আমরা খাওয়া ছেড়ে শোনায় মন দিলুম। কে জানে হয়তো আমরাও এক একজন বাগচী হয়ে নরজন্ম সার্থক করব, যদি জেনে রাখি বাগচী হওয়ার সীক্রেট।

বাগচীর গল্প যখন শেষ হলো তখন সাফল্যের নেশা আমাদের মাথায় চড়েছে। অবশ্য নিছক সাফল্যের নেশা নয়, আর এক নেশাও। নেশার ঘোরে কে একজন গুণমুগ্ধ ফস্ করে বলে বসলেন, "অত দূর যেতে হবে না। এই তো আমাদের সম্মুখেই বিরাজ করছেন সাফল্যের প্রতিমূর্তি আমাদের মহামান্য অতিথি। বাংলাদেশে বাগচী জন্মায় যখন তখন, কিন্তু ইনি হলেন ক্ষণজন্মা। বাগচী! রেখে দিন আপনার বাগচী!"

তখন আমরা সকলে চেপে ধরলুম, "সার, আপনার সাফল্যের সীক্রেট কী? আজ আমাদের শোনাতেই হবে।"

ক্ষণজন্মা তা শুনে মৃদু মধুর হাসলেন। তাঁর দাড়ির উপর দিয়ে তরল

হাসির ঢেউ খেলে গেল। দাড়িটি ফরাসী ধরনে ছাঁটা, যদিও তাঁর সব ক'টি চুল শাদা। মাননীয়ের বয়স ষাটের উপর। কিন্তু প্রসাধনের পারিপাট্য তা বুঝতে দেয় না।

সেদিন আমাদের পীড়াপীড়িতে তাঁর মাননীয়তার মুখোশ খসে পড়ল। তিনি আমাদের সঙ্গে সমান হয়ে বললেন, "হা হা। আমার তো secret of success নয়, আমার হচ্ছে secret of unsuccess. সে কি আপনাদের শুনতে ভালো লাগবে?"

আমরা বিস্মিত হলুম। বিশ্বাস করলুম না। ভাবলুম ইনি কেবল সাফল্যের প্রতিমূর্তি নন, বিনয়েরও অবতার।

গুপ্ত আমার কানে কানে বললেন, "মিথ্যে নয়। কয়েকটা কোম্পানী ফেল মেরেছে ওঁর ম্যানেজমেণ্টে।"

সারকিট হাউসের ডাইনিং রুম থেকে আমরা সকলে ড্রইং রুমে এসে জমিয়ে বসলুম। কফি খেতে খেতে মান্যবরকে খোসামোদ করতে থাকলুম তাঁর সিক্রেটটুকু জানতে। তিনি কি সহজে বলতে চান!

তখন গুপ্ত প্রস্তাব করলেন, "সারকে কি এক পেয়ালা রাশিয়ান কফি দিতে পারি?"

রাশিয়ান চা কাকে বলে জানতুম, কিন্তু রাশিয়ান কফির কথা এই প্রথম শুনলুম। মাননীয় বললেন, "রাশিয়ান কফি! সে আবার কবে আমদানী হলো?"

"না, সে রকম কিছু নয়। রাশিয়ানরা কফির সঙ্গে এক ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খায় কিনা। বেশী নয়, এক ফোঁটা। এই যে।"

মাননীয় আবার মুখোশ এঁটে বললেন, "ব্যস।"

তাতেই ফল হলো। রাশিয়ান কফি গেল তাঁর উদরে, আর অমনি বেরিয়ে এলো তাঁর ব্যর্থতার কাহিনী।

আমরা তাঁকে ধীরে ধীরে ঘিরে বসলুম।

আমার বড় মেয়ের মুখে কবির এ দুটি লাইন কতবার শুনেছি—

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা"

হায়! আমার সে মেয়ে আজ নেই, কোনো মেয়েই নেই, কোনো ছেলেই

নেই, কেউ নেই। মানে, আছে সবাই, কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ধন আছে মান আছে, নেই কেবল কিছু ভালোবাসা। এ বয়সে আর আশা করতে পারিনে। ক'টা দিন, আর কেন আশা!

কী করে যে কী হলো, কী থেকে কী হয়ে দাঁড়াল, সে অনেক কথা। আপনাদের ভালো লাগবে না, লাগার কথা নয়। আপনারা জানতে চেয়েছেন এমন কোনো গোপনীয় কৌশল যার সাহায্যে আমি আজ ধনকুবের। আর আমি কিনা বাজে বকছি। বলছি, ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা। ক'টা দিন, আর কেন আশা!

কিন্তু দয়া করে শোনেন যদি তো আপনাদের সময় নষ্ট হবে না। যদি হয়ও তবু এমন কিছু পাবেন যা আপনাদের মনে থাকবে।

আমার জীবনের সব চেয়ে গর্বের দিন কোনটা বলব? যেদিন আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দশ লাখ অতিক্রম করল সেদিন নয়। যেদিন আমি নাইট উপাধি পেলুম সেদিন নয়। যেদিন আমি বাবার সঙ্গে সফর থেকে ফিরি, সাত বছর বয়সে। সেদিনকার দৃশ্য আমার আজো মনে আছে, প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরে। ইতিমধ্যে কত ঘটনা ঘটল, কত দুর্ঘটনা, কত অঘটন। কিন্তু আমার সাত বছর বয়সের সেই ঘটনাটি যেমন জলজল করছে তেমন আর কোনোটা নয়। আর সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

সন্ধ্যাবেলা ফিরলুম গোরুর গাড়িতে। আর অমনি পাড়ার ছেলেমেয়ের দল আমাকে লুট করে নিয়ে গেল খেলার জায়গায়। নিয়ে গিয়ে চাঁদের আলোয় আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সে বয়সে আমার জানা ছিল না রাসলীলা কাকে বলে। ঠিক রাসলীলা না হলেও সেও ছিল সেই রকম। ওরা যে আমাকে এত ভালোবাসত তা কখনো কল্পনা করিনি। প্রত্যেকে বলে, আমার ভানু। প্রত্যেকে আমাকে কাছে টানে! আমি যে এতগুলি ছেলেমেয়ের একান্ত ও একমাত্র, এ কথা সেই প্রথম শুনি। সেই শেষ।

কিন্তু তখন থেকে আমার জীবনের সাধ, আমি সকলের প্রিয়পাত্র হব। আমি অজাতশত্রু। আমার কোনো শত্রু নেই। আমি নই কারো শত্রু। কিন্তু এমনি আমার কপাল, ভাবি এক, হয়ে ওঠে আরেক।

ইস্কুলে ভর্তি হয়ে দেখলুম সেখানে ছেলেতে ছেলেতে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা হলেই শত্রুতার সূত্রপাত হয়। আমি অজাতশত্রু, তাই প্রতি-

যোগিতায় মধ্যে গেলুম না। যে যেদিন ডাকে সেদিন তার কাছে বসি। একদিন আমাদের ক্লাসের লাস্ট বয় মুরলী মুখুয্যের কাছে বসেছি। এমনি আমার বরাত সেদিন মাস্টার মশাই এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার উত্তর কেউ পারলে না দিতে। ফার্স্ট্ বয় থেকে লাস্ট্ বয় পর্যন্ত সব্বাইকে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। মাস্টার মশাই "ইউ ইউ" করে অবশেষে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ইউ।" আমার উচিত ছিল চুপ করে থাকা। কিন্তু জিহ্বাগ্রে ছিলেন দুষ্টা সরস্বতী। বলে দিলুম উত্তর। মাস্টার বললেন, "সাবাস। আজ থেকে তুমি সর্দার পোড়ো। যাও ফার্স্ট সীটে যাও। এক এক করে প্রত্যেকের কান মলতে মলতে যাও।"

এখনো মনে পড়ে সে দৃশ্য। বেচারা মুরলী তার কান দুটি বাড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজল। তার মুখে মুচকি হাসি। সে কিছু মনে করে নি। কিন্তু কয়েকটা ছেলে এমন কটমট করে তাকাল যে আমি তাদের কানে হাত দিতে ভয় খেলুম। যাকে বলে রোষকষায়িত লোচন। ফার্স্ট বয় বেচারার মাথা হেঁট। সে তো কেঁদেই ফেলল। কত ছেলেকে কাঁদিয়ে, কত ছেলেকে রাগিয়ে সেদিন আমি প্রথম আসনে বসলুম। ওরা যে একদিন শোধ তুলবে এ কথা ভেবে আমার শরীর কণ্টকিত হতে লাগল। পরের দিন সত্যি জ্বর এলো।

ইস্কুলে অবশ্য যেতে হলো আবার, কিন্তু বিদ্যা জাহির করা বন্ধ হলো। পড়াশুনায় খারাপ ছিলুম না, অথচ বছরের শেষে পঞ্চম ষষ্ঠ কি সপ্তম হতুম। সেও আমার বিনা চেষ্টায়। পড়াশুনার চেয়ে খেলাধূলায় উৎসাহ ছিল বেশী। ফুটবল ক্রিকেট টেনিস তিনটেই ছিল আমার প্রিয়। সাঁতার আর গাছে ওঠা তো আমার নিত্য কর্ম। এর উপর ছিল চাঁদের আলোয় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা! এবং আরো যত রকম বাঁদরামি। এ কথা আমি আপনাদের কাছে কবুল করছি যে মেয়েরা কেউ আমাকে খুঁজতে এলে পাঁচ মিনিটের আগে ফিরত না। তারপরে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলত, ভানু চোর। আর আমি যখন চোর হয়ে মেয়েদের খোঁজে যেতুম তখনো পাঁচ মিনিট লাগত কোনো একজনকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে বলতুম, এই যা, পালিয়ে গেল। আমিই চোর হতুম আবার।

কিন্তু খেলাধূলার ক্ষেত্রেও দেখলুম দারুণ প্রতিযোগিতা। বার বার মারামারি করে অবসাদ এলো। আমি যে অজাতশত্রু, আমার তো শত্রুতা করা সাজে না। টেনিস খেলতে গিয়ে বাঁ চোখে লাগল বল। যিনি বল

ছুঁড়ে মারলেন তিনি জানতেন না যে বল আমার চোখে লাগবে। ভাবলুম, তিনি আমার শত্রু। সেই থেকে টেনিস খেলায় বৈরাগ্য জন্মায়। ফুটবল খেলতে গিয়ে বহুবার ডিগবাজি খাই। ফুটবল মনে করে আমাকেই কত ছেলে কিক্ করে যায়। ফুটবলে বিতৃষ্ণা এলো। ক্রিকেট চালিয়েছিলুম অনেক কাল। বুড়ো বয়সেও সুযোগ পেলে ব্যাট ধরি। আর ধরতে না ধরতেই আউট হই।

পড়াশুনায় মন নেই, খেলাধুলার শখ নেই। আমি তবে করি কী! করি হরিনাম সংকীর্তন। পাড়ায় কীর্তনের দল ছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরম ধার্মিক বনে গেলুম। ছেলেবেলা থেকেই আমার মধ্যে ধর্মভাব ছিল কিছু বেশী। বাড়ির সকলে তা জানতেন। তাই আমার নগর কীর্তনে বাধা দেননি। অনেক রাত্রে নগরকীর্তন করে ফিরতুম, বাবা বকতেন না। কয়েক বছর এই করেই কাটল। পরীক্ষায় ফেল করতুম না, ওই অষ্টম নবম হতুম। কাজেই মাস্টার মশাইদেরও আপত্তির কারণ ঘটত না।

আমি অজাতশত্রু। আমার একটিও শত্রু নেই। কীর্তন হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রতিযোগিতা থাকলেও অপ্রীতি নেই। আর প্রতিযোগিতা হচ্ছে খোলের সঙ্গে খোলের। কে কত ভালো বাজায়। কিংবা গায়েনের সঙ্গে গায়েনের। কে কত ভালো গায়। আমি ছিলুম নাচিয়ে। বাহু তুলে নাচতুম আর আবেশে ঢলে পড়তুম। আমার প্রতিযোগীরাও তাই করত। করুক। তাতে আমার কী! প্রসাদ তো সকলের ভাগেই সমান।

বেশ চলছিল। কিন্তু বিপদে পড়লুম যেদিন বাবা বললেন, "তোর বোধ হয় কলেজে পড়া হবে না। সংসারের খরচ চালাতে পারছিনে, তোর পড়ার খরচ চালাব কী করে? যদি একটা বৃত্তি টিত্তি জোটাতে পারতিস—"

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বৃত্তি পায় কারা! যারা প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় হয়। আমি নগণ্য ছাত্র। আমি কেন বৃত্তি পাব! তা হলে কি বাবা বলতে চান যে আমাকেও আদা নুন খেয়ে স্কলারশিপের পড়া পড়তে হবে? তা হলেই হয়েছে আমার অজাতশত্রুতা! সুধাকান্ত আমার বিশেষ বন্ধু। বেচারার মুখের গ্রাসটি কেড়ে নেব, আর সে অন্তর থেকে ক্ষমা করবে! আর মনোরঞ্জন আমার ভাইয়ের মতো। সে কি আর আমার ভাইয়ের মতো থাকবে, যদি তার জলপানি কেড়ে খাই!

উপদেশ নিতে গেলুম হেড মাস্টার মশায়ের কাছে। তিনি বললেন, "কলেজে পড়ার আর কী উপায় আছে, জানিনে। টিউশনি করতে গেলে দেখবে, সে ক্ষেত্রেও তুমুল প্রতিযোগিতা। হাঁ, একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিযোগিতা নেই। ঘরজামাই হতে রাজি আছ?"

মাস্টার মশায়ের এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম, "প্রাণ গেলেও না।" তার পরে ভালো ছেলের মতো স্কলারশিপের জন্যে পড়ি। সামান্য একটা বৃত্তি পাই। তাতে আমার কলেজের পড়া কায়ক্লেশে চলে দু'বছর। তার পরে মোটা গোছের বৃত্তি পাই। কলেজের পড়া অক্লেশে এগোয়। কিন্তু যাদের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা তারা আমার সঙ্গে কথা কয় না। কথা কয় তো আমার সাফল্যের সীক্রেট জেনে নিতে। এ এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শত্রুতা। মাফ করবেন, আপনাদের কারো প্রতি কটাক্ষ করছিনে। আপনারা আমার প্রতিযোগী নন, সুতরাং শত্রু নন। আপনাদের কৌতূহল অন্য জাতের।

আইনটা পাশ করেছিলুম এমনি হ্যাতের পাঁচ হিসাবে। কিন্তু বাবা বললেন, উকীল হতে হবে। তার চেয়ে কশাই হওয়া ঢের ভালো। কশাই তো মানুষের গলা কাটে না, গরিব বিধবার গলা কাটে না, বিপন্ন নাবালকদের গলা কাটে না। কী করি! একটা কিছু তো করতে হবে। যাই করি না কেন পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়ার কথা ওঠে। এমন কোন জীবিকা আছে যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ নেই! যদি থাকে তো সমাজের নিচের দিকে। মিস্ত্রির বা মেথরের কাজ, চাষীর বা মজুরের কাজ সেসব। আমরা ভদ্রলোক বলে পরিচিত বটে, কিন্তু আমাদের মতো পরখাদক বা নরখাদক কি আর আছে!

আর একটু রাশিয়ান কফি? ধন্যবাদ, মিস্টার গুপ্ত। এক ফোঁটা। এক ফোঁটা। থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে। থ্যাঙ্ক ইউ।

ইতিমধ্যে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। এক রকম জোর করেই দিয়েছিলেন। না দিলে, তাঁর ধারণা, আমি ব্রাহ্ম সমাজে বিয়ে করতুম। এর কারণ আমার স্বাভাবিক ধর্মভাব আমাকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রবিবারে রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়ে চোখ বোজা আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখ বুজে আমি নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করতুম কি কোনো সাকার ব্রাহ্মিকার এ সম্বন্ধে আজ নীরব থাকাই সমীচীন, কারণ এখানে নিরাকারবাদীও রয়েছেন।

সে যা হোক, আমার শ্বশুর মশায়ের ছিল কয়লার খনি। বাবাকে বললুম, ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে আইনের ব্যবসা কেন? তিনি রুষ্ট হলেন, কারণ তাঁর মতে আইনের ব্যবসাতে ফেল করার সম্ভাবনা কম, কয়লার ব্যবসাতে বেশী। এবং কপালে থাকলে রাসবিহারী ঘোষ হওয়া সোজা, রামদুলাল সরকার হওয়া শক্ত। ওদিকে শ্বশুরকন্যাও তুষ্ট হলেন না। তিনি চেয়েছিলেন আমি এক লম্ফে হাইকোর্টের জজ হয়ে অভিজাত সমাজে উন্নীত হই।

শ্বশুর মশাই বললেন, "ব্যবসা মানেই প্রতিযোগিতা আর প্রতিযোগিতা মানেই শত্রুতা। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের শত্রুতা কেন? এইজন্যেই। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ বাধে কেন? এইজন্যেই। অতএব মনটাকে ইস্পাতের মতো কঠিন করতে হবে। ব্যবসা হলো যুদ্ধ। যুদ্ধে দয়ামায়ার স্থান নেই। দয়া করলে কি মরলে। দরকার হলে নিজের শ্বশুরের গলা কাটতে হবে। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। কাট্থ্রোট কম্পিটিশন। তাতে যদি জিতলে তো ঠাকুর। হারলে তো কুকুর। কেমন জিতবে?"

উত্তর দিলুম, "আপনাদের আশীর্বাদে জিতব।"

এক রকম বিনা মূলধনে আরম্ভ করলুম। মুরুব্বি ও জামিন হলেন শ্বশুর মশাই। আপনাদের আশীর্বাদে গোড়া থেকেই লাভ দেখালুম। কখনো দাঁও মারার চেষ্টা করিনি। কারো সঙ্গে অসাধুতা করিনি। শ্রম করতে কুণ্ঠিত হইনি। অপমানে কাতর হইনি, অবিচারে হতাশ হইনি। বেগতিক দেখলে মিথ্যা বলেছি, খোসামোদ করেছি, ঘুষ দিয়েছি। কিন্তু কাম ক্রোধ বা লোভের বশবর্তী হইনি। ইস্পাতের মতো কঠিন হওয়াই আমার সাধনা। কিন্তু ইস্পাতের তলোয়ার থাকে ভেলভেটের খাপে। আমার ব্যবহার মখমলের মতো মোলায়েম। যে আমার কোম্পানীতে কাজ নিয়েছে সে আমার কোম্পানী ছাড়েনি, যতক্ষণ না আমি নিজে ছাড়িয়ে দিয়েছি, ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। যেন তেন প্রকারেণ আশ্রিত পোষণ করা বা আত্মীয় পালন করা আমার নীতি নয়। এই আমার সাফল্যের সীক্রেট।

কিন্তু আমার ব্যর্থতার সীক্রেটও এই। মহাযুদ্ধের সময়—সেবারকার মহাযুদ্ধ—আমার মতো অনেকেরই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। হঠাৎ

বড়লোক হলে যা হয়, অনেকেই সে টাকা দশ রকম কারবারে খাটিয়ে যুদ্ধের পরে লালবাতি জ্বালেন। আমি কিন্তু হুঁশিয়ার থাকি। ফলে বাবার সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁরা চেয়েছিলেন ও টাকা আমার কাছ থেকে হাওলাৎ নিয়ে কারবার ফেঁদে রাতারাতি বড়মানুষ হতে। আমি ও টাকা যখের ধনের মতো আগলাই। কাউকে এক পয়সা দিইনে। অবশ্য না খেতে পেয়ে মরছে দেখলে মুক্ত হস্তে দিই, চিকিৎসার জন্যে পড়াশুনার জন্যে দরাজ হাতে দিই। কিন্তু বাবুয়ানার জন্যে বিবিয়ানার জন্যে রাতারাতি লাল হবার জন্যে এক কপর্দকও দিইনে।

পিতৃকুলের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে সেই একই কারণে শ্বশুরকুলের সঙ্গেও বিচ্ছেদ। কেবল তাই হলে রক্ষা ছিল, মামলা বেধে গেল কোলিয়ারি নিয়ে। শ্বশুর মশাই সেকালের রাজপুত যোদ্ধা, জামাইকেও বাণ মারতে পরাঙ্মুখ নন। কিন্তু আমি যে আইন পড়ে ভুলে যাইনি, বরং ঘরে বসে আরো পড়েছি, এ তিনি জানতেন না। আমার মামলা আমি নিজেই তদ্বির করি। লোয়ার কোর্টে, হাইকোর্টে, দুই কোর্টেই আমার জিৎ। উকীল ব্যারিস্টাররা বললেন, "আপনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করলে আমাদের ভাত মারবেন দেখছি।" আমি বললুম, থাক আর শত্রুবৃদ্ধি করে কী হবে!

শ্বশুর মশাই এর পরে যে চাল চাললেন তা সাংঘাতিক। আমার ছেলেটার মাথা খেলেন। তাকে বোঝালেন, কয়লা অতি ময়লা জিনিস। যারা কয়লার কারবার করে তারা ছোটলোক। বাপকে বল্ তোর নামে মোটরকারের এজেন্সী নিতে। ছেলে আমাকে তাই ভজালে। আমি তাকে বকে দিলুম। বললুম, বেঁচে থাকলে একদিন মোটরকার ম্যানুফ্যাকচার করব। এজেন্সী নিয়ে প্রতিযোগীর সুবিধে করে দেব কেন? পরে কি ওরা আমাকে মোটরের কারখানা খুলতে দেবে? ছেলেটা অবাধ্য। আমার কাছে চেয়ে বসল এক লাখ টাকা। আমি বললুম, এক পয়সাও না। তখন সে আমার বাড়ি থেকে আপনি বেরিয়ে গেল। তার মামারা রটালে, বাপ বার করে দিয়েছে। বাজারে আমার নাম খারাপ হয়ে গেল। পরে শুনলুম ও নাকি প্রাইভেট টিউশনি করে আইন পড়ছে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে ওর যা প্রাপ্য তা একদিন আইনের সাহায্যে আদায় করবে। আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলুম পড়ার খরচ চালাতে। ফেরৎ এলো।

কিছুদিন পরে দেখি মেজ ছেলেটাও বিগড়েছে। বলে, দাদা আমার

রাম, আমি তার লক্ষ্মণ। দাদা যদি বনবাসে গেল তো আমি কেন গৃহবাসে থাকব?" চলে গেল একদিন আমাকে দাগা দিয়ে। শুনলুম দু'ভাই ছেলে পড়িয়ে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে মামাদের ওখানে। আবার কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলুম। ওয়াপস এলো।

এর পর বড় মেয়ের পালা। বড় ভালোবাসতুম ওটাকে। কলেজে দিয়েছিলুম যাতে সত্যিকারের সুশিক্ষিতা হয়, তার পর ভালো দেখে বিয়ে দিতুম। কিন্তু ওর মামারা ওকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে দিলে। আমি দেখতে পেলুম না। ওর মাও ছিলেন এর মধ্যে। ওর মাকে বললুম, "আমার মেয়ে, আমি সম্প্রদান করব, এই তো নিয়ম। এ তোমরা করলে কী! এর পরে আমি যদি ওকে বঞ্চিত করি?"

ওর মা বললেন, "মেয়ের বয়স তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে! উনিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে এক বেম্ম বাড়িতেই দেখা যায়। হিঁদুর বাড়ি কেউ কোনো দিন দেখেছে? তুমি যে ওর বিয়ে দেবে না ত্রিশের আগে এ কথা ও নিজেই বলছিল একদিন মনের দুখে। কী করি, মেয়ের দুখ্‌খু দেখতে পারিনে, সোমত্থ মেয়ে, কোন দিন কী দুর্গতি হয় কে জানে! আজকাল তো প্রায়ই নারীহরণের খবর কানে আসছে। মুসলমানরা কোন দিন না ধরে নিয়ে যায়। তাই হিঁদুর মেয়ের হিঁদুর সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছি।'

এর পরে গিন্নীর সঙ্গে আড়ি।

ওদিকে আমি একটার পর একটা কয়লার খনি কাঁচা আমের মতো কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচড়ে পুরছি। কয়লার পর মাইকা, মাইকার পর ম্যাঙ্গানীজ, ম্যাঙ্গানীজের পর লোহা, যেখানে যা পাই ইজারা নিই। টাকা ঢালি। লোকসান যায়, তাও সই। কিন্তু আমার পলিসি হচ্ছে ভারতের খনিজ পদার্থ ভারতীয়দের হাতে আনা। বিদেশীদের হাতে পড়তে না দেওয়া। এর দরুন সাহেব মহলে আমার শত্রুর সংখ্যা নেই। তারা জানে যে আমি যদি বেঁচে থাকি তো একদিন জাহাজ নির্মাণ করব।

কিন্তু এদিকে আমার স্ত্রীর সঙ্গেই শত্রুতা। বাইরে শত্রু ঘরে শত্রু। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা! পাগলামির লক্ষণ দেখে আমি তাঁকে ভয়ে ভয়ে বললুম, চল, আমরা কিছুদিন রাঁচিতে কাটিয়ে আসি। তিনি ফোঁস করে তেড়ে এলেন। বললেন, "বটে রে! আমি পাগল? না তুই পাগল?" তিনি রাগ করে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন। সেখান থেকে আদালতে

গিয়ে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর স্বামী পাগল। পাগলের সম্পত্তি পাগল নিজে দেখাশোনা করতে অপারগ। অতএব আদালত থেকে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করা হোক। দরখাস্তের সঙ্গে দু'জন বড় বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করা হলো। হা ভগবান! এঁরা আমার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। আমার শিল আমার নোড়া আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া।

কী আর করি! পাঁচ জন ভদ্রলোকের পরামর্শ নিয়ে স্ত্রীপুত্রের নামে, কন্যাদের নামে, বিষয়সম্পত্তির অধিকাংশ লিখে দিই। ওঁরাই এখন কোম্পানীগুলোর মালিক। আমি ম্যানেজিং এজেণ্ট। প্রতি মিটিংএ আমার উপর চোখ রাঙায়। আমিও তেমনি ঘুঘু। পাই পয়সার হিসাব রাখি। বাজে খরচ করতে দিইনে। তাতে ওদের খুব যে সুবিধে হয়েছে তা নয়। তবে দু'বেলা হোটেলে খাচ্ছে, অনবরত মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, দোকানে দোকানে ঘুরে যখন যা খুশি কিনছে, মাসহারার টাকা এই ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে। দেখলে চোখে জল আসে, কিন্তু উপায় নেই। কী আর করি!

সব চেয়ে দুঃখ হয় যখন শুনি আমি ওদের শত্রু। হায় রে! আমি শত্রু, আমি ওদের শত্রু! যে আমি এক দিন অজাতশত্রু ছিলুম সেই আমি আজ আমার পুত্রকন্যার শত্রু! ওরা আমার মুখ দেখতে চায় না। দেখে যখন টাকার দরকার হয়। অথচ এই আমাকে দেখে আমার পাড়ার ছেলেমেয়েরা লুট করে নিয়ে গেছে চাঁদের আলোয় হাত ধরে নাচতে। রাসলীলার কৃষ্ণ আমি, বৃন্দাবনে সর্বজনপ্রিয়। আর সেই আমি আজ দ্বারকার অধিপতি হয়েও সকলের অপ্রীতিভাজন, সকলের শত্রু। মুষলপর্বের শ্রীকৃষ্ণ আমি, স্বজনের আত্মঘাতী বুদ্ধি দেখেও অসহায়। জরাব্যাধ তো তীর মেরেছে আমার সারা গায়ে, মরণেরও বেশী দেরি নেই।

মাননীয়ের কাহিনী শুনে আমাদের অন্তর আলোড়িত হতে থাকল। আমাদেরও তো ঐ একই সমস্যা। ছেলেরা বাবু, মেয়েরা বিবি, স্ত্রীরা বেপরোয়া খরচ করতে ওস্তাদ। ওরাও সুখী হবে না, আমাদেরও সুখী হতে দেবে না। সুখের পরিবর্তে সাফল্য নিয়ে আমরা কী করব, কার সঙ্গে ভাগ করব! তার মতো ব্যর্থতা আর কী হতে পারে!

"কিন্তু," প্রশ্ন করলেন খাঁ বাহাদুর ফারোকি, "সব হলো, আসল কথাই

তো হলো না। আপনার নিষ্ফলতার সীক্রেট কী? তা তো খুলে বললেন না।"

"আর কত খোলসা করব!" হাসলেন, হেসে বললেন মান্যবর। "আমার নিষ্ফলতার সীক্রেট আমার বিয়ে।"

"উঁহু। হলো না। হলো না।" বলে উঠলেন প্রিন্সিপাল দত্ত। আপনার নিষ্ফলতার সীক্রেট আপনার স্কলারশিপের পড়া।"

সেদিন আমরা কেউ কারো সঙ্গে একমত হতে পারিনি। তার পর থেকে ভাবছি। মাননীয়ের সীক্রেটটা প্রকৃতপক্ষে কী? যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সফলতার সীক্রেট হচ্ছে বিফলতারও সীক্রেট।

(১৯৪৫)

রূপদর্শন

সেদিন নয়নমোহনের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। এসেছিলেন এক বিয়ে-বাড়িতে বরযাত্রী হয়ে। আমি ছিলুম কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত। দেখা হতেই দু'হাত ধরে বললেন, "মনে পড়ে?"

আমি তাঁর দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললুম, "না, মনে পড়বে কেন? মনে পড়ার তো কারণ নেই। মনে পড়ার তো কথা নয়।"

তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। "ইচ্ছা ছিল তোমার ওখানে উঠতে। কিন্তু জানোই তো বরযাত্রীরা স্বাধীন নয়। এসেছি একটা দলের সঙ্গে দলচর হয়ে। সেইজন্যে—"

"সেইজন্যে একখানা চিঠি লিখেও জানাতে নেই যে আসবার কথা আছে ময়মনসিংহে। না, নয়নদা, তোমাকে আমার মনে পড়ে না। মনে পড়বে যদি তুমি এখনো আমার ওখানে ওঠ।"

"না, ভাই। এ যাত্রা নয়। এর পরে আবার যদি কোনো দিন আসা হয় তো নিশ্চয়। এবার আমাকে মাফ করতে হবে। বুঝলে?"

তাঁর কণ্ঠস্বরের কারুণ্য আমাকে স্পর্শ করেছিল। আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করলুম না, শুধু একবার চা খেতে ডাকলুম। তিনি রাজি হলেন। পরের দিন চা খেতে এসে সুধালেন, "তুমি আমাকে একবার কী বলেছিলে মনে আছে?"

বিশ বছর পরে দেখা। কী করে আমার মনে থাকবে কী বলেছিলুম কবে। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না, মনে নেই।

"বলেছিলে, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ।"

"তাই নাকি? কই, আমার তো মনে নেই।"

"তোমার মনে থাকার কারণ নেই, আমার মনে থাকার কারণ আছে। তাই সেদিন ভাবছিলুম, তোমার কথাই অবশেষে সত্য হলো, কবি।" তিনি আমাকে কবি বলে ডাকতেন।

"কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হতো।" তিনি সেই নিঃশ্বাসে বললেন। "এ যা হলো তা আরো মর্মান্তিক।"

আমি জানতুম নয়নদার বিয়ের গল্প। জানতুম না তার পরিণতি। নয়নদার বিয়েতে আমি বরযাত্রী হয়েছিলুম, কবিতা লিখে ছাপিয়েছিলুম। বোধ হয় বৌদির রূপদর্শন করে সান্ত্বনাচ্ছলে বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। তার মানে, রূপ ভগবান সবাইকে দেননি, যাকে দেননি সেও রূপবতী কবির চোখে।

আমি তো রিয়ালিস্ট নই, হলে সাফ কথা শুনিয়ে দিতুম নিষ্ঠুর ভাবে। কিন্তু যাঁর বিয়ে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। রূঢ় বাস্তব তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। বিয়ের পরে তিনি আমাদের কারো কারো কাছে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন, "ভাই, এ যে পোড়াকাঠ।" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, "দাঁত বার করা, নাক চাপা, এ যে করালী।"

নয়নমোহনের নিজের মত ছিল না, তিনি শাসিয়ে রেখেছিলেন আত্মঘাতী হবেন। কিন্তু তাঁর দাদারা তাঁর মা'কে বুঝিয়েছিলেন যে ডিক্রীদারের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে ডিক্রীদারের দুহিতাকে বধূ করতে হবে। মা বললেন, "সম্পত্তি যদি যায় তো কে তোকে সুন্দর মেয়ে দেবে। কী দেখে? তখন তো সেই কালো মেয়েই বিয়ে করতে হবে। দেখিস্ আমার কথা ফলে কি না ফলে।"

এর উত্তরে নয়নদা বলেছিলেন, "তা কেন হবে! আমি যদি বিয়ে না করি।"

"শোনো কথা! যদি বিয়ে না করি। তা কি কখনো হয়! বিয়ে না করলে তোকে রেঁধে খাওয়াবে কে?"

নয়নদার ঠাকুমা তখনো বেঁচে। তিনিই নাতির নাম রেখেছিলেন নয়নমণি। নয়নমণি থেকে বিবর্তন সূত্রে নয়নমোহন। বুড়ী বললেন, "তোর বাপও বলত বিয়ে করব না, সন্নেসী হব। কী বলে ওকে, কী আনন্দ। বেবাক আনন্দ। বাপ বিয়ে না করলে তুই হতিস্ কি করে? বল আমাকে। বল।"

বৌদিরা বললেন, "দেখছ তো আমাদের দশা। রূপ থেকেও নেই, কেননা রূপো নেই। গয়না পর্যন্ত বন্ধক। আসল জিনিস হলো টাকা।

তোমার শ্বশুরের তা আছে। এমন পাত্রী হাতছাড়া করতে নেই। করলে তোমায় বলব লক্ষীছাড়া।"

নয়নমোহন বাড়ির অবস্থা জানতেন না। বৌদিদিদের কথায় হুঁশ হলো। তিনি ছিলেন রিয়ালিস্ট, তাই শেষ পর্যন্ত মত দিলেন। কিন্তু অন্তর থেকে তো দেননি। অন্তর কেন তা মানবে? সেইজন্যে বিয়ের পরের দিন তাঁর কাঁদুনি। এবং সেই উপলক্ষে আমার সান্ত্বনাবাণী।

আমরা যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলুম তাঁরা জানতুম এ বিবাহে তিনি সুখী হবেন না। হতে পারেন না। কারণ আর সব বিষয়ে বাস্তববাদী হলেও বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁর পরম কাম্য ছিল তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী। কখনো কাউকে ভালবেসেছিলেন কি না বলতে পারব না, কিন্তু যাকে তিনি ভালোবাসবেন সে কেমন হবে তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের মাঝে মাঝে শোনাতেন।

বিয়ের পরে রসিকতা করে কে একজন তাঁকে বলেছিল,—"তুমিই জিতলে। যা চেয়েছিলে অবিকল তাই পেলে। তন্বী মানে রোগা, শ্যামা মানে কালো, শিখরিদশনা মানে পাহাড়ের মতো দাঁত, আর পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী মানে ফাটা তেলাকুচার মতো ঠোঁট দুটির মাঝখানে অনেকটা ফাঁক।"

নয়নদা বেচারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল ও কথা শুনে। তাঁর সব চেয়ে মনে লেগেছিল আরেকজনের বক্রোক্তি, "নয়ন, তুমি চোখে অন্ধকার দেখছ।"

আমরা তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে প্রকৃতিস্থ করি, নইলে তিনি হয়তো বিকৃতিবশত কিছু একটা করে বসতেন। আমি যে ঠিক কী কথা বলেছিলুম আমার মনে ছিল না। তাঁর মনে ছিল দেখছি।

"তোমার কথাই অবশেষে সত্য হলো, কবি" তিনি বললেন, "কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হতো। এ যা হলো তা আরো মর্মান্তিক।"

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হয়েছে, নয়নদা? খারাপ কিছু নয় তো?"

"না। খারাপ কিছু নয়। সমূহ কুশল।"

আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু নিরস্ত হলুম না। জানতে চাইলুম, "তা হলে আরো মর্মান্তিক কেন?"

তিনি বললেন, "শোনো তা হলে।"

সত্যেন দত্তের একটি জাপানী থেকে অনুবাদ মনে পড়ে।

"অতি বড় অভাগা যে আমি একটা
আমি কিনা পেয়ে গেলুম মনি ব্যাগটা।"

বিয়ের পরে আমার মনোভাব ধীরে ধীরে দাঁড়াল ঐ জাপানীটির মতো। আর কিছু না পাই টাকার থলি তো পেয়েছি। এই বা ক'জন পায়! জীবিকার জন্যে আমাকে পরের চাকরি করতে হবে না, স্বাধীন ব্যবসাতে মূলধনের অভাব হবে না, ব্যবসা ফেল মারলেও সংসার অচল হবে না, লক্ষ্মী হবেন অচলা। এ কি কম কথা! এত যে দুশ্চিন্তা ছিল এম. এ. পাশ করে তার পরে কী করব, কোথায় স্থিতি পাব, সব দুশ্চিন্তা জল হয়ে গেল। সমবয়সীদের কেউ কেউ এখনো স্থিতি পায়নি, খবর রাখো বোধ হয়। বিশ বছর পরেও তাদের জীবনযাত্রা অস্থির। আর আমি সব দিক থেকে গুছিয়ে নিয়েছি। স্বাস্থ্য আমার এত ভালো যে এক দিনও অনিদ্রা হয় না। আর তোমার তো শুনি কোনো দিন সুনিদ্রা হয় না। তুমি কৃপার পাত্র। কালো মেয়ে বিয়ে করলে ভালো থাকতে।

জানো তো আমাদের কেমন খানদানী বংশ। আগেকার দিনে সুন্দর মেয়ে আমরা লুট করে বিয়ে করতুম। তার পরে কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে সুন্দর মেয়ে ঘরে আনি। বর্ণকৌলীন্য যখন উঠে গেল তখন কাঞ্চন-কৌলীন্য আমাদের ঐ কাজে লাগল। আমরা পণ নিতুম না, যৌতুক নামমাত্র নিতুম, কিন্তু বৌ আনতুম সুন্দরী দেখে। এর ব্যতিক্রম যে হতো না তা নয়। এমন কোন নিয়ম আছে যার নিপাতন নেই? কিন্তু তা বলে আমার নিজের বেলা ব্যতিক্রম হবে এ আমি কল্পনা করিনি। আমার দাদারা সুন্দরী বিয়ে করেছেন। আমার ধারণা ছিল আমারও জন্মস্বত্ব সুন্দরী ভার্যা। বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, সম্পত্তি যদি মর্টগেজ রেখে না যেতেন, তা হলে এ অঘটন ঘটত না। বংশের ব্যতিক্রম হয়ে নাম হাসাতুম না।

তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমার মতো ভাগ্যবান বন্ধুদের সবাইকে হিংসা করি। যেদিন তোমার বিয়ের খবর পড়ি সেদিন যেন বুকে শেল বাজল। বিশ বছর দেখা হয়নি বলে আশ্চর্য হচ্ছ। এ জীবনে দেখা হলো এইটেই আশ্চর্য। তুমি জিতেছ, আমি হেরেছি। তোমার সঙ্গে কোন মুখে দেখা করতুম! আমারি মতো যারা দুর্ভাগা তাদের সঙ্গে দেখা হয় বছরে

দু'বছরে একবার। কেউ কেউ আবার এমন হতভাগা যে সেই জাপানী বেচারার মতো মনিব্যাগটা তুলে নিয়ে দেখে—

"ট্রামগাড়ী চাপাপড়া ব্যাঙ চ্যাপটা।"

গোপেনকে মনে আছে তোমার? আবগারি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট হয়েছে এখন। গোপেন আমাকে রামপ্রসাদী গান গেয়ে শোনাত। বলত, কালো ভুবন আলো। তেমনি তার সাজা পেতে হলো নিজেকে। বিয়ে হলো কালো মেয়ের সঙ্গে। আশা করেছিল শ্বশুর তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে যাবেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ বিয়ে করে দিয়ে গেলেন আরো কয়েকটি কৃষ্ণকলির অভিভাবকত্ব। গোপেন কিন্তু আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছিল। তাকে বলতুম, আচ্ছা, কালো না হয় আলো, কিন্তু খাঁদা কী করে টিকলো হবে? সে বলত, চীন দেশে খাঁদা নাকের উপর তিন হাজার বছর ধরে কবিতা লেখা হয়ে আসছে, ও দেশের রামপ্রসাদী গান কালী ভক্তির নয়, খাঁদী ভক্তির। তা যেন হলো, কিন্তু দাঁত বার করা কি সহ্য হয়? যেন খেতে আসছে। গোপেন বলত, এর উত্তর দিয়ে গেছেন জয়দেব কবি। বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী। খেতে আসছেন না, বলতে আসছেন যে তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমার প্রিয়া। বচনের উল্লাসে জ্যোৎস্নার মতো ফুটে উঠছে দশন।

মানুষের বাইরেটা কিছু নয়, ভিতরটা আসল। রূপ কিছু নয়, গুণই আসল। এ কথা আমি কত লোকের মুখে শুনেছি, বিশ্বাস করেছি, মুখ ফুটে বলেওছি। কিন্তু সান্ত্বনা পাইনি। রূপের স্বাদ কি গুণে মেটে? রূপ ক্ষণকালের, গুণ চিরকালের। তা বলে কি ক্ষণপ্রভার মূল্য কিছু কম? যখন শুনতুম বৌটি বড় গুণের তখন খুশি হতুম খুবই, কিন্তু তার চেয়েও খুশি হতুম যদি শুনতুম চোখ দুটি তো বেশ। গুণের প্রশংসা যত শুনতুম রূপের সুখ্যাতি তার সিকির সিকিও নয়। রাগ ধরত যখন ওরা বলত বৌমানুষের রূপের প্রয়োজন নেই। রূপের প্রয়োজন নাকি রূপোপজীবিনীর! তবে বৌদিদিদের আনা হয়েছিল কী দেখে? তাঁদের রূপবন্দনায় পঞ্চমুখ যারা তারাই আবার রূপের অসারতা ঘোষণা করত আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ত তোমার উক্তি। রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন। সবাইকে দিয়েছেন তো কৃষ্ণাকেও দিয়েছেন। তা হলে আমার চোখে পড়ে না কেন? লোকের চোখে পড়ে না কেন? এর উত্তর, দেখবার চোখ তিনি সবাইকে দেননি। আমাকে দেননি। লোকদেরকে দেননি। কৃষ্ণার

রূপ আছে, আমাদের চোখ নেই। একি সত্য? অনেক ভেবেছি, কিন্তু সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি। ধরে নিয়েছি এটা একটা স্তোকবাক্য। এ বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা জানিয়েছ। ওটা তোমার বন্ধুকৃত্য। কিন্তু বন্ধুতানিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য নয়। তোমার বিয়ের পরে মনে হয়েছিল তুমি আমাকে পরিহাস করে ওকথা বলেছিলে। ওটা তোমার শ্লেষ। কিছু কাল তোমার উপর বিরূপ হয়েছিলুম। তোমাকে আক্রমণ করে একটা প্রবন্ধ লিখে মাসিকপত্রে পাঠিয়েছিলুম। তারা ছাপল না। ভাগ্যিস ছাপেনি।

ক্রমে আমার প্রতীতি হলো যে রূপ-বোধ একটা সংস্কার। জনম অবধি আমি রূপ নিরীক্ষণ করেছি, সেই জন্যে কৃষ্ণাকে মনে হচ্ছে কুরূপ। ধরো, যদি শিশুকাল থেকে কুরূপ নিরীক্ষণ করতুম তা হলে কি কৃষ্ণাকে মনে হতো কুরূপ! না, তা হলে তাকে মনে হতো আর সকলের অনুরূপ। এই প্রতীতির পর আমি একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হতে চাইলুম। কেন, সে কথা খুলে বললুম না। বৌদিদিদের মুখদর্শন করে তার পরে কৃষ্ণার মুখদর্শন করলে কৃষ্ণাকে কুরূপ দেখাবেই। এর একমাত্র প্রতিকার বৌদিদিদের মুখদর্শন না করা। যে বাড়িতে কেবল কৃষ্ণাই একমাত্র নারী সে বাড়িতে স্বরূপ কুরূপের বৈষম্য নেই। দেখলুম কৃষ্ণাকে আমার তত খারাপ লাগছে না। তার চোখ দুটি সত্যি সুন্দর। তার প্রোফাইলের ফটো নিয়ে দেখা গেল মন্দ মানায় না। রূপ বলতে আমরা শুধু গায়ের রং আর মুখের সৌষ্ঠব বুঝি। এতে কিন্তু অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। কৃষ্ণা ক্ষীণমধ্যা, এখানে তার জিৎ। সে সুকেশী, এখানে তার জিৎ। তার তনুরেখা বঙ্কিম ও সুমিত, এখানে তার জিৎ। তার গড়ন মাংসল নয়, দীঘল, এখানে তার জিৎ। হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। এখানে তার জিৎ। এ ভাবে বিশ্লেষণ করলে কৃষ্ণার জিৎ অনেক বিষয়ে। কিন্তু সৌন্দর্য তো বিশ্লেষণ করবার বস্তু নয়। আর আমিও নই সম্পূর্ণ নিরাসক্ত সমালোচক। ও যদি আমার না হয়ে পরের হতো আমি ওকে রূপের পরীক্ষায় পাস মার্ক দিতুম। কিন্তু ও আমার হয়েই ফেল করেছে। এইটেই মর্মান্তিক।

একটি ছেলে একটি মেয়ে হবার পর আমি বাইরের বারান্দায় পৃথক শয্যা পাতলুম। কৃষ্ণা ভেবেছিল দু'দিনের বৈরাগ্য। একটু হেসেছিলও। কিন্তু মাসের পর মাস কাটে, আমার সংকল্পের পরিবর্তন হয় না। আমার মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, আমি মন স্থির করে ফেলেছিলুম। ওদিকে কৃষ্ণার

মনে খোটানা। সে একা শুয়ে শান্তি পায় না, অথচ আমার কাছে এসে বাইরে শুতে সাহস পায় না। একদিন শেষ রাত্রে সে এলো আমার কাছে। এসে লুটিয়ে পড়ল। তার কণ্ঠে দুর্জয় ক্রন্দন। ধরা গলায় বলল, "তুমি কি আর আমার সঙ্গে শোবে না?"

তাকে অনেক বোঝালুম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শেষে রাগ করে বললুম, "আমি কোথাও চলে যাব, হিমালয়ে কি পণ্ডিচেরীতে।" তা শুনে সে কেঁদে আকুল। পরের দিন জেদ ধরল, "আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এ বাড়িতে যেই আসে সেই জানতে চায় আলাদা বিছানা কেন? লজ্জায় মারা যাই।" বাপের বাড়ি থেকে কয়েক মাস পরে আপনি ফিরে এলো। বাপের বাড়িতেও সকলে জানতে চায় আলাদা থাকার কারণ কী? লজ্জায় মারা যায়। ফিরে এসে আবার সেই একই সমস্যা। লজ্জায় বাঁচে না। এক দিন আমাকে মিনতি করে বলল, "অন্তত এক বিছানায় শোও। মাঝখানে ছেলেমেয়ে। লোকলজ্জা থেকে বাঁচাও।"

তাই হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'জনের মধ্যে সেই যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে আর বুজল না। এ যেন নেহাৎ একটা লোক দেখানো সেতুবন্ধ। সকলে জানল যে আমরা একটি সুখী ও সম্ভ্রান্ত দম্পতী। আমরা জানলুম যে আমাদের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। অশ্রুজলের সাগর।

ভগবানকে ডেকে কতবার বলেছি, "প্রভু, ওকে একটি দিনের জন্যে রূপবতী করো, দিনের আলোর মতো রূপ দাও। চিত্রাঙ্গদাকে দিয়েছিলে একটি বছরের জন্যে, কৃষ্ণাকে দাও একটি দিনের জন্যে।"

:

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় নয়নমোহন চমকে উঠলেন।

"তোমার ওটা কি ঘড়ি না ঘোড়া হে?"

আমি বললুম, "ও ঘড়ি ফাস্ট চলেছে।"

"কিন্তু আমার আর বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। আমরা আজ রাত্রের ট্রেনে যাচ্ছি। যেটা দশটায় ছাড়ে।"

"আর একটা দিন," আমি অনুরোধ করলুম, "এখানে থেকে গেলে পারতে। তোমার তো চাকরি নেই।"

"চাকরি নেই, কিন্তু যা আছে তা চাকরির বাড়া। মজদুররা ধর্মঘটের নোটিস দিয়েছে, এখন গিয়ে তাদের মানভঞ্জন করতে হবে।"

এর পরে তিনি তাঁর কাহিনীর খেই ধরলেন।

কৃষ্ণা জানত যে তার রূপের অভাব আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছে, সেই জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করত রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করতে। অন্য কেউ হলে স্নো পাওডার মেখে সঙ্ সাজত, নানা রঙের শাড়ি ব্লাউজ পরে প্রজাপতি সাজত। কিন্তু সাজপোশাকের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না বলে তারও লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল গুণের উপর। সে তার লক্ষ্যভেদ করেছিল। তবু আমার মন পায়নি।

এর কারণ রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। রূপের অভাব রূপ দিয়েই পূরণ করতে হয়। তা যে পেরেছে সে অসাধ্য সাধন করেছে। এই অসাধ্যসাধন কৃষ্ণার সাধনা ছিল না। অন্য কোনো সাধনা এর স্থান নিতে পারে না। তাই তার গুণের সাধনা আমাকে জয় করেনি। উমার তপস্যা শিবের মতো বিরূপাক্ষের জন্যে। আমার মতো স্বরূপাক্ষের জন্যে নয়। আমার নয়ন যদি সায় না দেয় তো মন সায় দেয় না। মন যদি সায় না দেয় তো দেহ সায় দিতে চায় না। গুণ দিয়ে কি বিকার দূর করা যায়?

আমি যে বিকার বোধ করি এ কথা তাকে মুখ ফুটে বলিনি। সে বুদ্ধিমতী, নিজেই বুঝে নিয়েছিল, তাই একদিন আমাকে বলেছিল, "তুমি আর একটি বিয়ে করো, বা যেখানে ইচ্ছা যাও। এমন করে ক'দিন চালাবে!" এর উত্তরে আমি বলেছিলুম, "পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে চাইনে। যেমন চলছে চলুক।"

বস্তুত আমার একদণ্ড ফুরসৎ ছিল না, দিনরাত কাজ আর কাজ। হোসিয়ারীর কারখানা খুলেছিলুম, দেখাশোনা করতে হতো আমাকেই, স্লীপিং পার্টনার আমার তিন সম্বন্ধী, ওয়ার্কিং পার্টনার আমি। কখন খাই কখন শুই কিছুই ঠিক নেই। শুধু এই ঠিক যে বছরের শেষে লাভ দেখাতে হবে। লাভ যদি না দেখাতে পারি তো সম্বন্ধীরা টাকা তুলে নেবেন। তখন আমি মূলধন পাব কোথায়?

কৃষ্ণা যখন উপলব্ধি করল যে তার গুণের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, রূপের সাধনাও সুদূর পরাহত, তখন আমাকে একা রেখে ছেলেমেয়ে সমেত দার্জিলিং চলে গেল। সেখানেই তারা লেখাপড়া শিখবে ও মানুষ হবে। আমি দুঃখিত হলুম, কিন্তু বাধা দিলুম না। ওর একটা পরিবর্তন দরকার। কে জানে হয়তো শীতের দেশে বাস করে রঙটা এক পোঁচ ফরসা হতে পারে।

অকস্মাৎ স্বাধীনতা পেয়ে আমার অবস্থাটা হলো বৈপ্লবিক। যেমন হতে যাচ্ছে ভারতবর্ষের। কী যে করি স্বাধীনতা নিয়ে, বহুকালের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে, বঞ্চিত জ্বালা নিয়ে—কী যে করি! কী যে করি!

তুমি শুনে অবাক হবে যে কিছুই করলুম না। তার কারণ যাই করতে যাই তাই মনে হয় তুচ্ছ। মনে হয় এমন কিছু করা উচিত যা কেউ কোনোদিন করেনি। যা উচ্চাদপি উচ্চ। তেমন কিছুর নাগাল পেলে হয়! কাব্যের নায়িকারা হোসিয়ারীর কল পরিদর্শন করতে এলে হয়! ট্রয়ের হেলেন, বৃন্দাবনের রাধা, ইরানের লায়লা, চিতোরের পদ্মিনী—কোথায় দেখা পাই এঁদের! কেউ কি এরা পথ ভুলে বক্তিয়ারপুর আসবেন না!

তোমার মনে আছে কি না জানিনে, কলেজে আমার প্রিয় কবি ছিলেন টেনিসন আর প্রিয় কবিতা ছিল "সুন্দরী নারীদের স্বপ্ন।" অবশ্য আরো প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস, কিন্তু টেনিসন একটু বিশেষ অর্থে প্রিয়। ঐ "সুন্দরী নারীদের" জন্যেই। হায়! এত যে তাঁদের নাম জপ করলুম, রূপ ধ্যান করলুম, তবু তো তাঁদের কারো করুণা হলো না। মেন লাইনে ট্রেন দাঁড়ালেই আমার মনে হতো এই ট্রেনেই তিনি এসেছেন, এসে আমাকে খুঁজছেন। সব কাজ ফেলে স্টেশনে ছুটে যেতুম, গিয়ে নিরাশ হতুম। লোকে বলাবলি করত, "ফী ট্রেনেই এঁর জানানা আসছেন। বাউরা হয়েছেন।" আমি কিন্তু ও সব গায়ে মাখতুম না, নিরাশ হলেও যেতুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন থেকে নামছেন ট্রয় দেশের হেলেন নয়, বৃন্দাবনের রাধা নয়, দার্জিলিংএর কৃষ্ণা। ছেলেমেয়েদের দার্জিলিংএর বোর্ডিং স্কুলে রেখে এসেছেন, সেখানে তারা সুখে আছে। আমার না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে একথা ভেবে তাঁর অস্বস্তি বোধ হলো, তাই চলে এলেন। যাক্, আমাকে বাঁচালেন। লোকে স্বীকার করল, না বাউরা নয়। আর আমিও স্বীকার করলুম যে স্বাধীনতার ঝক্কি পোষায় না। তার চেয়ে স্ত্রীর হাতের মোচার ঘণ্ট মিষ্টি।

কিন্তু মোচার ঘণ্ট এবার মিষ্টি লাগল না। দেখা গেল কৃষ্ণা কেবল চিঠি লিখছে বসে। ধরে নিলুম ছেলেমেয়ের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, চিঠি লিখে মনের ভার হাল্কা করছে। কিন্তু প্রতি দিন ওর নামে একই মানুষের লেখা খামে-বন্ধ চিঠি আসতে দেখে সন্দেহ জাগল, কার হাতের লেখা এসব। মেয়েলি হাতের কি না। কয়েকবার ইতস্তত করে ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা

করলুম তাকে। সে বিনাবাক্যে উত্তর দিল চিঠিগুলো আমার সামনে রেখে।

বিস্ময়! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! উর্দু ভাষার একজন উদীয়মান কবি দার্জিলিংএ বসে গজল লিখছেন। সাকী বলে যাকে সম্বোধন করছেন সে আমার কৃষ্ণা। সাকীর কাছে নিত্য নূতন গজল আসছে স্বাক্ষরিত হয়ে। প্রেরণাও ফুরোয় না, গজলও ফুরোয় না। বলাবাহুল্য উর্দু আমরা দু'জনেই জানতুম। আমিই শিখিয়েছিলুম কৃষ্ণাকে। স্বয়ং শিখেছিলুম মুসলমান বন্ধুদের কাছে। সে বিদ্যা যে এভাবে কাজে লাগবে কল্পনা করিনি। হতভম্ব হলুম। কবির নাম হাফিজ দিয়ে আরম্ভ। তাঁকে তাই হাফিজ বলে উল্লেখ করব।

হাফিজ নাকি পতঙ্গের মতো রওশনের রূপমুগ্ধ। রূপের বর্ণনা যা দিয়েছেন তা আমার পক্ষে আবিষ্কার। এত রূপ যে আমার অগোচর ছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বিশ্বাস না করেও পারিনে। কারণ কবি যা লিখেছেন তা পরিহাসের সুরে নয়। তবে কি একথা সত্য যে আমার চোখে যে রূপহীনা অন্যের চোখে সে রূপসী। এ কি কখনো সত্য যে কুরূপা বলে কেউ নেই, ওটা দৃষ্টিবিভ্রম! বা চোখের ধাঁধা।

তখন আমার মনে পড়ল তোমার উক্তি। ভগবান রূপ সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ। এই উর্দু কবি একজন শিল্পী। ইনি তাই কৃষ্ণার রূপ দেখে রওশনের সঙ্গে তুলনা করছেন। হায়, আমিও যদি শিল্পী হতে পারতুম। আমার শিল্পরচনার দৌড় বক্তিয়ারপুরের গণেশমার্কা গেঞ্জি ও হনুমান মার্কা মোজা। ওই চোখে ভগবানের দেওয়া রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। চোখ দুটোকে বদলে নেওয়া চাই। ভাবলুম, কিছুদিন হনুমান ও গণেশের ধ্যান ছেড়ে গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা অবলোকন করব। স্ত্রীকে বললুম, "চল, আমরা দার্জিলিং যাই। দেখে আসি টুবলুকে টুটুকে।"

আহ্! কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। কী করে তার বর্ণনা দেব। আমি তো কবি নই। কিন্তু এও আমি বুঝতে পারিনে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো নারী থাকতে কৃষ্ণার মতো নারী কী করে বন্দনা পায়। কবিদের কি সত্যিকার সৌন্দর্যবোধ আছে! আমার তো মনে হয় না।

হাফিজকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। জরিদার শেরওয়ানী ও চুড়িদার পায়জামা

পরে তিনি এলেন, শুনলুম তিনি নবাব ঘরানা। মুর্শিদাবাদে বাড়ি। পরের মুখে নিজের স্ত্রীর রূপবর্ণনা তো শোনোনি, তুমি কী করে বুঝবে আমার ব্যথা। আমার যা লাগছিল আমিই জানি। সুধালুম, "আচ্ছা, এ কি তবে সবি সত্য হে আমার স্ত্রীর ভক্ত··" মনে আছে তো, রবীন্দ্রনাথের সেই কৌতুকের কবিতাটি? "চির ভক্ত" কে "স্ত্রীর ভক্ত" করেছি।

কবি বললেন, "কাব্যের সত্য জীবনের সত্য এক নয়। যেমন চিত্রের সত্য ফোটোগ্রাফের সত্য এক নয়। এও সত্য, আবার সেও সত্য।"

কৃষ্ণা সেখানে ছিল না, থাকলে হয়তো আঘাত পেত। ইতিমধ্যে তার ধারণা জন্মেছিল সে যথার্থই সুন্দরী। দুই অর্থে। কাব্যে ও জীবনে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে নয়নদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে অভয় দিলুম যে ট্রেন ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। তখন তিনি পূর্বানুবৃত্তি করলেন।

দার্জিলিংয়ে আমার চোখ খুলে গেল। দেখলুম কৃষ্ণার গায়ের রঙ এক পোঁচ ফরসা হয়নি বটে, কিন্তু রঙ ধরেছে ভিতরে। সে যেন এতদিন পরে আপনাকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে সে সুন্দরী। সাতাশ কি আঠাশ বছর বয়সে যদি কোনো মেয়ে প্রথম আবিষ্কার করে সে সুন্দরী তা হলে তার সেই আবিষ্কার তাকে বিপ্লবের আস্বাদন দেয়। এ যেন একটা আগস্ট বিপ্লব। হিংসার ক্ষমতা নেই বলে দীর্ঘকাল অহিংসা অনুশীলন করার পর অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল আমরা হিংসার ক্ষমতা রাখি। দেখছ তো দেশ কেমন রক্ত পিপাসায় অধীর হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ না একটা আণবিক বোমা কলকাতায় কি বম্বেতে পড়ছে ততক্ষণ এ পিপাসার নিবৃত্তি নেই।

কৃষ্ণাকে নিয়ে আমার দশা হলো মহাত্মার মতো। কী করে তাকে বোঝাই যে তার আবিষ্কারটা কাব্যের সত্য, জীবনের সত্য নয়। যে একথা বোঝাতে পারত সে হাফিজ। হাফিজ ক্রমে দুর্লভ হলো, তার চিঠিও এক সময় বন্ধ হলো। কিন্তু ক্ষতি যা করে গেল তার জের চলতে থাকল। কৃষ্ণা বিশ্বাস করল হাফিজের জবানবন্দী সাচ্চা, আমার জবানবন্দী ঝুটা। আমি তাকে এগারো বছর ধরে ঠকিয়ে এসেছি। আমি প্রবঞ্চক। সে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকায় না, আমিও কেমন যেন অপরাধী বোধ করি নিজেকে। একে তো আমাদের দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, মানসিক সম্বন্ধেও ভাঙন ধরল।

দার্জিলিং থেকে একসাথেই ফিরি। আমি প্রস্তাব করেছিলুম, সে যদি দার্জিলিংএ একা থাকতে চায় তো পারে থাকতে। সে নাকচ করল। বোধ হয় লোকনিন্দার ভয়ে। বক্তিয়ারপুরে ফিরে আমি আমার কাজকর্মে ডুব মারলুম। আর সে চলল উজান বেয়ে। বয়স তার দিন দিন কমতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাটায় আয়নার সামনে। চুল বাঁধে, চুল খোলে, আবার বাঁধে। শাড়ি পরে, শাড়ি ছাড়ে, আবার পরে। সাজপোশাকের বাহার ছিল না, শুরু হলো। স্নো পাউডার মেখে জুতো পালিশের মতো চেহারা হলো। তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই, যার টাকা আছে সে যদি দু'হাতে ওড়ায় তো আমার কী! কিন্তু মাঝখানে ছেলেমেয়ে না শোওয়ায় সে একেবারে আমার কোলে এসে শোয়। আশা করে আমি তার রূপ দেখে ভুলব। ক্ষণকালের জন্যে ভুলিনি যে তা নয়, কিন্তু সেটা আমার নিজের দুর্বলতা, তার মাদকতা নয়। সে কিন্তু ধরে নেয় যে তার মধ্যে অপূর্ব মোহিনী শক্তির সঞ্চার হয়েছে। অমনি মোহিনী শক্তির অনুশীলনে রত হয়। এদিকে আমি বিকার বোধে অস্থির। কী করে পরিহার করব ভেবে পাইনে।

আর একটি সন্তান হলো, এটি ছেলে। খুব খুশি হলুম দু'জনে। আমি বললুম, "আর কেন? এখন থেকে পূর্ব ব্যবস্থা বহাল হোক।" সে কিছু বলে না, মুচকি হাসে। ছেলের জন্যে ছোট্ট একটা বেবী কট কেনা হলো। ছেলেটি সেইখানে শোয়। আর আমি প্রতি রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই শোচনীয় পঙ্ক্তিগুলি আবৃত্তি করি—

"রে মোহিনী রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস্ হরে
আমার যামিনী।"

অগত্যা পণ্ডিচেরীর কথা বলাবলি করতে হলো। হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করতে পারি আভাসে ইঙ্গিতে জানালুম। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে ও কথা! আমার হোসিয়ারী ফাঁপতে ফাঁপতে টেক্‌স্‌টাইলের আকার ধারণ করেছিল। কটন মিলের উদ্যোগ আয়োজনে জীবনটা মধুর হয়েছিল। রূপ না হয় পাইনি, কিন্তু রূপো তো পেয়েছি অজস্র অঢেল। রূপের মায়া আমাকে ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু রূপোর মায়া? দেখা গেল কামিনীর চেয়ে কাঞ্চনের আকর্ষণ

কম নয়। থেকে গেলুম কাঞ্চনের টানে। কৃষ্ণা কিন্তু ঠাওরালো কামিনীর টানে। তার মুখে হাসি আর ধরে না। মোহিনী শক্তির জয়।

সেই হাড়িকাঠ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই দেখে গুরু ডেকে এনে মন্ত্র নিলুম গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের। কৃষ্ণাকে সাধলুম, "তুমিও নাও।" তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। কী যে হলো তার জানিনে, যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা, পাড়ায় পাড়ায় গল্প করে বেড়ায় আহার নিদ্রা ভুলে। রাত্রে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আসি, বন্ধ করে রাখি। চিকিৎসকের পরামর্শে গুরুর অনুমতি নিয়ে স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ আবার পাতাতে যাই। ফল হয় উল্টো। কাতর স্বরে বলে, তুমি আমার বাপের বয়সী, তুমি মাননীয় বৃদ্ধ, তোমার কি শোভা পায় এ অধর্ম! আমি নাকি তার বাপের বয়সী! হে হরি! আমি নাকি মাননীয় বৃদ্ধ! হে ঈশ্বর!......

নয়নদা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, "পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে আমার নামে রটায় আমি নাকি তাকে সুন্দরী তরুণী পেয়ে তার উপর বল প্রয়োগ করি। বুড়ো বয়সে আমার নাকি ভীমরতি ধরেছে।...ও হোহো।...আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না, ভায়া। বেলডাঙ্গায় আমাদের তু'নম্বর মিলটা তৈরি হয়ে গেলেই আমি চোখ বুজব।... সবাই বলছে ওকে পাগলা গারদে পাঠাতে। কিন্তু সেটা হবে যথার্থ অধর্ম। না, সে আমি পারব না। কিন্তু এও আমার অসহনীয়। আমার মান গেল, আমি হেয় হয়ে গেলুম লোকচক্ষে।"

আমি তাঁর চোখ মুছিয়ে দিলুম সেকালের মতো। এক হস্‌টেলে এক ঘরে বাস করতুম আমরা। রাত কেটে যেত সুন্দরী নারীদের স্বপ্নে। নয়নদার নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল সুন্দরী নারী তাঁর ভাগ্যে অবধারিত। সেটা তাঁর জন্মস্বত্ব। জন্মস্বত্বের খণ্ডন হলো দেখে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন বিশ বছর আগে। চোখ মুছিয়েছিলুম আমরা কয়েকজন বয়স্য।

সান্ত্বনাচ্ছলে সেবার বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। এবার কী বলব? বলার আছে কী?

(১৯৪৬)

নারী

১

সেবার আমরা ছুটি নিয়ে উত্তরাপথ বেড়িয়ে আসার পর যেখানে বদলি হই সেখানকার বাড়ির সামনের দিকটা খোলা। দরজা খুলে রাখলে রেললাইন থেকে অন্দর দেখা যায়। পর্দার খোঁজ পড়ল। পর্দা ছিল মালগাড়িতে মালের সঙ্গে। হাতের কাছে ছিল বৃন্দাবন থেকে উপহারের জন্যে আনা খানকয় নামাবলী। আব্রুর জন্যে দরজায় জানালায় লটকিয়ে দেওয়া গেল আপাতত।

কিসের থেকে কী হয়। আশঙ্কা ছিল লোকে নিন্দে করবে নামাবলীর অসম্মান দেখে। ঘটল তার বিপরীত। প্রদীপের আকর্ষণে যেমন পতঙ্গ আসে তেমনি নামাবলীর সম্মোহনে এলো বাউল বৈষ্ণব দরবেশ। হাঁ, মুসলমান দরবেশ। আর এলো বামাচারী তান্ত্রিক। এদের সকলের ধারণা আমি পরম ভাগবত।

সে যুগের একখানি মুখ আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। জানতে ইচ্ছা করে গৌরবদন এখনো বেঁচে আছে কি না। না থাকাই সম্ভবপর। মন্বন্তরে অধিকাংশ বাউল দরবেশ মরে সাফ হয়ে গেছে। ভিক্ষা যাদের উপজীবিকা দুর্ভিক্ষ হলেই তারা ঝরে পড়ল।

রবিবারের সকাল। ঘরে বসে নিজের কাজ করছি, বাইরে উঠল গানের আওয়াজ। কানে এলো সরু মোটা এক জোড়া গলার বিচিত্র স্বর—

"রাধা নামে নাই অধিকার তবে তার কিসের উপাসনা
তার কিসের উপাসনা রে বৃথা তার আরাধনা।"

কাজে মন লাগছিল না। গেলুম দেখতে। চাতালের উপর বসে আছেন তিন বাবাজী—একজন তো আমার তিন বছরের ছেলে, বাকী দু'জন ফোঁটা তিলক কাটা গেরুয়া পরা বৈরাগী। তাঁদের একজনের হাতে আনন্দলহরী, আরেকজনের হাতের কাছে লাউ দিয়ে তৈরি ভিক্ষাপাত্র। যার হাতে আনন্দলহরী তারই নাম গৌরবদন। বয়স চল্লিশের উপর। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মুখে গোঁপদাড়ির ঝোপ।

গান চলতে থাকল। আমি এক পাশে আসন নিয়ে শুনতে থাকলুম।

"শক্তি বিনে নাহি মুক্তি বেদতন্ত্রে আছে যুক্তি
ও সে মূল শক্তি রাধা বিনা সাধনার ফল ফলে না।"

এমন সময় আমার গৃহিণী এসে সাধুদের সিধা ও দক্ষিণা দিয়ে গেলেন। তাতে তাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। একটার পর একটা গান শুনিয়ে চলল তারা। তখন আমি ক্যামেরা এনে তাদের স্ন্যাপশট তুলে নিলুম। এতটা তারা আশা করেনি। ফোটোর নকল চাইল। আর চাইল—যা সকলে চেয়ে থাকে—এক একখানা নামাবলী। এ প্রার্থনা নামঞ্জুর হওয়ায় গৌরবদনের সহচর বিদায় নিল।

গৌরবদনও উঠত, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি তার গান লিখে নিতে আরম্ভ করেছিলুম। এমনি সাহিত্যিক খেয়াল, কিন্তু সে তো জানত না যে আমি একজন সাহিত্যিক। ঠাওরাল আমার ধর্মে মতি আছে। আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল গানের মর্ম। "শক্তি বিনে নাহি মুক্তি—বুঝলেন তো, প্রভু!" আমাকে সে প্রভু বলত। "রামের শক্তি সীতা, শিবের শক্তি দুর্গা, কৃষ্ণের শক্তি রাধা। তেমনি পুরুষের শক্তি নারী। নারীর মধ্যে রাধাশক্তি বিরাজ করে। সকলে তা জানে না। সেইজন্যে গুরু ধরতে হয়।"

এর পরে তার গুরুর প্রশংসা। পরম সুন্দর পুরুষ। মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে যান শিষ্যদের। "আবার যেদিন আসবেন আপনার কাছে নিয়ে আসব তাঁকে। তিনি যেমন করে বোঝাতে পারেন কেউ তেমন পারে না। আমি কীই বা জানি। কতটুকুই বা বুঝি। প্রভু লিখে নিচ্ছেন বলে ভরসা করে নিবেদন করলুম।"

আনন্দলহরী বাজাতে বাজাতে গৌরবদন চলল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি গৌরবদন আবার এসে হাজির। এবার একা। দু'চার কথার পরে ফোটোখানার কথা তুলল। সেখানা তখনো তৈরি হয়নি, শুনে নিরাশ হলো। খান দুই ভজন শোনাবার পরে আপনি এক সময় তার আখড়ার প্রসঙ্গ পাড়ল। শহরের বাইরেই একটু দূরে তার আখড়া। ভিক্ষা করে দিন চলে। কষ্ট হয়। অথচ এমন অবস্থা চিরকাল ছিল না। কিসের অভাব ছিল তার? ঘর গেরস্থালি জোতজমি হালগোরু পুকুরবাগান সবই তো ছিল, এখনো আছে তার ছেলেদের নামে। কিন্তু আর ওমুখো হবার জো নেই।

ভালোই ছিল সে তার ঘরগেরস্থালি নিয়ে। চাষার ছেলে, চাষ থেকে

লক্ষ্মী। হঠাৎ তার একটি আঠারো মাসের খোকা মারা যায়। পরিবার পাগলের মতো হয়। কিছুতেই কিছু হয় না। চিকিৎসার অসাধ্য। বড়ই অশান্তিতে থাকে। একদিন তার পরিবার স্বপ্ন দেখল—পরম সুন্দর পুরুষ। কত লোককে মন্ত্র দিচ্ছেন, তারা দুঃখ শোক ভুলে যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। পরিবার ধরে বসল সেও মন্ত্র নেবে। আর কারো কাছে নয়, তাঁরই কাছে। কে তিনি? কী নাম? কোথায় বসতি? আদৌ আছেন কি না? এ সব প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাবে? পরিবার শুনবে না, কোথাও মেলা বসলে বা মহোৎসব হলে জেদ ধরবে, চল, গুরুকে দেখব। বিস্তর ঘোরাঘুরির পর সত্যি একদিন দর্শন মিলে গেল। পরিবার বলল, ইনিই সেই পরম সুন্দর পুরুষ। গৌরবদন বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করবার মতো চেহারা বটে। করুণার সাগর। যে আসে সেই তাঁর করুণার ধারা পেয়ে বেঁচে যায়।

ঘরগৃহস্থী ছাড়তে হবে না। বাড়িতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবা করতে হবে। শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মনে থাকতে হবে। নামকীর্তন নামজপ করতে হবে। সুখদুঃখ ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। নারী পুরুষকে পুরুষ নারীকে অবলম্বন করবে অন্ধের যষ্টির মতো।

এর পরে তার পরিবারের পাগলামি ক্রমে ক্রমে সেরে যায়। তারা দু'জনে সুখে না হোক সোয়াস্তিতে দিনপাত করে। সংসারে থেকেও সংসারী নয়, মন পড়ে থাকে গুরুর শ্রীচরণে, কোথাও মেলা কি মহোৎসব হচ্ছে শুনলেই সেখানে গিয়ে জোটে, গুরুভাইদের সঙ্গে তাদের পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলে মিশে কিছুদিন কাটায়। এইভাবে বহু অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে আলাপ ও আত্মীয়তা হয়। তারাও মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি আসে, দু'পাঁচদিন অতিথি হয়। নামকীর্তন করে বড় আনন্দে রাত কাটে।

এক দিন এক গুরুভাই এলো, বেশ কিছু দিন স্থায়ী হলো। কীর্তন গায় ভালো। লোকে সুখ্যাতি করে। যাবার কথা উঠলে পাঁচজনে বলে, আর কিছু দিন পরে মহোৎসব। এই ক'টা দিন থেকে যান। পরিবার কিছু বলে না। সে আশ্চর্যরকম নীরব। দেখে শুনে গৌরবদনের মনটা কী জানি কেন উদাস হয়ে যায়। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে। প্রাণপণে মন্ত্র জপ করে। পরিবারকে বলে না। দু'জনের মাঝখানে যেন এক অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। কেউ কাউকে মনের কথা বলতে পারে না। মনে চেপে রাখে।

একদিন দুঃস্বপ্নের পর ঘুম ভেঙে গেল। মন্ত্র জপ করতে করতে হঠাৎ

ঠাহর হলো বিছানায় সে নেই। গেছে কোথাও, ফিরে আসবে এখনি। কিন্তু ফিরে আসছে না তো। তবে কি—? গৌরবদন শিউরে উঠল। নিজের পাপ মনকে ধিক্কার দিল। মন তার ধিক্কার শুনে স্থির হলো না। তাকে চালিয়ে নিয়ে গেল বাইরে, চালিয়ে নিয়ে গেল গুরুভাই যে ঘরে শোয় সে ঘরে। সে ঘর খোলা। তবে কি—? গৌরবদনের সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলো। সে ভাবতে পারে না কী করবে, কী করা উচিত। তার মুখ দিয়ে রা বেরোয় না। তখন হঠাৎ মনে পড়ল তার পরিবার জেদ ধরেছিল তাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে। সে রাজি হয়নি। ইচ্ছা করলেই কি বৃন্দাবনে যেতে পারে! গোবিন্দ যতদিন না ডাকেন ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এটা তা হলে তাদের বৃন্দাবন যাত্রা। গৌরবদন যেন আঁধারের মাঝখানে আলোর আভাস পেল। যাক তারা বৃন্দাবন। নতুন করে কুঞ্জ বাঁধুক, লীলা করুক। কিসের দারাসুত, কিসের বিষয়সুখ! গোবিন্দ তাদের ডেকেছে, ডাক তো তাদের শুনতে হবে। তারা গেছে, বেশ করেছে। জিনিসপত্তরও নিয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। কেবল ফেলে গেছে একটা পুরোনো তোরঙ্গ, বিয়ের সময়কার সামগ্রী, বিষম ভারি। ওতে অলঙ্কারপত্র থাকে। ওটাকে দুই হাতে তুলে মাথায় করে ছুটল গৌরবদন। ছুটল ইস্টিশনের রাস্তায়। যা ভেবেছিল তাই। ক্রোশখানেক না যেতেই ওদের সঙ্গে দেখা। ওই অবস্থায় ওকে দেখে ওরা তো গেল ভড়কে। গৌরবদন বলল, "ভাই, ও বোঝা আমি আঠারো বছর বয়ে আসছি। তুমি যখন স্বেচ্ছায় নিয়েছ তখন এ বোঝাও নাও।" এই বলে গুরুভাইয়ের মাথায় তুলে দিল তোরঙ্গ। লোকটা হতভম্ব হয়ে টলতে থাকল।

২

এই কাহিনী আমার মনের উপর কেমন রেখাপাত করেছিল তার প্রমাণ এ সব আজো আমার মনে আছে চোদ্দ পনেরো বছর পরে। আমার চোখে গৌরবদন যশোর জেলার চাষী বা কুষ্টিয়ার বৈরাগীর চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু করুণরসাত্মক কাহিনীটির এক প্রান্তে একটু হাস্যরসের আমেজ ছিল। সেটা আমার খাসা লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "গৌরবদন, তুমি কি সত্যি এত বড় একটা তোরঙ্গ মাথায় করে ছুটলে?"

"হাঁ, প্রভু! তখন কি আমার বোধশক্তি ছিল!"

"তার পর ঐ গন্ধমাদন ওর মাথায় চাপিয়ে দিলে?"

"দিলুম চাপিয়ে। ও কি পারে বইতে! নামিয়ে ফেলল। শুনেছি বছর খানেক পরে অন্য বোঝাটিও নামিয়ে ফেলল বৃন্দাবনের পথে। তাতে আমার কী! তত দিনে আমি বিষয় সংসার ছেড়ে ভিখারী হয়েছি।"

আমার মনের ভিতরটা হায় হায় করছিল তাদের দু'জনের জন্যে। স্বামীকেও দোষ দিতে পারিনে, স্ত্রীকেও না। আঠারো বছর ঘর করার পর কেউ তুচ্ছ কারণে ঘর ছাড়ে না। ছিল কোনো গভীর কারণ যা গৌরবদনের অজ্ঞাত কিংবা আমার কাছে অপ্রকাশিত। দুঃখী মানুষ দেখলে আমি তার দুঃখটাই দেখি আগে, দোষগুণ বিচার করি তার পরে, কিংবা আদৌ করিনে।

সে রাত্রে আমার ওখানে ওর আহারের আয়োজন হলো। সদয় ব্যবহার পেয়ে গৌরবদন কেঁদে ফেলল। "প্রভু, আমি একটা নগণ্য লোক। আমাকে মেরে বিধাতার কী লাভ হলো! এ যে কলাগাছে বজ্রাঘাত।"

আমার চোখের কোণও শুকনো ছিল না। উচ্ছ্বাস দমন করে বললুম, "বিধাতার কাছে কেউ নগণ্য নয়, কেউ গণ্যমান্য নয়। তাঁর উপর যদি বিশ্বাস থাকে তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি তাঁর কাছেই পাবে। আমার তো বিশ্বাস নেই।"

নামাবলীর বিজ্ঞাপন সত্ত্বে আমি যে একজন সংশয়বাদী এ কথা আমি তাকে কেমন করে বোঝাই! সেও কেন তা বুঝবে! বলল, "আপনি পরম বৈষ্ণব। সেইজন্যে ভগবান আপনাকে সব দিয়েছেন। তাঁর উপর বিশ্বাস হারাবেন না, প্রভু।"

দিন কয়েক বাদে সে আবার এসে উপস্থিত। সে জানত যে সন্ধ্যার পর আমার দেখা পাওয়া তত কঠিন নয়। ভজনের সুর শুনলে আমি গলে যাই। আসত যখন গান দিয়ে জ্ঞাপন করত। এবার শোনা গেল,—

"নরতনু ভজনেরি মূল
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে হয়ে অনুকূল
নিজ দেহে আছে হরি শক্তি
কর রে তার ধারণা।"

আবার ওকে নিয়ে বসতে হলো। লিখে নিলুম ওর গান।

গৌরবদনের ফোটো তৈরি হয়ে এসেছিল। দেখে খুশি হলো। ও কিন্তু

ফোটোর জন্যে আসেনি। এসেছিল অন্য উপলক্ষে। সে কথা তো মুখ ফুটে বলবে না, গৌরচন্দ্রিকা করবে।

"প্রভু, বিষয়জ্বালা বিষের জ্বালা। কী হবে আমার বিষয়! যত দিন এ দেশে ভিক্ষা জুটবে তত দিন এ দেশে থাকব। তার পরে চলে যাব আর কোনো দেশে। কথায় বলে, বহতা নদী রমতা সাধু।"

আমি বললুম, "কেন, বিষয় কোথায় পেলে?"

"দিচ্ছে একজন। সেও আমার গুরুভাই। আমাকে বাঁধতে চায় একঠাঁই। আমি বলি নিজের বিষয় থাকতে আমি উদাসী। পরের বিষয় নিয়ে কি আবার হাল লাঙল ধরব! বলে, ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।"

আমি চুপ করে থাকলুম। সে আরেকটু খুলে বলল। "বিষয়জ্বালা বিষের জ্বালা। আরেক জ্বালা এই নারী।"

কোন নারী? আমি বিস্মিত হই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করি।

"প্রভু," সে এক তরফা বকে যায়, "নারী হচ্ছে অবলম্বন। যেমন অন্ধের নড়ি। অন্ধকে সে ঠিক পৌঁছে দেয় তার ঠিকানায়। নারীকে অবলম্বন করেই আমরা পৌঁছই রসস্বরূপে। তাকেই বলে রাধাশক্তি।"

"আর হরিশক্তি?"

"হরিশক্তি?" সে একটু চিন্তা করল। "অবলম্বন করতেও তো কিছু শক্তি লাগে। সেটুকু না থাকলে তো অবলম্বনও সরে যায়। গেল তো চলে বৃন্দাবনে। প্রভু, আমার যদি হরিশক্তি থাকত তা হলে কি আমি যেতে দিতুম তাকে?" বলতে বলতে তার গলা ভারি হয়ে এলো।

আমিও চিন্তা করছিলুম। নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ কী? তারা কি কেবল ঘরকন্না করবে, বংশরক্ষা করবে? মাঝে মাঝে করবে তীর্থযাত্রা? দীক্ষা নিলে দেবসেবা? তার বেশী আর কিছু করবে না, করবার নেই?

"নারী বিনা সাধন হয় না প্রভু।" গৌরবদন বলে চলল। "কিন্তু একে নিয়ে কোথায় যাই, কোথায় রাখি! আপনি খেতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। এর জন্যে কি আমি বিষয়জ্বালায় জ্বলব?"

সে কি তবে তার পরিবারকে ফিরে পেয়েছে এত দিনে? জানতে ইচ্ছা করে। সে উত্তর দেয়, "না, প্রভু। শুনেছি বৃন্দাবনেই বাস করছে। দুঃখের

জীবন! যার সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল, সে তাকে ত্যাগ করেছে। বলি, যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। নিজের কর্মফল তো ভোগ করতেই হবে। যাবার সময় গোপালকে শুদ্ধ নিয়ে গেছল। গোপালের নামে ছেলেরা কিছু কিছু পাঠায়। তাই দিয়ে কোনো রকমে চলে। ও আর আসবে না কালো মুখ দেখাতে। লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেও যেতে বলে সেখানে। কিন্তু আমার কি যাবার জো আছে? গোবিন্দ আমাকে ডাকলে তো?"

এবার আমাকেও লজ্জার মাথা খেয়ে জেরা করতে হলো। তখন সে বলল সে অন্য নারী গ্রহণ করেছে। গুরুর আদেশে। সে ঘরসংসার ছেড়ে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে খবর পেয়ে গুরু তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, অমন করে সাধন হয় না। তাকে আবার স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। সে কি সহজে রাজি হয়! ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়! গুরু তার মনের কথা আঁচ করে বললেন, "মানুষ নিজের দোষেই দুঃখ পায়। বিয়ে করেছে বলে ভাবে সারা জীবন ধরে রাখবে। তা কি সম্ভব! জগতে মৃত্যু আছে, তার হাত থেকে ধরে রাখতে পারবে? মৃত্যুর হাত থেকে যদি না পারে, তবে প্রেমের হাত থেকে কী করে পারবে। প্রেম কি মৃত্যুর চেয়ে কম শক্তিমান!"

গুরুই তাঁর এক দুঃখিনী শিষ্যার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করতে বললেন। মেয়েটি বড় ভালো। বিধবা। তার একমাত্র সন্তান মারা গেছে, আপন বলতে কেউ নেই। নিরাশ্রয়া, সম্পত্তি যা ছিল দেওরদের চক্রান্তে নীলাম হয়ে গেছে। গৌরবদন গুরুবাক্য লঙ্ঘন করল না। এ বোঝা মাথায় তুলে নিল। কিন্তু কোথায় তাকে রাখবে? নিজের কোনো আখড়া কিংবা আস্তানা নেই। আজ এখানে কাল ওখানে করতে করতে বেচারির কী যে অসুখ করল, অসুখ আর সারে না। আমি যদি অনুমতি করি সে তার প্রকৃতিকে এক দিন নিয়ে আসবে, আমার প্রকৃতির পায়ের ধুলো নিতে। চিকিৎসার যদি একটা ব্যবস্থা হয়।

দিন কয়েক পরে ওরা দু'জনেই এলো। পুরুষ আর প্রকৃতি। মেয়েটির লম্বা ছিপছিপে গড়ন। গৌরবদনের মতো বলিষ্ঠ নয়। যৌবন গেছে, রূপ যা ছিল দীর্ঘ রোগভোগের পর নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমাদের দু'জনকে অনুনয় করল কৃপা রাখতে। আমার গৃহিণী আশ্বাস দিলেন যে সরকারি ডাক্তারকে বলে দেখবেন কোনো উপায় আছে কি না। সরকারি হাসপাতালে

তখন স্ত্রীরোগের জন্তে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লেডী ডাক্তার না থাকায় এসব কেস নিতে আপত্তি ছিল। সরকারি ডাক্তার একটা দরকারি প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হাসপাতালে তো ওষুধ বেশী নেই। ওষুধ কিনে দেবে কে ?

গৌরবদন বোধ হয় আশা করেছিল লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। নিদেন পক্ষে তার প্রভু। কিন্তু গৌরীসেন তখন ছাঁটাই চালাচ্ছেন। আর তার প্রভুর সাধ্য অসীম নয়। এর পরে আর সে আসেনি। মাঝে মাঝে মনে পড়ত ওদের দু'জনের ঐ করুণ অনুনয়। মনে হতো কিছু একটা করা উচিত ছিল। করিনি বলে মন কেমন করত।

নরতনু ভজনেরি মূল, যদি রোগশোক না থাকে।

(১৯৪৯)

অপ্সরা

১

বিশ বছর আগে বিলেত থেকে ফিরছি। জাহাজের ক্যাবিনে আমার সঙ্গে দিয়েছে এক মরাঠা যুবককে। ভদ্র, বিদ্বান, কৌতুকপ্রিয়, সঙ্গী হিসাবে অনিন্দনীয়। দু'দিনেই মনে হলো কত কালের বন্ধু। তাঁর টেবিলের উপর একখানি ফোটো ছিল। ফোটোখানি কোনো এক তরুণীর। তিনি যে বিবাহিতা তা আমার জানা ছিল না। ভেবেছিলুম প্রেমে পড়েছেন। প্রশংসা করে বললুম, "মেয়েটি তো বেশ সুন্দর!"

যুবকটির মুখভাব মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। অবজ্ঞার ভঙ্গী করে তিনি বললেন, "মেয়েটি বেশ সুন্দর! না?" এই বলে টান মেরে ফোটোখানাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। "সুন্দর!" না?" বলতে বলতে সেখানাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন।

আমি তো অবাক। কী যে আমার অপরাধ, মেয়েটির অপরাধ যে কী, তখন তা বুঝতে পারিনি। পরে শুনতে পাই, তিনি বিবাহিতা। স্ত্রীর সম্বন্ধে কেউ কোনো মন্তব্য করলে তিনি ক্ষেপে যান। পরপুরুষের চোখে তাঁর স্ত্রী সুন্দরী, এ তাঁর অসহ্য। তিনি যে আমাকে আস্ত রাখলেন এইখানেই তাঁর শিষ্টতা।

জাহাজ যেদিন বম্বেতে ভিড়ল তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন তাঁকে নিতে। তিনি তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, আমার দিকে ফিরে তাকালেন না, বিদায় নেওয়া তো দূরের কথা। আমিও অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে মনে ভাবছিলুম নিরুদির স্বামী জীবনবাবুর কথা। আমার জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা।

সেবারেও বিপদ ঘটেছিল এই রকম একটি উক্তি থেকে। কবিত্ব করে বলেছিলুম, "নিরুদি, তুমি কি মানবী। না তুমি অপ্সরা!" পাশের ঘরে ছিলেন জীবনবাবু। মামলার নথি পড়ছিলেন। উঠে এসে নিরুদির গানের খাতাখানি তুলে নিয়ে চললেন রান্নাঘরে। সেখানে জ্বলছিল উনুন। খাতা-খানিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আগুনে। তারপর ফিরে এসে বললেন, "আমার স্ত্রী বাঈজী নয়, কুলবধূ।" নিরুদির মুখ এমনিতেই কালো। সে মুখ আরো

কালো দেখালো। তিনি কী যেন বলতে গেলেন, বলতে পারলেন না, ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললেন।

অথচ জীবনবাবু লোক মন্দ নন। আমাদের চাঁদার খাতায় প্রথম স্বাক্ষর করতেন তিনি, তাঁর চাঁদার অঙ্ক দেখে অন্যান্য পাড়াপড়শী। আমাদের খেলাধূলায়, পূজাপার্বণে, নাটক অভিনয়ে, এমন কি সাহিত্য সভায় তাঁর উৎসাহ আর সকলের উৎসাহকে ছাপিয়ে যেত। তা বলে এমন কিছু বড়লোক ছিলেন না তিনি। মাঝারি গোছের উকিল।

নিরুদির বয়স হয়েছিল। তিনি চারটি ছেলেমেয়ের মা। দেখতে সুন্দরী নন। দোহারা গড়ন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর চেয়ে মধুর। কাজ করতে করতে গুন গুন করতেন। সে কাজ বাসন মাজাই হোক আর কাপড় কাচাই হোক। গান তাঁর কণ্ঠে আপনি আসত। সময় অসময় নেই। গুরু লঘু জ্ঞান নেই। যেন তাঁর গলার ভিতর এক অচিন পাখি থাকত, পাখিটা যখন তখন গান গেয়ে উঠত।

পাখিটাকে সামলানো শক্ত, তাই তিনি বড় একটা বাড়ির বাইরে যেতেন না। বাড়িতেও স্বামী রাগ করতেন, শাশুড়ী বকতেন। সন্তানের জননী বলেই রক্ষা, নইলে এত দিনে সীতার বনবাস হয়ে যেত। মাঝে মাঝে কিলটা চড়টা হয়নি তা নয়। কিন্তু মোটের উপর স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা ছিল, শাশুড়ী বৌতেও। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গীতচর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। আমি তাঁকে নতুন নতুন গান সংগ্রহ করে দিতুম। তিনি লিখে নিতেন। তাঁর গানের খাতা ছিল তাঁর বড় সাধের সামগ্রী। ও খাতা বিয়ের আগেকার। তখন তিনি ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন। ওস্তাদ তাঁকে বলেছিলেন, "মা, গান হচ্ছে সারা জীবনের সাধনা। বিয়ের পরে যদি ছেড়ে দাও তবে সাধনার ফল পাবে না। যেমন করে পারো এ সাধনা বাঁচিয়ে রেখো।"

গানের খাতাখানির সঙ্গে সঙ্গে গানের সাধনাও সহমরণে গেল। নিরুদি আর আমাকে ডেকে পাঠালেন না। আমারও তো মান অপমান বোধ ছিল। আমিও আর ওমুখো হইনি।

কয়েক বছর পরে খবর পাই তিনি মৃত্যুশয্যায়। গেলুম দেখতে। গিয়ে দেখি অন্তিম দশা। যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু কোনো মতে বলতে পারলেন, "আমি অপ্সরা।" মুখে হাসির লহর। চোখে আলোর ঝলক। অপ্সরাই তো

বটে। আমারও তো মনে হলো, এ কোনো অপ্সরা। শাপমোচনের লগ্ন নিকট হয়ে এসেছে, ছদ্মবেশ খসে পড়বে এখনি। তাই যাবার বেলা জানিয়ে যাচ্ছে, আমি অপ্সরা।

আমার চোখ তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে, চোখের জল ধরে রাখতে পারছিনে। কী যে দেখছি, কাকে দেখছি তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এত রূপ আগে লক্ষ করিনি, এমন রঙ্ আগে নজরে পড়েনি, গড়নটি হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মতো। হবে হয়তো কোনো অপ্সরা, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল আমাদের জগতে, যত দিন গীতবাদ্যের সাধনা বাঁচিয়ে রেখেছিল তত দিন বেঁচেছিল, সাধনা বাঁচল না, এও আর বাঁচবে না।

ছেলেমেয়েরা নানা সুরে কাঁদল। জীবনবাবু স্বভাবত গম্ভীর। কিন্তু তিনি কান্নায় কারো চেয়ে কম গেলেন না। প্রতিবেশীরা কাঁদবার ভান করছিল, কাঁদতে মানা করছিল পরস্পরকে। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল কার জন্যে শোক! এ কি জীবনবাবুর স্ত্রী! মাণিকের মা! না অপরিচিতা কোনো কিশোরী! তাদের অনেকে পরস্ত্রীকে এই প্রথম দেখতে পেল। পরের অন্তঃপুরে প্রথম পদার্পণের উত্তেজনায় কেউ কেউ কাঁপছিল। এদিক ওদিক চেয়ে মৃতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলছিল, আহা! পুণ্যবতী। মহিলারা শাশুড়ীকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি মাথা খুঁড়ছিলেন।

২

শ্মশানে জীবনবাবু গেলেন না। উঠোনে একটা চেয়ারের উপর বসে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার ফলেই হোক বা কোনো অলৌকিক কারণেই হোক আকাশে তিনি তাঁর নিরুকেই ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখছিলেন। নিরু যেতে যেতে তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসছিলেন। তেমন হাসি নিরু কোনো দিন হাসেননি। মুক্তির উল্লাসকে সংযত করে কারাগারের দিকে চেয়ে মুক্ত বন্দিনী যেমন হাসি হাসে।

নিরুর মূর্তি আকাশে মিলিয়ে গেল। যেখানে মিলিয়ে গেল সেখানে রেখে গেল মৃদু মৃদু হাসি। অশরীরী হাসি। সে হাসি যেন জীবনবাবুকে বলছিল, "কেমন, অপ্সরা কিনা এখন চিনলে? না আরো প্রমাণ চাও?"

শ্মশান থেকে ফিরে ছেলেরা বলল, "জানো বাবা?" তাদের চোখে জল, কিন্তু মনে গর্ব। "জানো বাবা, মা'র শরীর থেকে কেমন সুগন্ধ ছুটছিল?"

"কিসের সুগন্ধ রে ?"

"ঠিক যেন ধূপের সুগন্ধ। সত্যি বাবা! তুমি জিজ্ঞাসা করো সবাইকে।"

জীবনবাবু বিস্মিত হলেন, কিন্তু এতে বিস্ময়ের কী আছে ? অপ্সরা যদি হয়ে থাকে! নিরুর অঙ্গসৌরভ তিনি নাসাযোগে স্মরণ করতে চাইলেন, স্মরণ হলো না। আগে ওকথা তাঁর খেয়াল হয়নি, হলে তিনি নিরুর অঙ্গসৌরভ তাঁর নাসায় ভরে রাখতেন। ষোলো বছর যে তাঁর সঙ্গে ঘর করল তার গায়ের গন্ধ কেমন সে বিষয়ে তিনি কৌতূহলই বোধ করেননি।

কেবল গন্ধ কেন, স্পর্শও তো তাঁর ত্বকের স্মরণ নেই। ষোল বছর ধরে রাতের পর রাত যার সঙ্গে শুলেন তার স্পর্শের স্বাদ কেমন আজ তো নিঃসন্দেহ হবার উপায় নেই। তা কি ননীর মতো নরম ? তা কি মণির মতো মসৃণ ? তা কি ফুলের মতো মোলায়েম ? তৃণের মতো তাজা ? ষোলো বছর একসঙ্গে কাটল, তবু স্পর্শের পরিচয় নেওয়া হলো না।

ছেলেরা আরো বলল, "শুনছ বাবা? গায়ের রঙ্ হলো চাঁপা ফুলের মতো। ঠিক যেন চাঁপা ফুল ফুটে রয়েছে।"

জীবনবাবু আরো বিস্মিত হলেন। নিরু তো রীতিমতো কালো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও নয়। তবে এত দিন তিনি তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ্‌টাও লক্ষ করেননি ! এরা বলছে যে চাঁপাফুলের মতো, এ কি মিথ্যে ! মিথ্যে নয় যদি অপ্সরা হয়ে থাকে। ষোলো বছর একসঙ্গে বাস করেও তিনি চাঁপাফুলের মতো রঙ্ চোখে দেখতে পেলেন না।

নিরুর ফোটো ছিল না। পরপুরুষের ক্যামেরার সমুখে ঘোমটা খোলা উচিত নয় বলে জীবনবাবু বার বার ফোটোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা সুধায়, "বাবা, মা'র ফোটো আছে ?" তিনি বলেন, "না, নেই।" ওরা ক্ষুণ্ণ হয়। তিনিও অনুশোচনা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিরুর ফোটো তোলাবেন ছোট ভাইকে দিয়ে, কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। নিরু যে এত শীগ্‌গির চলে যাবে কেই বা তা ভেবেছিল! মাত্র তিন দিনের জ্বরে ষোলো বছরের কুলবধূ এ কূল ছেড়ে ও কূলে গেল। কেউ ধরে রাখতে পারলে না।

জীবনবাবুর মা প্রতিবেশিনীদের সান্ত্বনা বাক্যের উত্তরে বলছিলেন, "বৌ ছিল রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।" মা কি তা হলে মিথ্যে বলছেন! মিথ্যে নয় যদি অপ্সরা হয়ে থাকে। জীবনবাবুর স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য নয়,

ফোটোগ্রাফও নেই, তাই তিনি নির্ভর করলেন তাঁর মায়ের জবানবন্দীর উপর। ভাবলেন তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল লক্ষ্মীর মতো। এতদিন যে লক্ষ করেননি এ তাঁর নিজের অন্যমনস্কতা। দেখবেন কখন! দিনরাত তো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে যখন শুতে যান তখন ঘুমে চোখ বুজে আসে। ভালো করে দেখাই হলো না এ জন্মে।

জীবনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর স্ত্রীকে তিনি যেমন চিনতেন আর কেউ তেমন নয়। ষোলো বছর ধরে চেনা। পরিচয়ের বাকী ছিল না কিছু। ষোলো বছর মানে একশো নিরনব্বুই মাস, ছয় হাজার দিন। একটা মানুষকে চিনতে ছয় হাজার দিন কি যথেষ্ট নয়! দিনের সঙ্গে যোগ করতে হয় রাত। একই বিছানায় ছয় হাজার রাত কাটানোর পর পরিচয়ের কিছু বাকী থাকে কি? গৃহিণী সচিব সখী শিষ্যা—না, কোনো পরিচয় গোপন নেই। তবে ললিতকলাবিধি তিনি নিজেই জানেন না, শেখাবেন কী করে! আর কারো কাছে শিখতে চাইলে তিনি রাগ করতেন। পরপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ তাঁর দু'চক্ষের বিষ। নিরু যে বই পড়ে আপনি শিখত তাও তিনি সইতে পারতেন না। লোকে নিন্দে করবে যে! ভদ্রলোকের পরিবার বাঈজীদের মতো গানবাজনা নিয়ে পড়ে থাকবে! শুনতে আসবে চ্যাংড়ার দল! পাড়াশুদ্ধ ছি ছি করবে!

জীবনবাবুর নিজের আচরণে বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না। ষোলোটা বছর যেন ষোলোটা মিনিট। এক অপরিচিতা নারী তাঁর সঙ্গে খেলাঘর বেঁধে পুতুল নিয়ে খেলা করে গেলেন, চলে গেলেন তাঁকে ও পুতুল ক'টিকে ফেলে। বিয়ের আগে যেমন অপরিচিতা মৃত্যুর পরেও তেমনি অপরিচিতা। মাঝখানের পরিচয়পর্ব দেখতে ষোলো বছরের মতো দেখায়, আসলে কি ষোলো বছর! জীবনবাবু দার্শনিক নন, তবু তাঁর মনে হলো কাল আপেক্ষিক।

নিরু যে চিরকালের মতো চলে গেছে, আর ফিরে আসবে না, যমের বাড়ি তার বাপের বাড়ি নয়, একথা ভাবতেই তাঁর বুক ঠেলে কান্না উঠছিল। কিন্তু লোকটা রাশভারি। তিনি তাঁর কর্তব্য করে গেলেন ঘড়ির কাঁটার মতো যথারীতি।

৩

সকলে আশা করেছিল জীবনবাবু আবার বিয়ে করবেন। তাঁর বয়স এমন কিছু বেশী নয়। চল্লিশ একচল্লিশ। বাড়িতে অরক্ষণীয়া কন্যা। তার বয়স বারো। তাকে যত দিন না পাত্রস্থ করা হয়েছে তত দিন তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আর একটি মা চাই। মা'র অভাব ঠাকুরমা দিয়ে মেটে না। জীবনবাবুর মা তাঁকে এসব কথা বোঝালেন। কিন্তু তিনি উল্টো পথে চললেন! রাতারাতি পাত্র ঠিক করে বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। ছোট মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন তার মাসীর বাড়ি থেকে পড়াশুনা করতে। কেবল ছেলে দুটিকে কাছে রাখলেন।

"আমার এখন একমাত্র ভাবনা," জীবনবাবু ব্যক্ত করলেন অন্তরঙ্গদের কাছে, "নিরুকে ফিরে পাবার কোনো উপায় আছে কি না। বিয়ে করলে আর একজনকে পেতে পারি, কিন্তু নিরুকে তো ফিরে পাব না।"

কথাটা সত্য। কিন্তু স্বাভাবিক নয়। বন্ধুরা তাঁর উপর কড়া নজর রাখলেন পাছে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তবে হঠাৎ তিনি সঙ্গীতানুরাগী হয়ে উঠলেন। বাড়িতে জলসার আয়োজন করলেন। জলসায় বসে তিনি চোখ বুজে ধ্যান করলেন নিরুকে। কল্পনা করলেন নিরু ফিরে এসেছে সঙ্গীতের আকর্ষণে। অনুভব করলেন নিরুর অদৃশ্য উপস্থিতি।

আমাকেও ডেকেছিলেন জলসায়। কাছে বসিয়ে বললেন, "তোমার বৌদিদিকে ধ্যান করো।" জলসার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু অনুভব করলে কি?" আমি ভেবে পেলুম না কী উত্তর দেব। তিনি আমাকে বিশ্বাস করে খুলে বললেন, "ওকে ধরব বলে গানের ফাঁদ পেতেছি।" তার পরে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "আমি এ রহস্য ভেদ করব। মানবী না অপ্সরা? যদি অপ্সরা হয়ে থাকে তবে ধরা না দিয়ে পারবে না।"

প্রতি সপ্তাহে জলসা বসে। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। বয়সের ব্যবধান বিশ বছর। কিন্তু দু'জনের একই ধ্যান। তিনি বলতেন তিনি অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করছেন। আমি বলতুম আমি করছিনে। তিনি তা শুনে দুঃখ পেতেন। যাতে তাঁর মনে আঘাত না লাগে সেইজন্যে আমি যুধিষ্ঠিরের মতো সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বলতুম, হাঁ, না, ঠিক বুঝতে পারছিনে, একটা কিছু অনুভব করছি। না, অনুমান করছি।

ক্রমে তাঁর সঙ্গীতানুরাগ শিথিল হয়ে এলো। জলসাও বিরল হয়ে এলো। তিনি ঝুঁকে পড়লেন স্পিরিচুয়ালিজমের দিকে। সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস ছিল না। যাঁদের বিশ্বাস ছিল তেমন কয়েকজন বিপত্নীক ও পুত্রহারা মিলে ঘরোয়া ধরনের একটা ক্লাব করলেন। ক্লাবের বৈঠকে আমার মতো সংশয়ীদের ডাক পড়ত না। আমার এক সহপাঠীর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সে ঐ বৈঠকে যোগ দিত। বৈঠকের বিবরণ তার মুখে শোনা। দু' একজন মহিলাও বৈঠকের সভ্য। তাঁদের একজনের সুখ্যাতি ছিল মিডিয়াম হিসাবে। টেবিল ছুঁয়ে থেকে তাঁরা স্মরণ করতেন নিরুকে। কিছুক্ষণ পরে টেবিল নড়ে উঠত। টেবিলের পায়াগুলো ঠক ঠক করে কাঁপত। নিরুদি এসে টেবিলের এক ধারে আসন নিতেন একখানা চেয়ারে। কেউ দেখতে পেত না, কিন্তু সকলে টের পেত। জীবনবাবু জেরা করতেন, নিরুদি জবাব দিতেন, আর মিডিয়াম লিখে নিতেন যন্ত্রচালিতের মতো অনায়াসে অবিলম্বে। সে সব লেখা জীবনবাবু যত্ন করে তুলে রাখতেন।

কয়েক মাস এই করে কাটল। ক্রমে তাঁর উৎসাহ কমে এলো। একজন অধ্যাপক তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন যে মিডিয়ামের লেখা মহিলাটির নিজের অবচেতন মন থেকে আসে। নিরুর অশরীরী মন থেকে নয়। আমরা যে স্বপ্নে কত কথা শুনি সেসব কার কাছে শুনি? নিজেদেরই অবচেতন মনের কাছে। মহিলাটিও প্রকারান্তরে স্বপ্নচালিত। তবে তাঁর অবচেতন মনের উপর জীবনবাবুর অবচেতন মনও ক্রিয়া করছে। সেই জন্যে ওসব কথা জীবনবাবুকে এত প্রীতি দিচ্ছে। জীবনবাবুর অবচেতন মনের উপর ক্রিয়া করছে নিরুর সঙ্গে ষোলো বছরের অভিজ্ঞতা। সেইজন্যে নিরুর ছায়া পড়ছে সমস্তটার উপর। অধ্যাপকের ব্যাখ্যা শুনে জীবনবাবু ঘাবড়ে গেলেন। না পারলেন স্বীকার করতে, না পারলেন উড়িয়ে দিতে। কিন্তু তাঁর উৎসাহ কমে গেল।

এর পরে তিনি অনেক গ্রন্থ পাঠ করলেন। দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম। কিন্তু তাতে শান্তি পেলেন না। যে মানুষটা ষোলো বছর কাল সত্য ছিল সেই মানুষ এক দিনেই মিথ্যা হয়ে গেল এ কি কখনো হতে পারে! আর যদি সে সত্যই থাকবে তবে তার উপস্থিতি অনুভব করা যাবে না কেন? সাধকেরা ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করেন। ভগবান নিরাকার। নিরুও নিরাকার। জীবনবাবু তা হলে নিরুর উপস্থিতি অনুভব করবেন না কেন?

কিন্তু কোনো গ্রন্থই তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছে না যে ইহকালেই মৃত পত্নীর পরশ পাওয়া যায়। আর এ তো কেবল পত্নী নয়, এ অপ্সরা। অপ্সরা মর্তে অবতীর্ণ হয় মহাভারতে তার বহু উদাহরণ আছে।

জীবনবাবু হাতের কাছে শান্তি না পেয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। তাঁর মা তাঁকে বিশেষ করে ধরে বসেছিলেন তীর্থে নিয়ে যেতে। মা'কে নিয়ে তিনি হরিদ্বার গেলেন। সেখান থেকে হৃষীকেশ লছমনঝোলা। লছমনঝোলা তাঁর এত ভালো লাগল যে ফিরতে ইচ্ছা করল না। দিনের পর দিন গঙ্গায় স্নান করে বনে-জঙ্গলে ঘুরে সাধু-সঙ্গ করে তিনি কী যে আনন্দ পেলেন তা বর্ণনার অতীত। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে শান্তি ফিরল। তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন যে নিরু আছে, কিন্তু তাকে পেতে হলে তার গতিপথ থেকে তাকে ভ্রষ্ট করা চলবে না, নিজের গতিপথে তাকে আকর্ষণ করা চলবে না। তাকে পেতে হলে তার গতিপথেই তাকে অনুসরণ করতে হবে। অথচ আপন গতিপথে অবিচলিত থাকতে হবে। ক্ষুরধার পন্থা। পদস্খলন হলেই নিরুকে হারাবেন চিরকালের জন্যে। নয়তো পাবেন চিরকালের মতো।

৪

এসব ঘটনা আমার বিলেত যাবার পূর্বের। বিলেত থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় ছিল, দেখা করে বলতুম জাহাজের কাহিনী, যা দিয়ে আরম্ভ করেছি এই গল্প। কিন্তু সুযোগ পাইনি।

বছর কয়েক পরে আমার মহকুমায় সফর করে বেড়াচ্ছি, অতিথি হয়েছি এক জমিদারের গেস্ট হাউসে। চুপচাপ বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় জীবনবাবুর আবির্ভাব। জানতুম না যে তিনি তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন যার সঙ্গে তার বাপের জমিদারি এই গ্রামে। বাপ মারা গেছেন, কাকারা জমিদারি চালাচ্ছেন। আমি তাঁদেরই অতিথি। কাকাদের সঙ্গে মনান্তর হয়েছে। তিনি এসেছেন মিটমাট করতে। নিরুদির মেয়ে চিনু আমার জন্যে নিজের হাতে রাঁধছে। কিন্তু কাকিমাদের ইচ্ছা নয় যে সে আমার সামনে বেরোয়। তাই আমার জন্যে বাবুর্চি ডাকা হয়েছে। আমি সাহেবলোক কিনা, সেইজন্যে সাহেবী বন্দোবস্ত।

আমি তখুনি বাবুর্চিকে তলব করে সমঝিয়ে দিলুম যে সাহেবী খানা আমি সাহেব লোকের অতিথি হলে খাই, বাঙালীর অতিথি হলে খাইনে,

আর জীবনবাবুকে বললুম, "হোয়াট ননসেন্স্! চিনু থাকতে আমি আর কারো হাতে খেতে পারি!"

তার পরে জীবনবাবুর জীবনকথা আলোচনা হলো। বড় ছেলে বাপের মতো হয়েছে, ওকালতী শুরু করেছে। ছোট ছেলে হয়েছে মামার মতো; অর্থাৎ আমার মতো। উচ্চাভিলাষ বিলেত যেতে, এদিকে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স। আর ছোট মেয়ে ঠিক মা'র মতো দেখতে। জীবনবাবু তার বিয়ে দেবেন না স্থির করেছেন। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় বিয়ে করে তাঁর আপত্তি নেই। বিয়ে করলে তার গানের ক্ষতি হবে। নিরুদির গানের ক্ষতি করে তিনি পশতাচ্ছেন। খুকুর ক্ষতি করলে বেঁচে সুখ থাকবে না। বলতে গেলে বেঁচে আছেন তিনি খুকুর জন্যেই। নিরুদি যা হতে পারতেন, কিন্তু হতে পারলেন না তাঁর দোষে, খুকু তাই হবে। তা হলেই তাঁর দোষের খণ্ডন হবে।

"নিরুকে তুমি কী বলেছিলে মনে আছে? মানবী না অপ্সরা?" জীবনবাবু আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। "তেমনি খুকুকে দেখলে আমার সন্দেহ হয়, মানবী না অপ্সরা।"

"ও যদি অপ্সরা হয়ে থাকে," জীবনবাবু বলে চললেন, "তবে ওর বিয়ে না করাই ভালো। দেখছ তো আমাদের সমাজের চেহারা। এখানে সবাই চায় ঘরণী। কেউ চায় না অপ্সরা। দেখছ তো দেশের তরুণদের। এদের মানসী যদিও ফিল্ম স্টার তবু বিনা পণে বিয়ে করতে রাজি নয়। বিয়ে করবে সেই লক্ষ্মীর বাহনকে, বিয়ের পর তাকে দিয়ে সংসারের ভার বহন করাবে।"

এর পরে তিনি তাঁর বড় মেয়ের দুঃখের কাহিনী শোনালেন। হাজারে ন'শো নিরানব্বই জন বিবাহিতার কাহিনী। তবু তো এর অবস্থা ভালো। তা হলেও বলা যায় না ষষ্ঠীর কৃপা শেষ পর্যন্ত কত দূর গড়াবে। হাঁপানী না অম্বল না যক্ষ্মা। কৃপাময়ী যদি আর একটু কম কৃপা করতেন!

আমি বললুম, "জীবনদা, ছেলেমেয়ের কথা তো যথেষ্ট হলো। এবার নিজের কথা হোক, যদি আপত্তি না থাকে।"

জীবনবাবু যেন এই প্রশ্নটির অপেক্ষায় ছিলেন। বললেন, "আমার নিজের কথা তো তুমি জানো। একদা একজনকে ধরে এনেছিলুম আমার ঘরে, ধরে নিয়েছিলুম যে সে আমার বিয়ে করা বৌ, আমার ছেলেমেয়ের মা, আমার সঙ্গে সব রকমে বাঁধা। ভেবে দেখিনি যে এর কাটান আছে। পাখি যখন

উড়ে গেল তখনো আমার জ্ঞান হলো না, গানের ফাঁদ পেতে বসলুম তাকে ধরতে। তা সে ধরা দেবে কোন দুঃখে!"

বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এলো। "আমার ওই পুতুল খেলার সংসার। হাস্যকর ব্যাপার। ওখানে ধরা দিতে চাইবে কোন অপ্সরা! তাও যদি খেলা করতে জানতুম। সারাক্ষণ বেত উঁচিয়ে বসে আছি গুরুমশায়ের মতো। কথায় কথায় হুকুম। কথায় কথায় জুলুম। পাছে কেউ বলে আমি স্ত্রৈণ সেইজন্যে একটু বেশী করে প্রভুত্ব ফলাই। ওর আত্মবিকাশের পথ বন্ধ করে দিই। আমার মতো অত্যাচারী—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "না, না, আপনি অকারণে আত্মনিন্দা করছেন। নিরুদিকে আপনি যথার্থ ভালোবাসতেন। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে আপনি কোনো কাজ করতেন না। আপিসঘর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠে যেতেন স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসতে। লোকে যে আপনাকে স্ত্রৈণ বলত সেটা নেহাৎ অমূলক নয়। জীবনদা, যদি কিছু মনে না করেন তো আপনার দোষ, আমার মতে—"

তিনি উৎকর্ণ হয়ে আমাকে অনুমতি দিলেন, "বলে যাও।"

"পরপুরুষভীতি। নিরুদির মৃত্যুর পরেও আপনার সে ভীতি গেল না, শুনেছি প্রেততত্ত্বের বৈঠকে নিরুদির আত্মাকে আপনি জেরা করতেন পরলোকের পরপুরুষদের সম্বন্ধে। জীবনে মরণে আপনিই একমাত্র পুরুষ যার সঙ্গে তাঁর ইহকাল পরকাল বাঁধা। বিশ্বের কোথাও আর কোনো পুরুষ নেই যার সঙ্গে তাঁর নৃত্যের স্বাধীনতা, কেলির স্বাধীনতা। জীবনদা, আর কেন! ষোলো বছর কি যথেষ্ট নয়! মনে করুন তাঁর সঙ্গে আপনার তালাক হয়ে গেছে।"

জীবনবাবু লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর মুখভাব আতঙ্কে বিবর্ণ ও বিকৃত। কাঁপতে কাঁপতে কী সব বলে গেলেন বোঝা গেল না। আমিও অপ্রতিভ হলুম তাঁর মনে আঘাত দিয়েছি দেখে। বার বার মাফ চাইলুম।

তিনি আর বসলেন না। যাবার সময় বললেন, "আমি যে বেঁচে আছি সে শুধু ওর দিকে মুখ রেখে। তুমি কি আমাকে মরতে বলো!"

(১৯৫৯)

যৌবনজ্বালা

১

ডিনার শেষ হলে মহিলারা উঠে গেলেন বসবার ঘরে। আমার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন দেখে অন্যমনস্কভাবে আমিও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি, এমন সময় পিছন থেকে আমার কোট ধরে টানলেন গৃহকর্তা ব্যারিস্টার মৌলিক। কানে কানে বললেন, "কথা আছে।"

আমি থমকে দাঁড়ালুম। "কী কথা!"

তিনি মুখ টিপে মুচকি হাসলেন। কথাটা আর কিছু নয়, এটিকেটের ভুল। বলতে হলো না যে মহিলারা কিছুক্ষণ নিরালায় থাকবেন, সে সময় পুরুষদের যাওয়া বারণ। তাঁর হাসি থেকে অনুমান করলুম কী কথা। চোরের মতো চুপি চুপি ফিরে এলুম খানা কামরায়। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

ইতিমধ্যে জনা চারেক অভ্যাগত মিলে জটলা শুরু করে দিয়েছিলেন। হাতে পানপাত্র, মুখে চুরুট। আমার তো ওসব চলে না, আমি এক পেয়ালা কফি হাতে ওঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেলুম। ভিড় দেখলেই ভিড় বাড়ে। যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে ঘিরে বসল চার ইয়ারকে। কেউ কেউ টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

প্রোফেসর মণিমোহন দে বলছিলেন এঞ্জিনীয়ার প্রদোষকুমার সেনকে, "তুমি আসাম থেকে আসছ। তুমিই বলতে পারবে আসলে কী হয়েছিল। আমরা তো নানা মুনির নানা বয়ান শুনছি। কেউ বলে শিকার করতে গিয়ে দৈব দুর্ঘটনা। কেউ বলে স্রেফ আত্মহত্যা।"

প্রদোষ মাথা নাড়লেন। "না, য়্যাকসিডেণ্ট নয়।"

সকলে বুঝতে পারল বিকল্পে কী। তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল বীরেশ্বর ঘোষাল, ব্যারিস্টার। "তা হলে কী?"

"সুইসাইড।"

"সুইসাইড!" ঘোষাল উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করিনে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির এসে হলফ করে বললেও আমি বিশ্বাস করব না যে বিশ্বজিৎদা আত্মহত্যা করেছে। বিলেতে থাকতে আমাকে রক্ষা করেছিল কে? কাকে আমি বিবেকের মতো ভয় করতুম? জিতেন্দ্রিয়, চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ—"

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যাঁর কথা হচ্ছিল তিনি আমার কলেজের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ সিংহরায়। বাংলার রাজপুত। ছ'ফুট লম্বা, সুশ্রী চেহারা, মুখচোরা প্রকৃতি। খুব কম ছেলের সঙ্গেই মেশেন, যাদের সঙ্গে মেশেন তারা বলে মনটা শাদা, যাদের সঙ্গে মেশেন না তারা বলে মাথা গরম। আমি ছিলুম বয়সে অনেক ছোট, দূর থেকে দেখতুম আর শ্রদ্ধা করতুম।

"কিন্তু কথাটা কি সত্য?" আমি চেঁচিয়ে বললুম ঘোষালকে বাধা দিয়ে।

"চুপ। চুপ।" গৃহকর্তা আমার পিঠে টোকা মেরে সাবধান করে দিলেন যে ও ঘরে মহিলারা রয়েছেন।

ঘোষাল তখনো গজগজ করছিল। "কিন্তু কেন? কোন দুঃখে আত্মহত্যা করবেন বিশ্বজিৎদার মতো লোক। একটা নষ্ট মেয়েমানুষের জন্যে?"

প্রদোষ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, "নষ্ট মেয়েমানুষ কাকে বলছ?"

"তুমি জানো কাকে বলছি। শী ইজ এ বিচ্।"

"চুপ চুপ।" বলে মৌলিক তার মুখ চেপে ধরলেন।

প্রদোষ বললেন, "যে বিচ্ নয় তাকে বিচ্ বলে ভুল করেছিল বিশ্বজিৎ। সেই জন্যে এ ট্রাজেডী। কিন্তু আগে দরজাগুলো ভেজিয়ে দেওয়া হোক। এসব কথা মেয়েদেব জন্যে নয়।" এই বলে প্রদোষ আরেকটা সিগার ধরালেন।

আমরা যে যার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে এলুম। কে জানে, মেয়েরা যদি শুনতে পায় তা হলেই হয়েছে। গৃহকর্তা সবাইকে দিয়ে গেলেন যার যা অভিরুচি। আমি নিলুম আর এক পেয়ালা কফি। প্রদোষ বলতে আরম্ভ করলেন।

২

ঘোষালকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ছিল বিশ্বজিৎ, কিন্তু বিশ্বজিৎকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ছিল না তেমন কেউ। বিশ্বজিৎ হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যারা রামধনুর সাতটা রং দেখতে পায় না, যাদের চোখে দুটিমাত্র রং। শাদা আর কালো। মেয়েদের সে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিল। ভালো আর মন্দ।

জানো তো মেয়েরা কত বিচিত্র প্রকৃতির। কেনো দু'জন মেয়ের প্রকৃতি এক নয়। এমন কি কোনো একজন মেয়ের প্রকৃতি সব সময় এক রকম নয়। সকালে বিকেলে শাড়ির রং বদলায় কেন জানো? মনের রং বদলায়। এই

আশ্চর্য প্রাণীকে নিয়ে প্রাণে বাঁচতে হলে সাত সাতটা রংয়ের জন্যে চোখ থাকা চাই। যারা রং কানা তাদের উচিত নয় বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। বিশ্বজিতের বাবা তার বিয়ে না দিয়ে তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন এই ভরসায় যে বিশ্বজিতের নীতিবোধ নির্ভরযোগ্য। তিনি জানতেন না যে ওই ধরনের পুরুষরাই মরে সকলের আগে। মেয়েদের ওরা চিনতে পারে না। ভুল করে। ভুলের মাশুল মৃত্যু।

বিশ্বজিতের ধারণা ছিল সেই মেয়েরাই ভালো যারা পুরুষদের সঙ্গে মেশে না। যারা পুরুষদের সঙ্গে মেশে তারা খারাপ। যারা যত বেশী মেশে তারা তত বেশী খারাপ। ওদের বাড়িতে ওরা কড়া পর্দা মানত। বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে ওরা ছিল পুরোদস্তুর রক্ষণশীল। অথচ বাঈজীর নাচ না হলে ওদের বাড়ির কোনো উৎসব পূর্ণাঙ্গ হতো না। শাদা আর কালো, ভালো আর মন্দ, এর বাইরে যে আর কোনো রং বা রীতি থাকতে পারে বিশ্বজিতের সে শিক্ষা হয়নি দেশে থাকতে। বিদেশে গিয়ে হতে পারত কিন্তু ঐ যে বললুম তেমন কেউ ছিল না যে শেখাবে।

বিশ্বজিৎ পাপের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা ঠিক। তিন বছর বিলেতে কাটিয়েও সে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করেনি, নাচেনি, অন্যান্য পুরুষের অসাক্ষাতে কথা বলেনি। মেয়েরা পর্দা মানে না বলে ও নিজে একপ্রকার পর্দা মানত। মেয়েদের সামনে বড় একটা বেরোত না, ট্রামে বাসে টিউব ট্রেনে গা ঘেঁষে বসত না. দাঁড়াত না। ওর জন কয়েক ভক্ত ছিল। যেমন ঘোষাল। তাদের কারো সঙ্গে তরুণী বান্ধবী দেখলে ও তাকে বয়কট করত। শেষ পর্যন্ত ওর ঐ একমাত্র ভক্তই অবশিষ্ট ছিল। এবং সেটিও একটি ভণ্ড। মাফ কোরো, ঘোষাল। নয়তো হাটে হাঁড়ি ভাঙব।

দেশে ফিরে বিশ্বজিৎ বিয়ে করলে পারত, কিন্তু ওর এক ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। যত দিন না নিজের পয়সায় মোটর কিনেছে তত দিন ও নিজেকে ওর শ্বশুর কুলের সমকক্ষ মনে করবে না। সমকক্ষ না হয়ে পাণিগ্রহণ করবে না। ও ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দিয়ে আসামে চাকরি নিল। চাকরির গোড়ার দিকে যে মাইনে দেয় তাতে মোটর কেনার প্রশ্ন ওঠে না। বিয়ের প্রস্তাব এলে মোটরের অভাব বলে ও সে প্রস্তাব বানচাল করে দেয়। অবশ্য যারা মেয়ে দিতে চায় তারা মোটর দিতেও রাজি। কিন্তু তা হলে সমকক্ষতার গৌরব থাকে না।

শিকারের শখ ওর ছেলেবেলা থেকে ছিল। ফরেস্ট অফিসার হয়ে ওটা হয়ে উঠল ওর একমাত্র শখ। বনজঙ্গল পরিদর্শন করতে গিয়ে ও শিকার করে বেড়াত মাসের মধ্যে পনেরো বিশ দিন। যত রকম বুনো জানোয়ার ওর খপ্পরে পড়ত তাদের সহজে নিস্তার ছিল না। নিজেও বিপদে পড়ত কোনো কোনো বার। ওকে দেখলে মনে হতো না যে ও ঠিক সামাজিক মানুষ। অথচ লোক অতি অমায়িক। শত্রু বলতে কেউ ছিল না ওর। কাউকে মাংস, কাউকে চামড়া, কাউকে শিং উপহার দিয়ে ও সবাইকে খুশি রেখেছিল।

এমন সময় ওখানে শিকারের খোঁজে এলেন হায়দরাবাদের এক সামন্ত রাজা ও তাঁর রানি। এঁরা কিছুদিন থেকে শিলংএ বাস করছিলেন। ইউরোপে এঁরা পড়াশুনা করেছেন, ইউরোপের প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁদের ভালো লাগে, সেদিক থেকে শিলং ভারতে অদ্বিতীয়। শিকার উপলক্ষে এঁরা মাঝে মাঝে বনে জঙ্গলে ঘোরেন, ফরেস্ট বাংলোয় ওঠেন। ফরেস্ট অফিসারদের সাহায্য নেন। অফিসাররাও এঁদের সঙ্গ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন। হায়দরাবাদের সামন্ত রাজাদের ধনের প্রসিদ্ধি আছে। অফিসারদের কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে এঁরা গলা থেকে মণিমুক্তার হার খুলে দেন। যারা নেয় না তারাও মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বজিৎ নিল না, মুগ্ধ হলো। রাজা রানি দু'জনে তাকে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানালেন, সে যেন শিলংএ তাঁদের অতিথি হয়। বিশ্বজিৎ বারকয়েক "না, না, তা কি হয়" ইত্যাদি বলার পর কেমন করে একবার "আচ্ছা" বলে ফেলল। লোকটা সত্যনিষ্ঠ। "আচ্ছা" যখন বলেছে তখন শিলং তাকে যেতেই হবে, ছুটি তাকে নিতেই হবে, রাজা রাজড়ার অতিথি তাকে হতেই হবে, যদিও সে তাঁদের সমকক্ষ নয়। ওঁরা তাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, গবর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গেলেন কল করতে। ওঁরা ওর পরিচয় দিলেন এই বলে যে বাঘভালুকের এত বড় শত্রু আসাম প্রদেশে আর নেই। এর ফলে লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাকে ধরে বসলেন তাঁর জন্যে যেন শিকারের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বজিৎ যখন শিলং থেকে ফিরল তখন তার অন্তরে ঝড়ের মাতন। এক এক সময় তার মনে হচ্ছে কাজটা সে ভালো করল না। রাজ অতিথি হবার মতো যোগ্যতা তার কই! তার পরে মনে হচ্ছে, যাই বলো এমন সৌভাগ্য

আর কোনো ফরেস্ট অফিসারের হয়নি। লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে গোটা দুই বাঘ মারিয়ে দিতে পারলে স্বয়ং লাট সাহেব এসে হাজির হবেন। তার পরে প্রমোশন কে ঠেকায়!

প্রাইভেট সেক্রেটারী নিজে আসতে পারলেন না, এলেন তাঁর মেম-সাহেব। আর কে এলেন শুনবে? রানি সাহেব। এবার রাজা সাহেব অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দুই ভদ্র মহিলার পার্শ্বচর হলো বিশ্বজিৎ। তার মাথাটা একটু ঘুরে গেল। যদিও সে তাঁদের সমকক্ষ নয় তবু সেই একমাত্র অফিসার যাঁকে তাঁরা এই সম্মানের উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। বিদায়কালে দু'জনেই তার আকাশস্পর্শী প্রশংসা করলেন। রানি তো সোজাসুজি বলে বসলেন, "আর কারো সঙ্গে শিকার করে আমি এমন আনন্দ পাইনি। যত দিন আসামে আছি ততদিন আর কারো সঙ্গে শিকার করব বলে মনে হয় না।"

এসব হলো সামাজিকতার অঙ্গ। কিন্তু বিশ্বজিৎ লোকটা অসামাজিক তথা সত্যনিষ্ঠ। তাই অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করল। ও বোধ হয় আশা করেছিল এর পর লাট সাহেব আসবেন অরণ্যবিহারে। সে রকম কোনো খবর কিন্তু এলো না। কিছু দিন আনমনা থেকে সে একাই বেরিয়ে পড়ল সফরে। এক মাস তাঁবু ঘাড়ে করে নানা দুর্গম স্থলে ঘুরল। তার পরে সদরে ফিরে অবাক হয়ে গেল যখন দেখল রানি তার জন্যে সারকিট হাউসে অপেক্ষা করছেন। এবারেও রাজা সময় পাননি। কোনো মহিলাও নেই তাঁর সঙ্গে, অবশ্য পরিচারিকা বাদে।

এ এক পরীক্ষা। বিশ্বজিৎ প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজে পেল না। মাইনের টাকা তুলে, বিল মিটিয়ে, জমে ওঠা ফাইল পরিষ্কার করে দু'এক দিনের মধ্যেই আবার রওনা হলো রানির সঙ্গী হয়ে। খুব যে তার ভালো লাগছিল তা নয়। একে ক্লান্ত, তার উপর সন্দিগ্ধ। যে মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে শিকারে যায় সে কি শুদ্ধ? সে কি নিষ্পাপ? এ কী ভীষণ পরীক্ষা তার জীবনে। এর পরে কে সহজে বিশ্বাস করবে যে সে নিজে অপাপবিদ্ধ! রানিকে "না" বলার মতো মনের জোর তার ছিল না। বলতে পারল না যে পরস্ত্রীর সঙ্গে শিকার করতে যাওয়া তার বিবেকবিরুদ্ধ। কিংবা তার শরীর ভালো নেই, কোমরে ব্যথা, ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে। অথচ সমস্ত ক্ষণ অশুচি বোধ করল, অপরাধী বোধ করল।

রানি বিলেতে পড়াশুনা করেছেন, পুরুষমানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত। বিশ্বজিৎ বিলেতে ছিল শুনে তিনি ওকে নিজের সেটের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অন্তরঙ্গতার ছলে কখনো বলেন "ডিয়ার," কদাচিৎ "ডার্লিং।" এসব মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু বিশ্বজিতের তো অভিজ্ঞতা নেই। সে ভাবল এসব মনের কথা। রানি কি তা হলে তার প্রেমে পড়েছেন? এ কি কখনো সম্ভব? তার মতো সামান্য লোকের সঙ্গে প্রেম! ভাবনায় পড়ল বিশ্বজিৎ। ওদিকে আবার প্রেম কথাটার উপরে তার বিরাগ ছিল। জিনিসটা ভালো নয়। যার সঙ্গে যার বিয়ে হয়নি তার সঙ্গে প্রেম তো রীতিমতো পাপ। বিশ্বজিৎকে এই পাপের হাত থেকে রক্ষা করবে কে?

একবার শিকার থেকে সে যখন ফিরল তখন তার অন্তরে সাগর মন্থনের মতো একটা ব্যাপার চলছিল। সেও প্রেমে পড়ল নাকি! পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম! এর চেয়ে মরণ শ্রেয়। রানি চলে গেলেন বহু সংখ্যক জন্তুজানোয়ার মেরে। জানতে পেলেন না যে আরো একটি প্রাণীকেও মেরে রেখে গেলেন। এ রকম আলোড়ন সে আর কখনো অনুভব করেনি। তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে মেয়েটা খারাপ। কিন্তু সে নিজে কোন ভালো! কী করে সে তার ভাবী বধূকে বোঝাবে যে তার হৃদয়ে লেশমাত্র অনুরাগ জন্মায়নি! নিজের উপর তার যে অবিচল বিশ্বাস ছিল তা যেন একটু নড়ল। সে কি সত্যি সচ্চরিত্র, না সেও ডুবে ডুবে জল খায়? তার কি উচিত ছিল না রানির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করা? কিন্তু সে তা পারল কই? রানি যখন জানতে চাইলেন, "আবার কবে শিলং আসছেন বলুন," সে উত্তর দিল, "আপনাদের অসুবিধা হবে।" রানি সকৌতুকে বললেন, "আমরা কি বাঘভালুক যে আপনার জ্বালায় আসাম ছেড়ে পালাব? ওয়েল, ডিয়ার। ডু কাম জাস্ট ফর এ ডে!"

অগত্যা এক দিনের জন্যে বিশ্বজিতের শিলং যাত্রা। এক দিনের জায়গায় তিন দিন হলো, তবু কেউ তাকে ছেড়ে দেয় না। রাজা ডাকেন টেনিস খেলতে, রানি নিয়ে যান সমাজে পরিচয় করাতে। যে ছেলে কোনো দিন মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি সে রানির সঙ্গে পাশাপাশি আসনে বসে রানির মোটর চালনা দেখে ও মাঝে মাঝে স্টীয়ারিং ধরে। যে মানুষ কোনো দিন বড় কর্তাদের খোসামোদ করেনি সে একদিন দুপুরে সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ছুটির

জরবার করে আসে। দিন পনেরো ছুটি না হলে নয়। সে মোটর চালাতে শিখছে। কথাটা সত্যি। যেমন সত্যি অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। অথচ এটা মিথ্যা। এমন মিথ্যা যে বলতে গেলে সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে। বুক ঢিপ ঢিপ করে। চোখ আপনি নত হয়। ভয় হয়, ধরা পড়ে গেছে।

ওদিক তার বিবেক তাকে এক মুহূর্ত ছুটি দেয় না। পনেরো দিনের ছুটি তো দূরের কথা। যে মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে মোটর বিহার করে সে কি ভালো মেয়ে? কিন্তু যে ছেলে পরস্ত্রীর সঙ্গে মোটরে করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সেই বা কেমন ছেলে? একদিন তো সে বিয়ে করবে। সেদিন কি তার স্ত্রী তাকে বিশ্বাস করবেন? ভবিষ্যতের জন্যে কী গভীর অশান্তির খাদ কেটে রাখছে সে! সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই খাদে পড়ে চুরমার হবে, যদি সময় মতো ব্রেক না কষে। পনেরো দিন ছুটি নিলেও প্রত্যেক দিন সে উপায় খোঁজে পালাবার। কিন্তু পারে না পালাতে। বাইরে থেকে বাধা নেই, পাহারা নেই। কেউ তাকে ধরে রাখবে না। একবার মুখ ফুটে বললেই হলো, "আমার কাজ পড়ে আছে। আমাকে যেতে হবে, রানি।" কিন্তু ওটুকু বলার মতো ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছিল। কিছুতেই সে মুখে আনতে পারে না ও কথা। বাজে বকে। ভাবে মোটর চালানো তো শিখছে। এও কি কি একটা কাজ নয়!

আসল কারণটা তার অবচেতন মনে নিহিত ছিল। সেখানে তার ইচ্ছা-শক্তিকে অবশ করে রেখেছিল মন্ত্রশক্তি। খারাপ মেয়ে, এই দুটি শব্দের যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছিল। উচ্চারণ করলেই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া শুরু হতো। মনে মনে উচ্চারণ করলেও নিস্তার নেই। খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে জপ করতে করতে বিশ্বজিৎ তার নিজের অজ্ঞাতসারে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো পরবশ হয়েছিল। এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী তার ঐ রংকানা চোখ। যে চোখ রামধনুর সাতটা রং দেখে না। রং বলতে বোঝে শাদা আর কালো। শাদা দেখতে না পেলে কালো দেখে।

সে সময় বিশ্বজিতের যদি কোনো সুহৃৎ থাকত তা হলে তাকে তার নিজের ভুলের হাত থেকে বাঁচাত। নিজের ভুলের হাত থেকে বাঁচলে পরে সে নিজের গুলির হাত থেকেও বাঁচত। কিন্তু তেমন কোনো সুহৃৎ ছিল না তার। আমি হলে বলতুম, যাকে তুমি খারাপ মেয়ে ভাবছ সে খারাপ নয়। ওটা তোমার আত্মপ্রতারণা। খারাপ মেয়ে ভেবে তুমি ওর কাছে যা আশা

করছ, কামনা করছ, কোনো দিন তা পূর্ণ হবে না। বিশ্বজিৎ অবশ্য রাগ করত, অস্বীকার করত যে তার কোনো কামনা আছে। কিন্তু অস্বীকার করলে হবে কী! পুরুষমাত্রেরই অবচেতন মনের গুহায় যে সব অন্ধ কামনা নিহিত রয়েছে খারাপ মেয়ের গন্ধ পেলেই তারা চরিতার্থতার জন্যে ফাঁদ পাতে। সে যদি খারাপ মেয়ে না হয়ে থাকে তবে নিজের ফাঁদে নিজেকেই পড়তে হয়। তখন মরণ অনিবার্য, যদি না কেউ সময়মতো উদ্ধার করে।

শিলং থেকে ফিরে বিশ্বজিৎ সফরে বেরিয়ে পড়বে এমন সময় টেলিগ্রাম এলো রানি আবার আসছেন। আতঙ্ক ও উল্লাস দুই পরস্পর-বিরোধী ভাব তার বুক জুড়ে তাণ্ডব বাধিয়ে দিল। একবার সে পালাবার কথা ভাবে, পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে। একবার ভাবে, পালিয়ে যাওয়া তো কাপুরুষের কাজ, পুরুষের কাজ বিপদের সম্মুখীন হওয়া। এক বার মনে করে মিথ্যা বলাই এ ক্ষেত্রে সত্য বলা। পাল্টা টেলিগ্রাম করা উচিত, আমি অসুস্থ। একবার মনে করে, সাহস থাকে তো সত্য বলাই উচিত। তুমি খারাপ মেয়ে, আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাব না। আমার বৌ রাগ করবে, যখন বিয়ের পর শুনবে।

পাল্টা টেলিগ্রাম করা হলো না। পালিয়ে যাওয়া হলো না। স্টেশনে গিয়ে রানিকে অভ্যর্থনা করল অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে বিশ্বজিৎ। এবারে সে স্থির করেছিল শিকারে যাবার সময় আরো দু'একজন অফিসারকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাঁরাও রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রাকালে দেখা গেল কারো ছেলের অসুখ, কারো মেয়ের অসুখ, কারো স্ত্রীর অসুখ। অর্থাৎ কর্ত্রীর হুকুম নেই। কোনো মহিলা তাঁর স্বামীকে বিশ্বাস করে পরস্ত্রীর সঙ্গে শিকারে ছেড়ে দেবেন না। অগত্যা বিশ্বজিতের আর দোসর পাওয়া গেল না। হাতীর পিঠে বসতে হলো রানির সঙ্গে তাকেই। পাশাপাশি বসে অঙ্গের সুরভি পায়। কেবল সুরভি নয়, পরশ। অমন অবস্থায় পড়লে মুনি ঋষিদেরও মন টলে। বিশ্বামিত্র মুনি হলেও বিশ্বজিৎ মুনির চেয়ে জিতেন্দ্রিয় হতেন না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। বিশ্বজিৎ মুনি বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করলেন। হাতীর পিঠে চড়েছ কখনো? চড়াই উৎরাই করেছ? তখন পাশের লোকটিকে পাশ বালিশ বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কখনো পড়ে যাবার ভয়ে, কখনো আচমকা ধাক্কা খেয়ে, কখনো হাতীর অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে পাল্লা রেখে হেলে

ভুলে কতবার যে মানুষ মানুষের গায়ে টলে পড়ে তার হিসাব নেই। এর জন্যে অবশ্য কেউ লজ্জিত হয় না। মাফ চায় না। এটা স্বাভাবিক।

৩

হাল কামরা ও খানা কামরার মাঝখানের দরজাগুলো ভেজানো ছিল বলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প শুনছিলুম। হঠাৎ মণিমোহন বলে উঠলেন, "সর্বনাশ! কোণার দরজাটা ফাঁক দেখছি যে!"

ঘোষাল পা টিপে টিপে গেল দরজার কাছে। ছুটে এসে বলল, "মেয়েদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ।"

ষড়যন্ত্র করবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়লে যেমন চেহারা হয় আমাদের সকলের চেহারা হলো সেই রকম। মুখে কথা নেই, চোখে পলক নেই, হাতের গ্লাস হাতে, কেবল চুরুটের ধোঁয়া উঠছে চিমনির ধোঁয়ার মতো অন্তরীক্ষ জুড়ে। তা হলে অন্তরাল থেকে ওঁরা সমস্ত শুনেছেন।

ভিজে বেড়াল সেজে আমরা একে একে হাল কামরায় চললুম। আরো আগে যাওয়া উচিত ছিল, দেরি হয়ে গেছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। গল্পটার খেই হারিয়ে গেল বলে মনে মনে মুণ্ডপাত করলুম। কে একজন হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল। হালকা হয়ে গেল ঘরের আবহাওয়া।

"বাস্তবিক, মেয়েরা না শুনলে গল্প বলে আরাম নেই," বানিয়ে বললেন প্রদোষ। "এরা কি গল্প শুনতে জানে, না ভালোবাসে! যে যার পানাহার নিয়ে ব্যস্ত। শুনুন আপনারা, বাকীটুকু বলে শেষ করি। আমাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে।"

গল্প আবার শুরু হলে আমাদের মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে গেল। গল্পটা তো হাসির গল্প নয়। আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলুম ট্র্যাজেডীর বীজ বোনা হয়েছে, যা হবার তা হবেই। সেইজন্যে আমাদের কারো মনে সুখ ছিল না।

প্রদোষ বলতে লাগলেন—

এতক্ষণ আমি গল্প বলছিলুম বেপরোয়া ভাবে। পুরুষের কাহিনী পুরুষালি ধরনে। এখন আমাকে ভব্যতার মুখোশ পরতে হবে। নয়তো মহিলারা মনে করবেন আমি তাঁদের গায়ে পড়ে অপমান করছি। না, না,

আপনারা মুখ ফুটে কিছু বলবেন না, কিন্তু গল্পের মাঝখানে উঠে চলে যাবেন। যাক, উপায় নেই। শেষ করতে তো হবে।

বেচারা বিশ্বজিৎ! আসুন, আমরা সকলে মিলে তার জন্যে চোখের জল ফেলি। আমাদের চোখের জলের তর্পণ পেলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে। বেচারা বিশ্বজিৎ! তার সব ছিল, কিন্তু এমন একজন বন্ধু ছিল না যে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করতে পারত। আমি থাকলে বলতুম, আগুন নিয়ে খেলতে চাও খেল, কিন্তু আগুনকে খারাপ বলে ভুল কোরো না। যে মেয়ে খারাপ নয় তাকে খারাপ মেয়ে ভাবলে বিপদে পড়বে। এমন কি, যে মেয়ে সত্যি সত্যি খারাপ তাকেও খারাপ ভাবতে নেই। খারাপ ভাবলে খারাপ দিকে মন যাবে। কিছুতেই মনটাকে ফেরাতে পারবে না। এমন কি, পালিয়ে গিয়েও বাঁচবে না। বাঁচতে যদি চাও তো জপ করো, ভালো মেয়ে, সহজ মেয়ে, স্বাভাবিক মেয়ে। তা হলে মন্ত্রশক্তি ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। সে পথ বাঁচবার পথ।

ও যে আত্মসংবরণ করতে গিয়ে দারুণ কষ্ট পাচ্ছিল রানি তা জানতেন না, জানলে শিকারের শখ সংবরণ করে বিদায় নিতেন। তাঁর ছিল শিকারের নেশা। মনের মতো শিকারী সাথী পেলে এ নেশা যেন মিটতেই চায় না। তিনি বয়সে বড়। তাঁর এমন কোনো অপূর্ণ কামনা ছিল না যার জন্যে বিশ্বজিৎকে তাঁর প্রয়োজন। তিনি ভাবতেই পারেননি যে তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে একজন বিলেতফেরৎ সম্ভ্রান্ত যুবক এত দূর বিভ্রান্ত হতে পারে। এ কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি যে তিনি খারাপ মেয়ে বলেই সঙ্গদোষে বিশ্বজিৎও খারাপ ছেলে হয়ে উঠেছে। যা সম্ভব নয় তাকেই সম্ভব মনে করে সে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আপনি ভালো তো জগৎ ভালো। তাঁর সম্বন্ধে জগৎ কী ভাবছে সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

রানি যে রূপসী ছিলেন তা বোধ হয় বলতে ভুলে গেছি। দাক্ষিণাত্যের রূপের আদর্শ উত্তরাপথের সঙ্গে মেলে না। আমরা যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে নিরীক্ষণ করি তা হলে দাক্ষিণাত্যের রূপ আমাদের নয়নরোচক হবে। অজন্তার গুহাচিত্র কার না মনোহরণ করে! দাক্ষিণাত্যে আমি যতবার গেছি দক্ষিণী মেয়েদের রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনারা অমন উসখুস করবেন না। বিয়ে যখন করব তখন বাঙালীই করব। আপাতত যে ক'দিন স্বাধীন আছি সে ক'টা দিন ত্রৈলঙ্গ ললনাদের রূপ-গান করি। যেমন কালো

তাঁদের রং তেমনি কালো তাঁদের কেশ, তেমনি কালো তাঁদের চোখ, আর তেমনি কালো তাঁদের কালো চোখের কাজল। নানা রংয়ের ফুল তাঁদের অলকে, নানা রংয়ের শাড়ী তাঁদের অঙ্গে, নানা রংয়ের মণি মাণিক তাঁদের আভরণে। কালোকে পরাস্ত করার জন্যে আর সব ক'টা রং যেন চক্রান্ত করেছে। তাঁদের দেখে মনে হয় তাঁরা রঙ্গিণী। চিকণ কালো বলে কৃষ্ণের যে বর্ণনা আছে তাঁদেরও সেই বর্ণনা। কৃষ্ণের মতোই আশ্চর্য তাঁদের আকর্ষণ। আমাদের রানি মহাভারতের কৃষ্ণার মতো রূপসী। কয়েকটি বিশেষণ এলোমেলো ভাবে আমার মনে আসছে। উত্তপ্ত, মদির, মায়াময়, সুঠাম, বিলোল।

থাক, আর না। রানি যদি দেখতে খারাপ হতেন বিশ্বজিৎ অতটা উদ্দীপ্ত হতো না। খারাপ মেয়ে যদি দেখতে সুন্দর হয়, সুন্দর মেয়ের যদি স্বভাব খারাপ হয়, তা হলে তার যে সম্মোহন তা দুরন্ত ঘোড়ার মতো দুর্বার। বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার বিশ্বজিৎ কত দুরন্ত অশ্বের টানে উদ্দাম হয়েছে! সে সব ছিল ফার্স্ট হর্স। আর এ হলো, মহিলারা মাফ করবেন, আমার বিচারে নয়, বিশ্বজিতের বিচারে ফার্স্ট উওম্যান। এর যে টান তা প্রলয়ঙ্কর।

ফরেস্ট বাংলোয় দু'জনের দু'খানা ঘর। মাঝখানে খাবার ঘর দু'জনের এজমালি। খাওয়াদাওয়ার পরে তারা বারান্দায় ইজি চেয়ার পেতে গল্প করত। তারপর যে যার ঘরে শুতে যেত। গল্প করতে করতে বেশ একটু রাত হয়ে যেত। রানি বলতেন, "ওয়েল, ডিয়ার, আমি আর জেগে থাকতে পারছিনে। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।" বিশ্বজিৎ বলত, "বেয়ারাকে বলা আছে, রাত থাকতে ডাকবে।" তখন রানি বলতেন, "সুনিদ্রা হোক, সুখ স্বপ্ন দেখ।" বিশ্বজিৎ বলত, "তুমিও।" রানি হেসে বলতেন, "আমি? আমি স্বপ্ন দেখব আমার নূতনতম বাঘকে।" বিশ্বজিৎ আমতা আমতা করে বলত, "আর আমি? আমি স্বপ্ন দেখব আমার—" কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বেরোত না, "বাঘিনীকে।" তার পর চলে যেত নিজের ঘরে।

শিকার করতে যারা যায় তারা জানে একদিন হয়তো বাঘের হাতে জান যাবে। বিশ্বজিতেরও সে জ্ঞান ছিল। কিন্তু সে কেয়ার করত না। এর পরে তার মনে হতে থাকল, বাঘের হাতে নয়, বাঘিনীর হাতে। সে কেয়ার করল না। জীবনে তার এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। ভবিষ্যতের কথা

সে আর ভাবতে চায় না, ভাবতে চায় শুধু বর্তমানের কথা। বর্তমানে তার কর্তব্য কী? যে সুযোগ তার মুঠোর মধ্যে এসেছে সে সুযোগ কি ছাড়া উচিত? না ভোগ করা উচিত? ভোগ করতে গিয়ে হয়তো বিয়ে করাই হবে না। আর কাউকে বিয়ে করা অন্যায় হবে। অথচ ভোগ না করে যদি হাতছাড়া করে তবে এলো কেন এ সুযোগ তার জীবনে? কেন এলো? কে আসতে বলেছিল? সে তো শিলং থেকে ফেরবার সময় আমন্ত্রণ জানায়নি। পরিষ্কার ভাষায় বলেছিল, গুড বাই। তা সত্ত্বেও যদি আসে তবে কেন আসে? এ কি কেবল শিকারের জন্যে আসা?

খারাপ মেয়ে, সুন্দর মেয়ে! কেন তোমার আসা! সুন্দর মেয়ে, খারাপ মেয়ে, কেন তোমার থাকা! বেশ বুঝতে পারছি বিয়ে এ জীবনে ঘটবে না। অদৃষ্টে নেই। কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না, যখন শুনবে আমার কীর্তিকাহিনী। আমার ভবিষ্যৎ আমি তোমার জন্যে বিসর্জন দিলুম। তুমি কি আমাকে নিরাশ করবে? নিরাশ করলেও আমি মরেছি, না করলেও মরেছি। বাঘিনীর হাতেই আমার জান যাবে। তুমি যদি আমাকে শিকার করো তা হলে আমার বেঁচে থাকাও মরে থাকা!

একদিন বিশ্বজিৎ নিজের ইজিচেয়ার থেকে নেমে রানির কোলে মাথা রেখে বারান্দার উপর পা ছড়িয়ে বসল। তিনি তার মাথা টিপে দিতে দিতে বললেন, "মাথা ধরেছে? না? পুওর ডারলিং!" সে তাঁর একখানি হাত নিজের হাতের ভিতর টেনে নিল। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিল। রানি বুঝতে পারলেন এ ব্যথা মাথাব্যথা নয়। যৌবন বেদনা। এ রকম যে হবে এ তিনি কল্পনা করেননি। অথচ না হওয়াই বিচিত্র। রানি তাঁর হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না, পাছে বিশ্বজিৎ দুঃখ পায়। নিজের সর্বনাশ না করে বন্ধুকে যেটুকু সুখ দেওয়া সম্ভব সেটুকু দিতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল না। তার বেশী তিনি কেমন করে দেবেন? বিশ্বজিৎ বিয়ে করে না কেন? তিনি কি বাধা দিচ্ছেন?

এসব কথা খোলাখুলি বলে ফেললেই ভালো করতেন রানি। কিন্তু মেয়েলি লজ্জা তাঁকে নির্বাক করেছিল। ফলে বিশ্বজিৎ এক এক করে অনেক কিছু পেল। এক দিনে নয়, অনেক দিনে। সব সুখ যখন পেয়েছে তখন চরম সুখ কেন বাকী থাকে? এই হলো তার অনুক্ত জিজ্ঞাসা। এর উত্তরে পেল অনুচ্চারিত উত্তর। তা হবার নয়। সে বিশ্বাস করল না যে যানি

আর সব দিয়েছেন তিনি ওটুকু দিতে পারেন না। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছা নেই, তাই বলো। কী করে থাকবে, আমি তো রাজারাজড়া নই। অসমকক্ষ।

একথা শুনে রানি বললেন, "তুমি যখন বিয়ে করবে তখন আপনি বুঝবে যে তোমার স্ত্রী এ জিনিস আর কাউকে দিতে পারেন না। এ কেবল স্বামীর জন্যে।"

নির্ভুল উত্তর! বিশ্বজিতের স্ত্রী যদি এ জিনিস আর কাউকে দেন তবে সে তার নিজের হাতে তাঁকে গুলি করবে। এ জিনিস তো দূরের কথা, কোনো জিনিস না। সে স্বীকার করল যে রানি যা বলছেন তা ঠিক। অথচ তার শিরায় শিরায় যে আগুন জ্বলছিল তারও তো নির্বাণ চাই। তখন তার এমন অবস্থা যে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারে না, যদিও জানে এবং মানে তার আত্মসংবরণ করা উচিত।

বিশ্বজিতের অভ্রান্ত বিশ্বাস ও মেয়ে খারাপ মেয়ে। সে নিজেও কিছু কম খারাপ নয়। তা হলে তাদের দু'জনের সম্পর্কের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি কী? যেটা ন্যায়শাস্ত্রে বলে সেইটেই তো হবে। না যেটা ধর্মশাস্ত্রে বলে সেইটে?

প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হতে হতে এমন এক মুহূর্ত এলো যখন না ভেবেচিন্তে বিশ্বজিৎ বলল, "রানি, কাল আমি বাঘ শিকার করতে গিয়ে নিজেকেই গুলি করব। তুমি সে দৃশ্য সইতে পারবে না। লোকে হয়তো তোমাকেই দোষ দেবে। সময় থাকতে তুমি সদরে চলে যাও।"

রানি তা শুনে স্তম্ভিত হলেন। বললেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ! এত তুচ্ছ কারণে কেউ আত্মহত্যা করে! চলো, তুমিও সদরে চলো। তোমাকে আমি শিলং নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মতো একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।"

বিশ্বজিৎ ও কথা কানে তুলল না। আলটিমেটাম দিল। "আমি যা চাই তা আজ রাত্রেই পাব। নয় তো কোনো দিন পাব না!" কাতর স্বরে বলল, "এখন তোমার হাতে আমার জীবন মরণ।"

রানি তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। পায়ের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ঝরালেন। মৌনং সম্মতিলক্ষণং ভেবে সে তাঁকে কাছে টেনে নিল! তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, "বন্ধু, তুমি কি আমার সর্বনাশ করবে? এই কি তোমার মনে ছিল?"

বিচলিত হয়ে বিশ্বজিৎ বলল, "রানি, আমি কি তোমার সর্বনাশ করতে

পারি! একবার আমার দিকে তাকাও। আমাকে দেখে কি মনে হয় যে কারো সর্বনাশ করতে পারি! তুমি কাল সদরে চলে যেয়ো। আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।"

তিনি তার বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে দিয়ে বলাতে পারলেন না যে সেও তাঁর সঙ্গে সদরে যাবে। দু'জনের একজনেরও চোখে ঘুম ছিল না। অবশেষে বিশ্বজিৎ বলল, "যাই, আমাকে ভোরবেলা জাগতে হবে, জীবনের শেষ ঘুম ঘুমিয়ে নিই।"

রানি তার কপালে চুমো দিয়ে বললেন, "কাল আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখব। কোথাও যেতে দেব না।"

পরের দিন ভোর হবার আগেই বিশ্বজিৎ বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলে। রাত্রে তার ঘুম আসেনি। সারা অঙ্গে যৌবনজ্বালা। শীতল জল এত কাছে, তবু এত দূরে। তবে কি এ জল নয়, মরীচিকা! খারাপ মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, আমি কি তোমাকে চিনতে পারিনি? সুন্দর মেয়ে, খারাপ মেয়ে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝতে দিয়েছিলে? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি যা মুখে বলি তা কাজে করি। তুমি সে দৃশ্য সইতে পারবে না। বিদায়।

রানি তাঁর প্রসাধন শেষ করে বাইরে এসে শুনলেন বিশ্বজিৎ রওনা হয়ে গেছে। তাঁর চা খাওয়া হলো না। তিনি হাতীর খোঁজ করলেন। হাতী ছিল তাঁকে সদরে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি হুকুম দিলেন, সদরে নয়, সাহেব যে পথে গেছেন সেই পথে চালাও। সে পথ কারো জানা ছিল না। সাহেব তো কাউকে বলে যাননি। ঘুরতে ঘুরতে রানির বেলা হয়ে গেল। দূর থেকে কানে এলো বন্দুকের আওয়াজ। দিক নির্ণয় করে তিনি হাতী ছুটিয়ে দিলেন। পৌঁছে দেখলেন জীবনদীপ নিবে গেছে।

এমনি করে তার যৌবনজ্বালার অবসান হলো। বেচারা বিশ্বজিৎ! রানিকে বাঁচাবার জন্যে সে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল তার ঘরে। ফিরে এসে রানি সেখানা আবিষ্কার করলেন। জানিনে কী ছিল সে চিঠিতে। রানি সেখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিলেন।

৪

প্রদোষের জবানবন্দী শেষ হলো যখন, তখন মেয়েদের সকলের চোখে জল। পুরুষদের কারো মুখে কথা ছিল না। ঘোষাল তো ছোট ছেলের মতো

গালে হাত রেখে শুনছিল। বোধ হয় ভাবছিল অমন মানুষের এমন পরিণাম কি সত্যি!

"সেই রানি তার পরে কী করল?" জানতে চাইলেন মিসেস মৌলিক।

"রানি তার পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেলেন। তাঁর গলার গোলকোণ্ডার হীরের হার খুলে দিলেন সিভিল সার্জনের মেমসাহেবকে। তাঁর পাঁচ রকমের মণি বসানো পাঁচ আঙুলের আংটি পরিয়ে দিলেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মেমসাহেবকে। তাঁর প্ল্যাটিনামের ব্রেসলেট দিয়ে দিলেন ফরেস্ট কন্‌জারভেটরের মেমসাহেবকে। তা বলে বিশ্বজিতের অধস্তন কর্মচারীদের স্ত্রীদের বঞ্চিত করলেন না। তাঁদের বিলিয়ে দিলেন নাকে ও কানে পরবার যত রকম অলঙ্কার। আর শাড়িগুলো খয়রাৎ করলেন চাকরবাকরদের জানানাদের।"

"তার পরে?" প্রশ্ন করলেন মৌলিকের বোন মিসেস ঘোষাল।

"তার পরে?" ডেপুটি কমিশনারের তো মেমসাহেব নেই। তিনি চিরকুমার। তিনি হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। তখন রানি গিয়ে মোলাকাৎ করলেন লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর মেমসাহেবের সঙ্গে। খবর এলো ডেপুটি কমিশনার জয়েন্ট সেক্রেটারী হয়েছেন। অযাচিত পদবৃদ্ধি।

এর পরে মহিলাদের কৌতূহল লক্ষিত হলো না। মণিমোহন বললেন, "সেন, তোমার ঐ রানিটি মোটেই ভালো মেয়ে নয়। যা দিতে পারে না তার আশা দিয়ে ছেলেটাকে বাঁদরনাচ নাচিয়েছে। ছেলেটা যে মারা গেল তার জন্যে দায়ী তোমার রানি।"

"আমার রানি! বেশ, ভাই, বেশ!" প্রদোষ মহিলাদের দিকে তাকালেন। "কিন্তু রানি যদি খারাপ মেয়েই হতো, যা দেবার নয় তাও দিত। তা হলে এই ট্রাজেডী ঘটত কি?" তিনি আপীল করলেন।

দেখা গেল রানির বিরুদ্ধে রায় দিলেন একজন কি দু'জন বাদে আর সব পুরুষ। আর বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে মহিলারা সবাই।

(১৯৫০)

দূরের মানুষ

সালটা ১৯৪৭। মাসটা অক্টোবর কি নভেম্বর। দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু বেলা ছোট হয়ে আসছিল। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতে নেমে দেখি আকাশ থেকে অন্ধকার নেমেছে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল দার্জিলিং মেল। খুঁজে বার করলুম আমার নাম। একটা ছোট কামরায় দুটিমাত্র বার্থ। নীচেরটা আমার, উপরেরটা খালি। আমি আমার জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে বিছানা পেতে দখল নিচ্ছি এমন সময় একজন রেলওয়ে কর্মচারী ও জনা দুই ইংরেজ এসে উপরের বার্থটায় একটা স্যুটকেস চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁদের একজন আমার সহযাত্রী হবেন, তা তো বুঝলুম, কিন্তু কোন জন তা ঠাহর করতে পারলুম না।

গাড়ি ছাড়তে তখনো অনেক দেরি। প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। বিরাট ট্রেন। বহু লোক ফিরছেন। ভিড়ের মাঝখানে চেনা মুখও নজরে পড়ে। কালিম্পং থেকে ফিরছেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে ছেলেমেয়ে ও চাকর। চেনা নামের কার্ড দেখলুম কয়েকটা কামরার বাইরে আঁটা। কিন্তু মানুষের সাক্ষাৎ পেলুম না। বোধ হয় তাঁরাও আমার মতো ঘুরছেন। কুশল বিনিময় করে, শেয়ালদায় পুনর্দর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও নিয়ে নিজের কামরায় ফিরছি এমন সময় চোখে পড়ল সেই দু'জন ইংরেজ প্ল্যাটফর্মের এক টেরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ও ধূমপান করছেন। কাছে আর কেউ নেই।

ধূমপান বললুম, কিন্তু তাঁদের ভাবভঙ্গি থেকে অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ ছিল তাঁরা আর কিছু পান করেছেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোনো দু'জন ইংরেজকে এতটা মশগুল হয়ে চড়া গলায় কথা বলতে দেখিনি বা শুনিনি। বার বার তাঁরা বিদায় নিচ্ছেন, হাতে হাত রাখছেন, হাত নাড়ছেন। তারপর আবার জমে উঠছেন। কথা যেন কিছুতেই ফুরোয় না। মনে হলো একবার কি দু'বার পরস্পরকে চুম্বন করলেনও।

অবশেষে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল! তখন তাঁদের একজন লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠলেন ও অপর জন ঘন ঘন রুমাল নাড়তে থাকলেন। আমার সহযাত্রী কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে তারপরে দরজার কাছ

থেকে সরে এলেন। আমার অনুমতি নিয়ে আমার পাশে বসে বললেন, "কলকাতা যাচ্ছেন, অনুমান করি ?"

আমি বললুম, "হাঁ।"

"আমি যাচ্ছি কলকাতা হয়ে লাহোর। সেখান থেকে রাওলপিণ্ডি।"

কথায় কথা বাড়ে। ভদ্রলোক আমাকে সিগারেট অফার করলেন। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলুম। মাফ চাইলুম। তখন তিনি একাই ধূমপান করতে লাগলেন। কই, মনে তো হলো না যে তিনি আর কিছু পান করেছেন। দিব্যি প্রকৃতিস্থ ভাব। পানীয়ের গন্ধ নেই।

আমি অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছি তাঁর হাবভাব, আঘ্রাণ করছি শুধু সিগারেটের গন্ধ, আর চিন্তা করছি যা দেখেছি তার তাৎপর্য কী। এমন সময় তিনি আপনা হতে বললেন, "সকাল বেলা আমি শিলিগুড়িতে নামলুম। সন্ধ্যাবেলা শিলিগুড়ি ছাড়লুম। এই বারো ঘণ্টা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লুম, "হাঁ, দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা চিরস্মরণীয় বটে।"

"না, না। আমি সে কথা ভেবে বলিনি।" তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দার্জিলিং যাইনি। এমন কি, দার্জিলিং শহরটাই দেখা হয়নি।"

"তা হলে—" আমি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালুম।

"তা হলে ?" তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "আমাকে যিনি বিদায় দিতে এসেছিলেন তিনি আমার দাদা। বিশ বছর আমাদের দেখা হয়নি। এবারেও হতো না, যদি না খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটত।"

বলতে বলতে তাঁর কথার সুরে উত্তেজনার আমেজ এলো। যেন এত বড় একটা অভিজ্ঞতা তিনি চেপে রাখতে পারছেন না। তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবার মতো হয়েছে।

"শুনবেন ?" আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি বলে চললেন, "সকালে যখন শিলিগুড়িতে নামি তখন কেবল এইটুকু জানতুম যে আমার দাদা থাকেন দার্জিলিং জেলার কোনো এক চা বাগানে। চা বাগানের নাম জানিনে। কী করে যেতে হয় সেখানে তাও আমার অজানা। হাতে সময়ও নেই। আজকের ট্রেনে না ফিরলে আবার ছুটি ফুরিয়ে যায়। টেলিগ্রাম

করে ছুটি বাড়িয়ে নেবারও উপায় নেই। রাওলপিণ্ডি এখন অন্য রাষ্ট্রে। তা ছাড়া মিলিটারি কর্তারা এসব ক্ষেত্রে ছুটি বাড়িয়ে দেন না, বরং শাস্তির ব্যবস্থা করেন। সেইজন্যে বলছিলুম, দাদার সঙ্গে এবারেও আমার দেখা হতো না, যদি না খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটত। আগেই বলেছি বিশ বছর আমাদের দেখা হয়নি।"

তারপরে তিনি শোনালেন কেমন করে তাঁর দাদার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। "ভাবলুম দার্জিলিং শহরে গিয়ে সেখানকার প্ল্যাণ্টারদের ক্লাবে খোঁজ করা যাক। তা হলে অন্তত দাদার ঠিকানাটা পাওয়া যাবে। অন্তত তিনি জানবেন যে আমি তাঁর জন্যে এত দূর এসেছিলুম। এবার দেখা না হলে আবার কবে দেখা হতো কে জানে! আমাদের রেজিমেণ্ট দু'মাসের মধ্যে ভারত ছাড়ছে। আর এ দেশে ফিরবে না। আমরা ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা চিরকালের মতো ভারত ছেড়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের চান না।"

ওটুকু অভিমানের কথা। আমি ভদ্রতা করে বললুম, "এর ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চিরকালের মতো মধুময় হবে।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। আর আমাদের ঝগড়া নেই।" তিনি আবার পূর্ব প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। "এবার দেখা না হলে আর হতো না অনেক দিন পর্যন্ত। কে জানে হয়তো আরো বিশ বছর। আমরা ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা বিশ্বময় ঘুরে বেড়াই। ছুটি পেলে দেশে যাই, দার্জিলিং বা কলকাতা আসা হয়ে ওঠে না। দাদা যখন ছুটি নিয়ে দেশে যান তখন আমি হয়তো ছুটি পাইনে। এবার ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিনা, দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে কলকাতা এলুম মা'র সঙ্গে দেখা করতে। তিনি থাকেন কলকাতায়, দাদা থাকেন চা বাগানে। কিন্তু এমনি ব্যস্ত আমি, দাদার ঠিকানাটা মা'র কাছ থেকে নিয়ে টেলিগ্রাম করে আসতে খেয়াল হয়নি। শিলিগুড়িতে নেমে খেয়াল হলো যে ঠিকানাটা আমার কাছে নেই, মা'র কাছেই রয়ে গেছে। কী মুশকিল।"

তিনি তাঁর কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, চলো দার্জিলিং। টাক্সি চলল। আগে কখনো এ দিকে আসা হয়নি। বেশ লাগছিল আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে উঠতে। চা গাছ দেখলেই মনে হচ্ছিল এইবার দাদার বাগান আসছে। কে জানে হয়তো হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তারপর হলো কী,

শুনবেন? উল্টো দিক থেকে একখানা মোটর আসছিল। সরু অপরিসর রাস্তা। মোটরখানা যেই আমার পাশ দিয়ে যাবে আমি সংকেত করে বললুম, একটু থামুন। আমার ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম থামতে। মোটরের আরোহী ইউরোপীয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, ভাগ্যক্রমে আপনি কি জর্জ হাচিনসন নামে একজন চা বাগানের সাহেবকে চেনেন? তিনি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো বলে উঠলেন, কে ও কথা বলছে? জ্যাক্? অপরিচিতের মুখে নিজের নাম শুনে আমি ভালো করে চেয়ে দেখলুম। এ কি কখনো সম্ভব যে এই লোকটি আমার দাদা? লোকটিও আমাকে ভালো করে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমারও। দু'জনেই গাড়ি থেকে নামলুম। নেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলুম। কে জানে কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। তারপরে অপরের হর্ণ শুনে চৈতন্য হলো। জর্জ আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর চা বাগানের দিকে চললেন। ট্যাকসিকে বকশিস দিয়ে বিদায় করলেন। তাঁর বাগানে গিয়ে সারা দিন হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিলুম। এখনো মনের ভিতর তার জের চলছে। আমরা যেন বিশ বছর আগে ফিরে গেলুম। জর্জ আর আমি। তাঁর বৌ অতি চমৎকার মেয়ে। তাঁর বাচ্চারাও কী আনন্দময়। কিন্তু আমাকে পেয়ে জর্জ ওদের ভুলে গেলেন। শুধু ভাই আর ভাই। ভ্রাতৃগত প্রাণ। বলতে পারেন জগতে ভ্রাতৃস্নেহের মতো আর কী আছে? এইটেই বোধ হয় একমাত্র সম্পর্ক যেটা ষোলো আনা নিঃস্বার্থ।"

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম। মনে অনেক কথাই জমছিল, কিন্তু হৃদয়ভার হাল্‌কা করার মতো অন্তরঙ্গতা তখনো গড়ে ওঠেনি।

বললুম, "তার পর?

"তারপর?" তিনি স্মরণ করে বললেন, "তারপর আমার বিদায়ের সময় আসন্ন হলো। জর্জ জানতেন এটা অবশ্যম্ভাবী। ছুটি বাড়িয়ে নেবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। আমাকে খুশি করাই হলো তাঁর একমাত্র ধ্যান। স্ত্রীকে আমার জন্যে কিছু করতে দিলেন না, নিজে সমস্ত করলেন। চায়ের পট থেকে চা ঢেলে দিলেন তিনি স্বয়ং। সঙ্গে দিলেন বাগানের বাছাই করা সেরা চা পাতা। নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন শিলিগুড়িতে। স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ভালো জিনিস যা কিছু পাওয়া যায় অর্ডার দিয়ে আমাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। আমি যে বিশ বছর পরে এসেছি, বিশ

মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাব এই ভাবনাই তাঁকে অস্থির করেছিল। আমি জানতুম আমার নিয়তি আমাকে টানছে, সেইজন্যেই অতটা অস্থির হইনি। নইলে আমিও কিছু কম সেন্টিমেন্টাল বোধ করিনি। জগতে ভ্রাতৃস্নেহের মতো আর কিছু কি আছে? মাই ব্রাদার! ও মাই ব্রাদার!"

ভদ্রলোক নিঃস্পন্দ হয়ে আবেগ দমন করতে লাগলেন।

আমিও নিশ্চল হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর ভাবছিলুম। ভ্রাতৃস্নেহের মতো কিছু কি আর আছে? তাই যদি হবে তবে আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ এমন করে আলাদা হয়ে গেলুম কেন? শুধু কি আলাদা হওয়া? লক্ষ লক্ষ ভাই ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে, হাজার হাজার বোন ভাইয়ের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। হা বিধাতা! ইংরেজ আমাদের ভাই নয়, পর। সে কি কোনো দিন এমন শত্রুতা করেছে?

বললুম, "ভাইয়ের মতো বন্ধু আর নেই। ভাইয়ের মতো শত্রুও আর নেই।"

তিনি চমকে উঠে সুধালেন, "কী মনে করে ও কথা বলছেন?"

যা ভাবছিলুম তা খুলে বলতে হলো। একই পরিবারে এক ভাই শিখ হয়েছে, আরেক ভাই মুসলমান, আরেক ভাই হিন্দু জাঠ বা রাজপুত। এ রকম দৃষ্টান্ত একটা দুটো নয়, শত শত সহস্র সহস্র। সাত শো বছর ধরে এই ব্যাপার চলছে। তথাপি—

তিনি বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "বুঝেছি আপনার ব্যথা। পাঞ্জাবে থাকি, দেখেছি তো সব নিজের চোখে। ওঃ এমন বীভৎসতা আমি জীবনে দেখিনি। বিশ্বাস করুন আমাকে, পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে আমি লড়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। কিন্তু পাঞ্জাবে যা দেখলুম তার তুলনাই হয় না। একেবারে অন্য জিনিস।"

তাঁর মুখে শুনলুম চৌদ্দই অগাস্টের পরবর্তী ইতিহাস। সে অনেক কথা। সব মনে নেই। মনও তো সব কথা সঞ্চয় করতে রাজি হয় না। এত স্থান কোথায়! তা ছাড়া যা বিষাক্ত, যা হিংস্র, তার প্রতি আমার মন স্বত বিমুখ।

বললেন, "একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনুন। এটাতে আমার কিছু দোষ ছিল। তার জন্যে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। আমাদের রেজিমেণ্ট আর দু'মাসের মধ্যে করাচীতে জাহাজ ধরে এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আগে

থেকে হিসাব নিকাশ করে পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে। সে ভার পড়েছে আমার উপর। কয়েক মাস ধরে আমি খাটছি। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন লোক বেশী নেই। সেইজন্যে আমি হীরালালকে ছেড়ে দিতে রাজি হইনি। চৌদ্দই অগাস্টের দু'এক দিন আগে সে এসে আমাকে বলল, শুনছি ভীষণ কাণ্ড হবে। পাকিস্তানে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না। আমাকে ছুটি দিন, সময় থাকতে আমি হিন্দুস্থানে চলে যাই। আমি বললুম, হীরালাল, তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো আমার হিসাব নিকাশ করা হবে না। সময় থাকতে আমি ভারত ছাড়তে পারব না। রেজিমেণ্ট আটকা পড়বে। আমাদের হাই কমাণ্ড তা সহ্য করবে না। হীরালাল, তোমাকে আমি অভয় দিচ্ছি। আমি থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। কাজ সারা হলে আমি স্বয়ং তোমাকে নিরাপদে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসব। সে বিশ্বাস করল আমার কথা। কিন্তু তার পরিবারের লোক বিশ্বাস করল না। করবে কী করে! চৌদ্দই অগাস্টের দিন থেকে যেসব কাণ্ড ঘটতে থাকল সেসব তো তাদের চোখের উপরেই। তারা হীরালালকে এক মুহূর্ত শান্তি দিল না। হীরালালও দিল না আমাকে। একদিন সে এসে আমাকে বলল, একটা কন্‌ভয় যাচ্ছে কাশ্মীর। কাশ্মীরে আমাদের স্বজন আছে। অনুমতি দেন তো আমরা সেই কন্‌ভয়ের সঙ্গে কাশ্মীর যাত্রা করি। একবার সেখানে যদি পৌঁছতে পারি তা হলে আমরা নিরাপদ। আমি বললুম, আচ্ছা, কিন্তু একটি শর্তে। তুমি নিজে তাদের সঙ্গে যাবে না। সে তা শুনে দুঃখ পেলো। কিন্তু রাজি হয়ে গেল। কন্‌ভয় রওনা হলো পরের দিন ভোর বেলা। দুপুরের দিকে আমার কাছে খবর এলো—ওঃ সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার!"

তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে অক্ষম হলেন। তাঁর মুখের উপর করাল কালো ছায়া।

আমাদের গাড়ি দাঁড়াল জলপাইগুড়িতে। লোকজনের সোরগোল শুনে তিনি একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভাষা ফিরল। কালো ছায়াটা সরে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তারপরে কী হলো?"

"তারপরে খোঁজ নিয়ে জানতে পাই কন্‌ভয়ের অবশিষ্ট চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। প্রাণ ছাড়া বিশেষ কিছু বাকী ছিল না তাদের। এমন জখম হয়েছে যে ডাক্তারের অসাধ্য। কন্‌ভয়ে ছিল প্রায় দু'শো

জন হিন্দু ও শিখ। তাদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক ও শিশু। মিলিটারি এস্কর্ট ছিল সঙ্গে। প্রায় মাইল সাত আট যাবার পর তারা দেখতে পায় পথের দু'পাশের গ্রাম থেকে কুড়ুল আর বেলচা আর অন্যান্য হাতিয়ার হাতে মুসলমানরা আসছে। ফায়ার করে কোনো ফল হলো না। বরং তাদের রোখ বেড়ে গেল। কন্‌ভয়কে থামিয়ে তারা এমন বেপরোয়া ভাবে খুন জখম চালালো যে মিলিটারি এস্কর্টকে দস্তুরমতো বেগ পেতে হলো। তারা পিছু না হটলে কচুকাটা হতো। পিছু হটতে হটতে তারা অবশিষ্ট জীবিতদের নিয়ে রাওলপিণ্ডি পৌঁছয়। এর জন্যে ডেপুটি কমিশনার বিশেষ অনুতপ্ত। তাঁরই তো দায়িত্ব। চমৎকার মানুষ মিস্টার।—মুসলমান হলে কী হয়, সাম্প্রদায়িকতার ধার ধারেন না।"

ডেপুটি কমিশনারের প্রশংসা চলল। ভুলে গেলেন হীরালালের কন্‌ভয়ের কথা। মনে করিয়ে দিতে হলো।

"হাঁ, যা বলছিলুম। বেচারা হীরালালের সে কী কান্না! তার মা সাংঘাতিক আহত। মাথার খুলি দ্বিখণ্ড হয়েছে কুড়ুলের আঘাতে। তার বৌদিদি মারা পড়েছেন। বৌদিদির শিশু সন্তানরাও বাঁচেনি। বলল, সাহেব, তোমার জন্যেই আমার পরিবারের লোকের এ দশা। তুমি যদি আমাকে যেতে দিতে তা হলে কি এমন হতো! আমি বললুম, হীরালাল, তোমাকে আমি যেতে দিইনি বলেই তুমি ও কথা বলবার জন্যে বেঁচে আছ। নইলে তুমিও কাটা পড়তে। বরং আমার অনুতাপ হচ্ছে এ কথা ভেবে, কেন আমি তোমার আত্মীয়দেরও আটক করিনি, কেন তোমার অনুরোধ শুনে তাদের যেতে দিয়েছি। হীরালাল, যাও, তোমার কর্তব্য করো। পুরুষের জীবনে অন্য কাজ আছে। কান্নাকাটি করা পুরুষের কাজ নয়। চলো, তোমার মা'র চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন হচ্ছে দেখা যাক। অন্যান্যদের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থাও দেখতে হবে। তোমাকে আমি কথা দিয়েছি। যথাসময়ে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেবার ভার আমার। ডেপুটি কমিশনারকে সে ভার দেব না। মাস খানেক পরে আমি নিজে এরোপ্লেনে করে তাকে দিল্লী পৌঁছে দিয়ে এলুম। ওহ্! তখন তার কী আনন্দ!"

আমি জানতে চাইলুম রেলপথ এখনো খোলা আছে কি না।

ট্রেন ততক্ষণে জলপাইগুড়ি ছেড়ে আবার দৌড় দিয়েছে। খেয়াল ছিল না কখন। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, "না, মাঝখানে কতক

রাস্তা নিরাপদ নয়। এক রাজ্যের ট্রেন আরেক রাজ্যে প্রবেশ করে না। আকাশপথেই যাতায়াত চলছে। আমিও আকাশপথেই ফিরব।"

আমি বললুম, "আমরা কিন্তু রেলপথেই যাতায়াত করছি। এই ট্রেন পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে কলকাতা যাবে। বোধ হয় ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। ভাবতে খারাপ লাগে যে এটা এখন পর রাজ্য।"

"এদিকে যে ট্রেন চলছে এই একটা সৌভাগ্য। ওদিকে তো ট্রেনই ভালো করে চলছে না। চলবার মধ্যে চলছে শরণার্থী স্পেশাল ট্রেন। তাতে গভর্নমেণ্টের লাভ নেই। যাতে লাভ হয়, যেমন প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গুডস ট্রেন, এসব ট্রেন চললে তো রেল লাইন চালু রাখা পোষাবে। প্রথম মাসে একখানাও ট্রেন রাওলপিণ্ডি দিয়ে গেল না। শরণার্থীদের স্পেশাল ট্রেন বাদ। দ্বিতীয় মাসে গেল একখানি মাত্র মালগাড়ি। অমন করে কি একটা রাজ্য চালানো যায়? রাজ্য চলে ব্যবসাবাণিজ্যের আয়ে।"

আমি এত কথা জানতুম না। বিস্মিত হয়ে বললুম, "তা হলে আপনারা দরকারী জিনিসপত্র পাচ্ছেন কী করে?"

"পুরোনো কিছু ছিল। তাতেই কোনো রকমে চলছে। বাজারের উপর নির্ভর করলে অচল হতো।"

"আপনাদের কিছু আছে। কিন্তু সাধারণের তো নেই। তাদের অবস্থা?"

"তাদের অবস্থা অনিশ্চিত। দুধের দরকার হলো। ভাঁড় হাতে চলল দেহাতে। গিয়ে বলল, ও ভাই, দিতে পারো এক পোয়া দুধ? শহরে বসে থেকে সকালে বিকেলে দুধ পাবে, সে ভরসা নেই। চায়ের দুধের জন্যে শহরের বাইরে যেতে হবে।"

আমি বললুম, "এ তো বেশ মজা!"

তিনি বললেন, "মজা! মজার কথা যদি শুনতে চান তো আমার একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। আমাদের ব্রিগেডিয়ারের বেয়ারা থাকে আপনাদের এই বাংলাদেশে। পূর্ববঙ্গে না পশ্চিমবঙ্গে, ঠিক জানিনে। মনিঅর্ডার করে তাকে একশো টাকা পাঠাতে চাইলেন শেষ দান হিসাবে। ডাকঘরে মনিঅর্ডার নিল না। রাওলপিণ্ডি থেকে যখন দিল্লী আসি তখন ব্রিগেডিয়ার আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন দিল্লী থেকে মনিঅর্ডার করতে। দিল্লীর ডাকঘরে মনিঅর্ডারের ফর্ম পূরণ করে যেই নোটখানা বাড়িয়ে দিলুম অমনি ওরা বলল, এতে লাহোর ছাপা রয়েছে। এ নোট এ রাজ্যে অচল।

অন্য নোট থাকে তো দিন। অন্য নোট যা ছিল তা আমার পাথেয়। মনিঅর্ডার করা হলো না দিল্লীতে। সেদিন দমদমে নেমে কাছেই একটা ডাকঘরে গেলুম আপদ বিদায় করতে। ছোট ডাকঘর। কেরানী হয়তো অত খোঁজ খবর রাখে না। হয়তো নোটখানা রাখবে। বেশ খাতির করে একখানা মনিঅর্ডার ফর্ম দিল আমার হাতে। আমিও বেশ খাতির করে বললুম, এই মনিঅর্ডার-খানা দয়া করে পাঠিয়ে দিতে আজ্ঞা হোক।"

আমি কৌতূহলী হয়ে সুধালুম, "তার পরে?"

"তার পরে বাড়িয়ে দিলুম সেই একশো টাকার নোটখানা। ছোট মানুষটি সেখানা নিয়ে আরেকজনকে দেখাল। তিনি বোধহয় ডাকঘরের ব্রিগেডিয়ার। উঠে এসে বললেন, খুব দুঃখিত হলুম। এ নোট তো এ রাজ্যে চলবে না। আমি অপ্রতিভ হয়ে নোটখানা পকেটস্থ করলুম। তারপরে সেখানাকে পাস করার জন্যে আরো দু'এক জায়গায় চেষ্টা করেছি। কেউ সেখানা ভুলেও নেবে না। এই হলো আপনার দেশ ভাগ করার মজা। কৌতুকটা আমার মতো বিদেশী মানুষের উপর দিয়ে না হলেই ভালো হতো। এখনো সেখানা আমার পকেটে ঘুরছে। কাল কলকাতায় পৌঁছেই সেটার একটা সদ্‌গতির উপায় খুঁজতে হবে। নয়তো চলল ফিরে আমার সঙ্গে রাওলপিণ্ডি। ব্রিগেডিয়ার অবশ্য খুশি হবেন না। ভাববেন আমারই গাফলতি। সময় থাকলে বেয়ারাকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায় আনিয়ে তার হাতে নোটখানা গুঁজে দিতুম। আপনি একটা পরামর্শ দিতে পারেন?"

আমি তাঁকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করতে পরামর্শ দিলুম। তিনি ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর আমাদের গল্প গুজবের পুঁজি ফুরিয়ে এলো। রাতও হয়েছিল। কাপড় ছেড়ে যে যার বার্থে গা মেলে দিলুম। দু'জনেই ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়তে বেশীক্ষণ লাগল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি সেটা রাণাঘাট স্টেশন। কখন এক সময় পাকিস্তান অতিক্রম করে এসেছি। আর ঘুম এলো না। ভোর হলো। রাতের পোশাক ছেড়ে দিনের পোশাক পরলুম। কোনো মতে দাড়ি কামিয়ে নিলুম। তিনিও তৈরি হলেন। তারপর আবার আমার বার্থে আমার অনুমতি নিয়ে বসলেন। দিনের বেলা যদিও অনুমতির আবশ্যক করে না।

"তা হলে চললেন আপনি রাওলপিণ্ডি?" বিদায়ের সুরে বললুম।

"হাঁ, কলকাতা থেকে দিল্লী। সেখান থেকে লাহোর হয়ে রাওলপিণ্ডি। কিন্তু একটা ভয়ের কথা শুনছি। কাল আপনাকে বলতে ভুলে গেছি যে দিল্লী লাহোর এরোপ্লেন সার্ভিস বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে আজকালের মধ্যে। তা যদি হয় তা হলে আমাকে স্পেশাল প্লেন ভাড়া করতে হবে। তাও পাব কি না কে জানে! দিল্লীতে আটকা পড়ব কি না ভাবছি।"

(১৯৫০)

সমাপ্ত